বৈষ্ণব রস-সাহিত্য



বৈষ্ণব রস-সাহিত্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের
প্রধান অধ্যাপক
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীক্ষীরোদলাল দত্ত
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৫৩ / 946

মূল্য চারি টাকা

প্রিন্টার—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪নং ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

যে সকল নিবন্ধ বর্তমান গ্রন্থে সংগৃহীত হইল, সে সকল সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ভারতবর্ষ, বসুমতী, প্রবাসী, শ্রীভারতী, উদয়ন প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তাহা হইলেও আমার বিশ্বাস যে, এগুলির মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য রহিয়াছে যাহাতে ভাবের ক্রমভঙ্গ ঘটে না। বৈষ্ণব কবিতা বুঝিতে হইলে যে সকল উপাদানের সাহায্যে তাহার পটভূমি নির্মিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা একান্ত আবশ্যক। এই দিক্ দিয়া দেখিলে প্রবন্ধগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্ভবত একটি ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষিত হইবে। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় অবদান বৈষ্ণবকাব্য পৃথিবীর অন্যান্য কাব্য সাহিত্য হইতে বিলক্ষণ। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে যে একটি ব্যাপক মতবাদ প্রচ্ছন্ন রূপে রহিয়াছে, তাহা সমগ্রভাবে ধারণা করিতে হইলে সংস্কৃতকাব্য সাহিত্য, মধ্যযুগীয় ভাবধারা, বাংলার সহজ সঙ্গীতপ্রিয়তা প্রভৃতি মনে রাখা অত্যাবশ্যক। আমি বিবিধ প্রবন্ধে ও গ্রন্থে যথাশক্তি তাহারও আলোচনা করিয়াছি। আমার বিশ্বাস যে, বৈষ্ণবদের কাব্য-প্রবাহ শুধু যে একটি ধর্মমতের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা নহে; ইহার ধারা বাঙালীর জীবনে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতো বহিয়া গিয়াছে। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠকবি ও মনিষীদিগের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার সুর ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে। সুতরাং এই কবিতার মর্মকথা বুঝিতে পারিলে বাংলাদেশের অপূর্ব মানসলোকের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পুনরুক্তি হয়ত স্থানে স্থানে অপরিহার্য হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি বিষয় এমন আছে, যাহা হয়ত বহুবার বলিলেও বিরক্তি উৎপাদন করে না। সেই সকল ক্ষেত্রে ব্যতীত আমি পুনরুক্তি পরিহার করিতে যত্নবান্ হইয়াছি।

বৈষ্ণব-রস সাহিত্যের দুইটি প্রধান দিক্ আছে: একটি লীলা অপরটি [illegible]স, অপরটি দর্শনের অধিকারে পড়ে। আমি লীলাকেই

অনেক স্থলে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করি নাই, কেননা সে সামর্থ্য আমার নাই। শ্রীকৃষ্ণ কি? শ্রীরাধা কি? লীলা কি? রস স্বরূপ কি? এ-সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত নাই। বিভিন্ন দিক্ দিয়া এই সকল প্রশ্নের বিচার করিতে পারিলেই বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবেশলাভ করা যায়। কিন্তু প্রথমতঃ যে সাধনবল থাকিলে এই সকল জটিল প্রশ্নের সমাধান করা যায় তাহা আমার কোথায়? দ্বিতীয়ত বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে স্থূলভাবে জ্ঞানলাভ করিবার নিমিত্ত ঐ-সকল দুরবগাহ বিষয়ের আলোচনা একান্ত আবশ্যক নহে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা যে চরম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা গভীর, অতলস্পর্শ ও সাধারণ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের অগোচর। যেটুকু না জানিলে বৈষ্ণব কবিতার পরিবেশ বুঝা যায় না, আমি ততটুকুমাত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্তমানে বৈষ্ণব কবিতার পঠন-পাঠন ও আলোচনা পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। যদি আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টা পাঠকের চিন্তা-সমুদ্রে কিছুমাত্র আলোড়ন উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলেই আমি মনে করিব আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই।

আমার দৃষ্টিভঙ্গী সর্বত্র যে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে, এমন মনে করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমার অভিমত সম্বন্ধে যেখানে যে সমালোচনা হইয়াছে বা বিরুদ্ধমত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। সুধীগণ বিষয়গুলির সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য যাঁহার প্রেরণায় আমার মানসিক দৈন্য-বিড়ম্বিত প্রাণে সত্যের কিঞ্চিৎ ছায়াপাতও হইয়াছে, সর্বাগ্রে তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

যে সকল মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় আমার প্রবন্ধগুলি বাহির হইয়াছিল, আমার সেই সেই সম্পাদকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করি। প্রসিদ্ধ পুস্তকব্যবসায়ী কমলা বুক ডিপোর কর্তৃপক্ষকে পুস্তকখানি সযত্নে প্রকাশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি এবং আমার সহকারী গবেষক প্রীতিভাজন শ্রীমান্ মৃণাল সর্বাধিকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সূচী

বৈষ্ণব রস-সাহিত্য

প্রথম শাখা

প্রেমধর্ম্ম

বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম

ভক্তি-ধর্ম্ম ভারতবর্ষে নূতন নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভক্তিবাদ এদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। * উপনিষদে সাধারণতঃ জ্ঞানমার্গের উপদেশ আছে। অবিদ্যার জন্য, মায়ার জন্য জীব মৃত্যুর অধীন হয়, বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা-লাভ করিলেই অমৃত বা অমরত্ব ভোগ করা যায়—ইহাই উপনিষদের সার কথা। সত্য কি, ব্রহ্ম কি, আত্মা কি—জানিতে পারিলেই মোক্ষ হয়। সংসারে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, আর জন্ম হয় না। ইহার নাম জ্ঞানমার্গ।

জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, সেই পরম পুরুষ রস-স্বরূপ। তাঁহাকে শুধু জানিলে হয় না, তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহাকে হৃদয়ের স্নেহপ্রীতি দিয়া আস্বাদন করিতে হইবে।

আধ্যাত্মিকং হৃদয়াতনমুপাসনম্।

—শাণ্ডিল্য সূত্র।

* খ্রীষ্ট ধর্ম্ম হইতে ভক্তিধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে—ডাক্তার বেবার প্রমুখ পণ্ডিতগণের এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

হৃদয়ের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। শাণ্ডিল্য সূত্র কত প্রাচীন, তাহা জানা যায় না। যে সকল শাস্ত্রে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য সূত্র, নারদ সূত্র, নারদ পঞ্চরাত্র, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি প্রধান। পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও ভক্তিধর্ম্ম সুপ্রথিত হইয়াছে। শাণ্ডিল্য সূত্র ও নারদ সূত্রের মূল উপনিষদে পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তিধর্ম্ম আধুনিক নহে, পরন্তু অতি প্রাচীন।

সাধারণতঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ভক্তিধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ্ নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহা সমগ্র পুরাণের শিরোমণি মহাভারতের অন্তর্গত। বস্তুতঃ গীতা মহাভারতের কোনও অধ্যায়ের অন্তর্গত হউক বা না হউক, ইহাকে উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হউক বা না হউক, ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

গীতার ভক্তিবাদ এক অপূর্ব্ব বস্তু। ইহাতে জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার উপরে ভক্তিমার্গের সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। বিচার ও যুক্তির সাহায্যে, তুলনামূলক সমালোচনার পরে, যেরূপভাবে ভক্তিধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইল, পূর্ব্বে কখনও সেরূপ হয় নাই। গীতা হইতে ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদক শ্লোকগুলি তুলিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়, সুতরাং আমি দুই-একটি শ্লোকের দ্বারা দিগ্‌দর্শন মাত্র করিব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।

হে অর্জ্জুন! যোগী তপস্বীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; আবার যে যোগী আমাতে সমস্ত হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা করেন, তিনি যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই তরতম নির্দেশ হইতে নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, গীতার ধর্ম্মমতের তাৎপর্য্য কি। আত্মসমর্পণ কাহাকে বলে সে সম্বন্ধেও গীতা উপদেশ করিয়াছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। —১৮শ অধ্যায়।

মদ্গতচিত্ত হও, আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, আমার উদ্দেশে সমস্ত যজ্ঞ কর এবং আমাকেই প্রণাম কর। তাহা হইলেই আমাকে তুমি প্রাপ্ত হইবে। ইহার নাম প্রপত্তি বা শরণাগতি।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

যে যে ভাবে আমাতে প্রপন্ন হয়, আমি তাহাকে সেই ভাবেই কৃপা করি। আরও পরিষ্কারভাবে বলিলেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, তাহা বলিলাম। যদি সে সকল আয়াসলভ্য সাধনে অপারগ হও, তবে শেষ কথা বলিতেছি—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই শরণ লও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। কোনও দুঃখ নাই।

এই যে প্রপত্তি বা শরণাগতি ভক্তিযোগের চরম লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইল, ইহা পূর্ব্বে আর দেখা যায় না। শাণ্ডিল্য সূত্র বলিয়াছেন, 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' —ভগবানে প্রগাঢ় প্রেমই ভক্তি। কিন্তু এই প্রেমের মধ্যে প্রপত্তির কোনও প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয় না। শাণ্ডিল্য সূত্রের এই ভক্তি-সূত্র সম্ভবতঃ গীতারও পূর্ব্বে গ্রথিত হইয়াছিল। কারণ গীতার পরে যে সকল ভক্তিশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শরণাগতির ভাব সুস্পষ্ট।

শরণাগতির কথা সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রচারিত হইয়াছিল। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'। ইহার পূর্ব্বে এমন করিয়া শরণাগতির কথা কেহ বলে নাই। কাজেই মনে হয়, লোকের মন বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য গীতা বলিলেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।

—গীতা, ১৮শ অধ্যায়।

হে অর্জ্জুন! যে ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে চালাইতেছেন, তুমি তাঁহারই শরণাপন্ন হও। এখানে ইহাই অভিপ্রেত যে, অন্য কাহারও শরণ লইতে হইবে না। 'মামেকং শরণং ব্রজ'—একমাত্র আমারই শরণ লও।

গীতার এই দার্শনিক ভক্তিবাদ শ্রীমদ্‌ভাগবতে এক অপূর্ব্ব লীলা-রসাত্মক কাব্যে পরিণত হইয়াছে। মনে হয়, গীতা যেন সূত্র করিলেন, ভাগবত তাহার ভাষ্য। শরণাগতি কাহাকে বলে গোপীপ্রেম তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তত্ত্বের দিক দিয়া যে ভক্তিযোগ গীতায় বিঘোষিত হইল, লীলার দিক দিয়া তাহা ভাগবতের কাব্য-কথায় ফুটিয়া উঠিল। সেই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ ভগবান্ সর্ব্বলোকের প্রেম আস্বাদন করিতেছেন, সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তিনি যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মত সকলকে শুধু মায়ায় ঘুরাইতেছেন না; তিনি সকলের হৃদয়ের মধু আহরণ করিয়া নিজে মধুর হইতেছেন। বংশীরবে তিনি গোপীদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন; তাহারা সকল ভুলিয়া, সকল ফেলিয়া ছে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য। অগণিত গোপী সেই পরম পুরুষকে লাভ করিবার জন্য বাঁশীর মৃদুমন্দ স্বর অনুসরণ করিয়া ছুটিতেছে, তাহাদের হৃদয় অনুরাগে ভরপুর, কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না। ইহারই নাম 'মন্মনা'—যাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে বলিতেছেন—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

আমার প্রতি ভক্তি সর্ব্বভূতের মোক্ষসাধনী। উপনিষদের সেই—

অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।

স্মরণ করুন। সেখানে তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারা, পরাবিদ্যার দ্বারা জীব অমৃতের আস্বাদন লাভ করে। এখানে আমাতে ভক্তি করিলেই মুক্তি; তত্ত্বজ্ঞানীদের যে মোক্ষ—সার্ষ্টি, সাযুজ্য, সারূপ্য, সামীপ্য—তাহা ভক্ত কামনা করেন না। কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত ভক্ত আর কিছুই চাহেন না। মোক্ষের অভিসন্ধি পর্য্যন্ত তাঁহারা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেন। ইহার দৃষ্টান্ত গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণের

মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবার সময় তাঁহারা পলক বা নিমেষকেও ধিক্কার প্রদান করেন। মনে হয় যেন মীনের মত নিমেষশূন্য চক্ষু পাইলে ভাল হইত।

এ-স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ভগবদ্‌গীতা এবং ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভক্তি-ধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বনীয় নহেন; বৈষ্ণবেরাই একমাত্র ভক্তিপন্থার পথিক নহেন। বহু প্রাচীনকাল হইতে শৈবধর্ম্মেও ভক্তিবাদের প্রভাব বর্ত্তমান। শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে সময়ে সময়ে প্রবল শত্রুতা দেখা দিত। কিন্তু তাহা হইলেও শৈবেরা ভক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে, ভক্তি তাহারও প্রধান উপজীব্য। এইরূপ শাক্ত ধর্ম্মের মধ্যেও ভক্তিবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল কতকগুলি সাধুর দ্বারা। ইহাদিগকে আলওয়ার নামে অভিহিত করা হয়। ইঁহারা অনেকে খ্রীষ্টের জন্মের সমকালে বা কিছু পরবর্ত্তীকালে ভক্তিধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রামানুজ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সাধু মহাত্মাদের রচিত সঙ্গীত মন্দিরে মন্দিরে গীত হয়। এই সঙ্গীত বা 'প্রবন্ধম্'গুলি 'তামিল বেদ' নামে অভিহিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গীতে ভগবানকে পতিরূপে ভজনা করিবার বিধান আছে।

ভগবানকে পতি ও আপনাকে পত্নী বা নায়িকা বোধে ভজন করা শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের বিহার॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য-লীলা।

আমরা দেখিতে পাই যে, এই গোপীভাবের ভজন শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসিয়া বাস করিলেন। চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে উদ্ধার করিয়া বৈশাখ মাসে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ধানে যাইব; কিন্তু নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল হরিনাম দিয়া দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিবেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, নিতান্তই যদি যাইবে, তবে বিদ্যানগরে (বর্ত্তমান রাজমাহেন্দ্রী) গিয়া রায় রামানন্দের সহিত দেখা করিও।

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥

—চৈঃ চঃ মধ্য।

তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনই ভক্তি। আমি পূর্ব্বে তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছি। আগে তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, এখন তোমার কৃপায় বুঝিতেছি, তিনি কত বড়।

মহাপ্রভু বিদ্যানগরে গিয়া রায়ের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। রামানন্দ কহেন; প্রভু বলেন—

এহ বাহ্য আগে কহ আর।

স্বধর্ম্মাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া রামানন্দ বহু তত্ত্বের সমাচার দিলেন। 'প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর'। তখন রামানন্দ চরমতত্ত্বে উপনীত হইয়া বলিলেন—

কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।

মহাপ্রভু পুনরপি বলিলেন—'কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।' তখন—

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥

ইহার উপরে কি আছে, এই প্রশ্ন করিতে পারে জগতে এমন লোক ত দেখি নাই। যাহা হউক, যখন শুনিতে চাহিতেছ, তখন বলি, এই যে কান্তাপ্রেম—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

রামানন্দ রায়ের মুখ হইতে কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীরাধার নাম স্ফুরিত হইয়াছিল! এই রাধাপ্রেমই মহাপ্রভুর জীবনের সুপ্ত নির্ঝরকে জাগাইয়া দিল এবং সেই প্রেমবন্যায় বঙ্গদেশ ভাসিয়াছিল।

রাধা-নাম নূতন নহে। নারদপঞ্চরাত্রে রাধার নাম আছে। শাণ্ডিল্য-সূত্রে 'বল্লবী' বা 'গোপী' শব্দ পাওয়া যায়। মহাভারতে 'গোপীজনপ্রিয়' এই বিশেষণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, জয়দেব, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধা-নাম অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং রাধা-নাম নূতন নহে, গোপীপ্রেমও নূতন নহে। কিন্তু গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া যে ভজন, বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ তাহা এই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল।

গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

পুনশ্চ—

রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেইজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

চৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দ-মিলনের ইহাই মুখ্য এবং চরম ফল। এই মিলন-ব্যাপার কবিরাজ গোস্বামীর কবিকল্পনা-প্রসূত নহে। তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চা দেখিয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলন-লীলা করিল প্রচারে॥

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া ভক্তগোষ্ঠীসহ কয়েকদিন তীর্থযাত্রার কথা কহিয়া কাটাইলেন।

সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লইয়া নিজগণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি কৈলা জাগরণ ॥

সম্ভবতঃ সেই সময়ে স্বরূপ দামোদর রামানন্দ মিলন-প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহাই পয়ার-প্রবন্ধে গ্রথিত করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর মনে এই রামানন্দ-সংবাদ কিরূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী ব্যবহার হইতে। মহাপ্রভু বিদ্যানগর হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইয়া কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত আসিলেন। তথা হইতে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা পার হইয়া নর্ম্মদা, তাপ্তী প্রভৃতি ছাড়াইয়া উজ্জয়িনী নগরের নিকটে গেলেন। তথা হইতে ফিরিয়া সপ্তগোদাবরী হইয়া মহাপ্রভু আবার বিদ্যানগরে আসিলেন। উজ্জয়িনীর পথে পুরীতে ফিরিয়া গেলে কি ক্ষতি ছিল? উজ্জয়িনী হইতে তিনি মথুরা বৃন্দাবন হইয়াও ফিরিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া ছিল রায় রামানন্দের নিকটে। বিদ্যানগরে ফিরিয়া—

প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লৈয়া নীলাচলে করিব গমন ॥

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত নামক পুঁথি এই দাক্ষিণাত্য দেশে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামানন্দকে পুঁথি দুইখানি দিয়া তিনি বলিলেন—

প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত করিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে ॥

পয়স্বিনী-তীরে আদিকেশবের মন্দিরে পাইয়াছিলেন ব্রহ্মসংহিতা।

সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।

কৃষ্ণবেন্বা বা কৃষ্ণানদীর তীরে এক মন্দিরে কর্ণামৃত পাইলেন। এই কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥

দক্ষিণ দেশ পর্য্যটনে মহাপ্রভু বিভিন্ন তীর্থে যে সকল প্রসঙ্গে কালক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কৃষ্ণকথা ও রামগীতার চরিত্রই প্রধান। কৃষ্ণ-কথাই হইয়াছিল বেশী। রঙ্গনাথে বেঙ্কটভট্টের ভবনে চাতুর্ম্মাস্য করিয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে বলিতেছেন—

ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

সুতরাং দেখিতেছি, তিনি সেই দেশের সুরে সুর মিলাইয়া কৃষ্ণভজনের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সেখান হইতে শ্রীশৈলে (নীলগিরি?) আসিয়া মহাপ্রভু এক ব্রাহ্মণের সহিত 'নিভৃতে বসিয়া গুপ্তকথা' কহিতেছেন। এই 'ইষ্টগোষ্ঠী'তেও যে কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে মহাপ্রভু যেমন একদিকে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি সেই দেশের ধর্ম্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আসিয়াছিলেন—একথা বলিলে তাঁহার অপূর্ব্ব, অলৌকিক, প্রেম-সম্পদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। যে মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবী শীতল করিয়া দেয়, সেই মেঘ সমুদ্রের বারি শোষণ করিয়াই পরিপুষ্ট হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, বঙ্গদেশ যদি দাক্ষিণাত্য দেশের নিকট ঋণী হয়, তবে সে দেশে গোপীভজন প্রণালী আসিল কোথা হইতে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি দক্ষিণ ভারতের সাধু-মহাত্মগণের পদাবলী বা সঙ্গীতে গোপীভজনের সংবাদ পাওয়া যায়। ইঁহাদের একজন প্রণয়ার্থিনী রমণীরূপে ভগবদ্‌ভজন করিবার

উপদেশ দিয়াছেন। মানবাত্মা ভগবৎ-প্রেমের জন্য যদি লালায়িত হয়, তবে সে লালসার উদাহরণ কেবল নায়কের প্রতি নায়িকার আকুলতাপূর্ণ প্রেম ব্যতীত আর কি হইতে পারে? দক্ষিণ দেশের এই সকল প্রাচীন আলওয়ারদের মধ্যে একজন ছিলেন রমণী। তিনি গোপীর ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। ইঁহার কর্ম্ম ছিল, প্রতিদিন প্রভাতে প্রতিবেশিনীগণকে লইয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের ঘুম ভাঙ্গানো। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য তাঁহার একান্ত আকুতি ছিল এবং তাঁহার রচিত বহু সঙ্গীতে এই আকুতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল সঙ্গীত এখনও সেখানে দেবমন্দিরে এবং গৃহে গৃহে ভজনের সময় গীত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তীকালে মীরাবাই যেমন গিরিধরলালকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তামিলকামিনী আণ্ডালও তেমনি শ্রীরঙ্গনাথে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই রমণী পরিশেষে শ্রীবিগ্রহে লীন হইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথের মন্দিরে এখনও ইঁহার বিগ্রহ পূজিত হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবদের মতে শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ সকল পুরাণের সার। কিন্তু পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান আকারে ভাগবত বহু প্রাচীন নহে।* সুতরাং দক্ষিণ ভারতের মহাজনগণ যে ভাগবত হইতে তাঁহাদের ভক্তিবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না। হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণ অবশ্য ইহা অপেক্ষা প্রাচীন। কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে শ্যামসুন্দরের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা এই শেষোক্ত পুরাণদ্বয় হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বমেঘের সেই অনুপম বর্ণনা স্মরণীয়:

রত্নচ্ছায়া ব্যতিকর ইব
প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ্
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ
খণ্ডমাখণ্ডলস্য।

* কৃষ্ণদাসের ভক্তমালে 'বোপদেব গোস্বামী' দ্রষ্টব্য।

যেন শ্যামং বপুরতিতরাং
কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিত রুচিনা
গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥

মেঘের গায়ে ইন্দ্রধনুর স্পর্শ লাগিলে শিখিপুচ্ছধারী গোপবেশ বিষ্ণুর মত খাইবে!

কালিদাসেরও পূর্ব্বে ভাসের বালচরিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী পড়িলে াগবতের জন্মখণ্ডই মনে পড়ে। সুতরাং বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টের জন্মের র্বে শ্রীকৃষ্ণলীলা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সেই সকল উপাদান হইতে ক্ষিণ ভারতীয়েরা তাঁহাদের ভজন-প্রণালী গঠন করিয়াছিলেন। আলওয়ার াধুদের দ্বারা, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনের দ্বারা এই ভজন প্রণালী রিপুষ্ট হয়।

ইহারই ধারা রামানন্দ রায়ের মধ্য দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনে প্রবাহিত ইয়া বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। ভক্তিবাদ সেই হইতে নূতন আকার রণ করিল। ইহা শুধু ভগবানে প্রীতি বা অনুরাগ মাত্র রহিল না, মানবীয় প্রেম-নিকষে কষিত হইয়া বিশুদ্ধভাবে ভগবানে অর্পিত হইল। রসশাস্ত্রে এই প্রেম মধুর, শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস নামে অভিহিত হয়। উন্নত অর্থাৎ বিশুদ্ধ ঙ্গার রসে পরিণত ভগবদ্‌ভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ করুণাবশে অবতীর্ণ ইয়াছিলেন, ইহাই বৈষ্ণব দার্শনিকদিগের অভিমত। এই ভক্তিসম্পদ্ পূর্ব্বে কেহ কখনও প্রচার করেন নাই।*

বস্তুত গোপীপ্রেম এরূপভাবে আর কখনও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই।

* অনেকেই জানেন যে, বঙ্গদেশীয় কথকেরা 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ'—এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি বৃত্তি না করিয়া পাঠ বা কথকতা আরম্ভ করেন না। ভিন্নদেশীয় পাঠকেরা কিন্তু এই শ্লোক বৃত্তি করেন না। ইহা হইতেও অনুমান হয় যে, শুদ্ধ শৃঙ্গার-রস-সমন্বিত ভক্তিধর্ম্মের প্রচার াপ্রভু হইতেই বঙ্গদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

বাঙ্গালীর ঠাকুর প্রেমভক্তির এই যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করিলেন, ইহা আপনার মাধুর্য্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিল।

প্রেম, প্রীতি, অনুরাগের অগ্নিপরীক্ষা বিরহে। বিরহের তীব্রতার দ্বারা প্রেমের গভীরতা যেমন বুঝিতে পারা যায়, এমন আর কিছুতে নহে। বিরহের ঘোর নৈরাশ্য, মিলনের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা হইতেই প্রেমের পরিমাণ বুঝা যায়। মহাপ্রভুর জীবনে এই বিরহ এবং আকাঙ্ক্ষা যেমন জীবন্ত ও জ্বলন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এমন আর কখনও দেখা যায় নাই। এই অভিনবত্ব তিনি দক্ষিণদেশ হইতে প্রাপ্ত হন নাই। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব। প্রধানতঃ বাঙ্গালী মহাজনগণের পদাবলী হইতে তিনি প্রেমের এইরূপ অপূর্ব্ব উন্মাদনা লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি শ্রীরাধার প্রেমের যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন, মহাপ্রভু জীবন্তভাবে চক্ষুর সমক্ষে সেই চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিলেন। সেই যে—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

* * * *

বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঙায়ব
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

বিরহিনী রাধার এই চিত্রই মহাপ্রভু অঙ্গীকার করিলেন। বাদল ধারার মত অশ্রু বহিয়া মুখ বুক ভাসাইয়া দিতেছে, ইহাই মহাপ্রভুর চিত্র।

যুগায়িতং নিমেষেণ
চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।

বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্মের ইহাই মর্ম্মকথা।

চণ্ডীদাসের—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

প্রেমের এ এক অপূর্ব্ব ছবি! এমন ছবি আর কেহ জগতে আঁকিয়াছেন কি-না জানি না। বিচ্ছেদের আশঙ্কায় প্রাণ-প্রিয়কে কাছে পাইয়াও নেত্র-নীর উছলিয়া উঠিতেছে। এই মূর্ত্ত প্রেমই বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাধনার আদর্শ।

এই ধর্ম্মে কৃষ্ণ পরম-আরাধ্য। প্রেম সেই আরাধনার সাধন বা উপায়। উচ্চগ্রামে বাঁধা যন্ত্রের মত তনু-মন যখন প্রেমের মোহন স্পর্শে ঝঙ্কার করিয়া উঠে, তখনই উপাস্য-উপাসকের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় পরম মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সমস্ত হৃদয়-মন-ইন্দ্রিয় দিয়া তাঁহাকে আস্বাদন করা যায় বলিয়াই তাঁহার হৃষীকেশ নাম সার্থক।

হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাম যখন সকল প্রকার উপাধি-বর্জ্জিত হইয়া কেবল তাঁহাতেই বিলগ্ন হয়, তখন সেই নির্ম্মল সেবার নাম হয় ভক্তি। ইহাই বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম।

ভক্তি-ধর্ম্ম ও রাধাভাব

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
যুগল-বিলাস-স্মৃতি সার;
সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নেই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি-সার।

প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায় শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর এইভাবে ভক্তিধর্ম্মের মর্ম্ম-কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। স্মরণ মনের প্রাণস্বরূপ। দেহ যেমন প্রাণ বিনা বৃথা, মনও তেমনি স্মরণ বিনা নিরর্থক। স্মরণের মধ্যে সার বস্তু মধুর হইতেও মধুর বৃন্দাবনধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। ইহাই সাধ্য, ইহাই

সাধন ; ইহা ব্যতীত অন্য কোনও সাধ্য-সাধন নাই। এই তত্ত্বই সর্ব্ববিধ বিধি-উপদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বাঙ্গালার এই প্রেমভক্তি এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। ইহার সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক আলোচনা যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু সাধারণ কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে সে সকল সব সময়ে সুলভ নহে। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি

আমার বক্তব্য সংক্ষেপে এই :—

(১) বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম এক অভিনব বস্তু। শাণ্ডিল্যসূত্র, নারদ-পঞ্চরাত্র, ভগবদ্‌গীতা এবং ভাগবতের মধ্য দিয়া যে ভক্তিধর্ম্মের সূত্র পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম তাহারই পরিণতি।

(২) শ্রীচৈতন্য এই অভিনব প্রেমধর্ম্ম দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য গোপীভাব বা রাধাভাব।

(৩) এই রাধাভাবের ব্যাখ্যা দেখিতে পাই রামানন্দ-মিলন সংবাদে রামানন্দ যে কান্তাভাবকে সাধ্যশিরোমণি বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহাই অঙ্গীকার করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম গড়িয়া উঠিল।

(৪) রামানন্দ যে কান্তাভাবের কথা বলিলেন, তাহার মূল দাক্ষিণাত্য দেশেই পাওয়া যায়—যথা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে এবং আলওয়ারদিগের সঙ্গীতে।

(৫) মহাপ্রভুর হৃদয়ে প্রেমের যে বীজ দাক্ষিণাত্যদেশে উপ্ত হইল তাহা বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি চণ্ডীদাসের ও বিদ্যাপতির রসপ্রপাতে ফলবান্ তরুতে পরিণত হইল।

শাণ্ডিল্যসূত্রে যে আকারে আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা সম্ভবতঃ খুব প্রাচীন নহে। তবে শাণ্ডিল্য যে একজন প্রাচীন ঋষি, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে জানা যায়। শাণ্ডিল্য পাঞ্চরাত্র মতের প্রবর্ত্তক, ইহা শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ ভগবদ্‌গীতা ভক্তিধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন।

ভগবদ্‌গীতারও যে একটি জ্ঞানপরা ব্যাখ্যা হইতে পারে, শঙ্করমতাবলম্বী

বা যোগদর্শনের পক্ষপাতী পণ্ডিতগণ ভগবদ্গীতা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রাধান্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। এখনও কোনও কোনও নবীন মঠাধিকারী জ্ঞানের মুখ্যত্ব ও ভক্তির গৌণত্ব প্রচার করিতে তৎপর। বস্তুতঃ গীতায় কি জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? একবার বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং
স মে যুক্ততমো মতঃ।

আমি ঐ শ্লোকের মর্ম্ম যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা এই, জ্ঞানী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ; সুতরাং জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ।

বহুনাম্ জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম দুইটি শ্লোক এই—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

হে পার্থ, আমাতে মন আসক্ত হইলে (অর্থাৎ আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে) এবং একান্তভাবে আমার শরণাপন্ন হইলে, আমাকে নিঃসন্দেহে এবং সম্পূর্ণভাবে কেমন করিয়া জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহকৃত জ্ঞান কিরূপ, তাহা অশেষপ্রকারে বলিব, তাহা জানিলে আর জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এখানে কথা এই যে, ভক্তি আর জ্ঞান ত পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। যে ভক্তির দ্বারা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে, আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই আমাকে জানিতে পারে ইহাই অভিপ্রেত। এখানে ভক্তই যে উত্তমাধিকারী এবং ভক্তিশূন্য জ্ঞানে যে ভগবান্কে জানা যায় না, তাহাই বলা হইতেছে।

উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

এই বাক্যের সহিত যে কোনও বিরোধ নাই, ইহা দেখাইবার জন্যই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, আমাতে একান্তভাবে মনোনিবেশ করিলে তবেই আমি তোমাকে সেই দুর্লভ জ্ঞান প্রদান করিতে পারি, যাহার পরে আর কিছু জানিবার থাকে না।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

* * *

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

যে সকল ব্যক্তি আমাতে প্রাণমন সমর্পণ করেন, (মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা) আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন এই প্রশ্নটিই করিয়াছিলেন :—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

যে সকল ভক্ত তোমাতে সর্ব্বদা তদ্‌গতচিত্ত হইয়া তোমার উপাসনা করে, আর যাহারা তোমাকে অব্যক্ত ও অব্যয় ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করে, ইহাদের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী ?

এই প্রশ্নের ভূমিকাস্বরূপ শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন :—

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে 'মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ' ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্ব-মুক্তং, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি' ইত্যাদিনা চ, তত্র তত্রৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতং তথা 'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে' ইত্যাদিনা, 'সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব

'জিনং সন্তরিষ্যসি' ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বম্ উক্তম্, এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তং প্রতি অর্জ্জুন উবাচ।

অর্থাৎ জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়কেই কোনও কোনও শ্লোকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ যোগী কে, ইহাই অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভগবান তাহার উত্তরে বলিলেন :—

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

ভগবান্ এই যে 'পরা শ্রদ্ধা' বলিলেন, ইহারই নাম ভক্তি; যদি কোনও সংশয় থাকে, তাহা নিরসনের জন্য ভগবান বলিতেছেন,—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

এইরূপ অসংশয়িতভাবে ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া াদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ।

শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।

* * * *

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥

অর্থাৎ ভক্তির প্রভাবে আমার স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপিত্ব জানিতে পারে।

জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার দুইটি পথ। একান্ত পৃথক না হইলেও মুখ্যত্ব ও গৌণত্ব ভেদে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা যায়। জ্ঞান ও ভক্তির প্রাধান্য লইয়া মতভেদ আছে, থাকিবেও। কিন্তু গীতার অভিপ্রায় স্থিরভাবে বিচার করিলে ভক্তির প্রাধান্যই দেখা যায়।

শ্রীধরস্বামিপাদ জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিতে গিয়া তাঁহার সুবোধিনী ীকার উপসংহারে বলিয়াছেন—

ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥

যিনি ভগবানে ভক্তি-যুক্ত, ভগবানের প্রসাদে তাঁহার আত্মতত্ত্ববোধ হয় এবং আত্মতত্ত্ববোধ হইলে অনায়াসে তিনি মোক্ষ লাভ করেন।

এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা মোক্ষকেই একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে করেন এবং আত্মজ্ঞান তাহার সাধনস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতের সহিত গীতার কোনও বিরোধ নাই। কারণ, ভক্তিমান ভগবানের অনুগ্রহে আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং তাহার যে অবশ্যম্ভাবী ফল মোক্ষ, তাহাও অনায়াসে প্রাপ্ত হন। ভাবার্থ এই যে, ভক্ত মোক্ষ চাহেন না, কিন্তু ভক্তিযোগের ফলে মোক্ষ আপনি করতলগত হয়।

এখানে প্রধান কথা এই যে, মহাপ্রভুর ধর্ম্মমতে ভক্তির যে অভিনব এবং স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, অন্যত্র তাহা নাই। মহাপ্রভু যে নূতন প্রণালীতে সাধ্য নির্ণয় করিলেন এবং রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া এক অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিলেন, তাহাই আমার প্রতিপাদ্য। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই; ভাগবত হইতে এই চৈতন্যপ্রচারিত ধর্ম্মের ধারা আসিয়াছে।*

স্বীকৃত্য রাধিকাভাবাকান্তী পূর্ব্বসুহৃৎকরে।
অন্তর্বহীরসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপি সন্ ॥

—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মমত কি, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যায়;—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।

* রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দের সমালোচনা দ্রষ্টব্য। —উদয়ন, পৌষ ১৩৪১

শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

মহাপ্রভুর মতে শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য, তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন ; সেই বৃন্দাবন-বাসিনীরা যে মধুরভাবে তাঁহাকে ভজন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ; এই ধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবত, এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ প্রেম।

এই মতের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। মধ্বাচার্য্য শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন আদিগুরু বলিয়া কথিত হয়েন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত নিম্নলিখিত শ্লোকে পাওয়া যায় :

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণহরেরনুচরাঃ নীচোচ্চভাবং গতঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং
হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ ॥

মধ্বমতে হরি আরাধ্য, (চৈতন্যমতে শ্রীকৃষ্ণ) ; মধ্বমতে পুরুষার্থ বা কাম্য নিজ সুখানুভূতিরূপ মুক্তি, তাহার সাধন বিশুদ্ধ ভক্তি (চৈতন্যমতে পুরুষার্থ বা একমাত্র কাম্য প্রেম এবং তাহার সাধন গোপীর ভাবে ভজন)। মধ্বমতে ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রমাণ বেদ (চৈতন্যমতে ভাগবত)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বাচার্য্য হইতেও মহাপ্রভু এক নূতন পন্থা প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই পন্থার স্বরূপ কি, তাহাই আমার পূর্ব্ব-প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। 'রম্যা কাচিদুপাসনা'—এখানে রম্য অর্থে—যাহা আমাদের রসানুভূতি বা Aesthetic sentimentকে পরিতৃপ্ত করে। 'কাচিৎ' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা অনির্ব্বচনীয়। ব্রজবধূরা কি ভাবে ভজন করিতেন, তাহা মুখে বলিয়া বুঝানো যায় না। তাঁহাদের দাসীর দাসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইলে জানিতে পারা যায় যে, গোপীদের ভজন কি বস্তু। ইহাই বৈষ্ণব আচার্য্যগণের

অভিপ্রায়। [প্রেমকে পুরুষার্থ বলায় বুঝিতে হইবে যে, এক নূতন রাজ্যের বার্ত্তা মহাপ্রভু জগতে প্রচার করিলেন। 'মুক্তি' 'মুক্তি' আবহমানকাল আমাদের দেশ শুনিয়া আসিতেছে। হঠাৎ এক নূতন সংবাদ আসিল 'প্রেম'। সম্ভবতঃ মাধবেন্দ্র পুরী এই 'প্রেম'তত্ত্বের আগমনী গাহিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য ঈশ্বর পুরীকে তিনি দীক্ষা দিয়া—

'বর দিলা কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'।

মহাপ্রভু এই ঈশ্বর পুরীর শিষ্য।] বৈষ্ণবরা যখন 'প্রেম'কে অঙ্গীকার করিলেন, তখন খ্রীষ্টানরা বলিয়া উঠিলেন, এ ত আমাদেরই জিনিষ ভারতবর্ষ এই প্রথম তাহা আত্মসাৎ করিল। মহাভারতে নারদের শ্বেতদ্বীপ-গমন এই চৌর্য্যাপরাধের প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

কিন্তু ব্যাপার এত সহজ নহে। মহাপ্রভুর ভাষায় যে 'প্রেম' মূর্ত্ত হইল, তাহা সাধারণ প্রেম নহে। [এ প্রেমের কষ্টিপাথর—বিরহ। বিরহের ব্যথা তীব্র হইলে প্রেমের গভীরতা সপ্রমাণ হয়। নয় ত প্রেম প্রেমই নয়। মুরারি গুপ্ত বলিলেন—

খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে·
বঁধু বিনা আন নাহি ভায়।]

মহাপ্রভুও বলিলেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

গোবিন্দ-বিরহে এক নিমেষ যুগযুগান্ত বলিয়া মনে হয়, সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া মনে হয়! ইহাই প্রেমের আদর্শ। যে প্রেমে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, যে দুর্লভ প্রেম ভগবানেরও আস্বাদ্য, সে প্রেম কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?

[অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।

যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য় ॥

বিরহে হোন্তম্মি ণ কো জীঅই"—এমন প্রেম হইলে তার বিরহে কেহ বাঁচিতে পারে না। ইহাই গোপীপ্রেমের আদর্শ।

মহাপ্রভু নিজের জীবনে সেই আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন—

শ্রীরাধার ভাব সার আপনে করি অঙ্গীকার
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল।

* * * *

এই গুপ্তভাব সিন্ধু ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু
হেন ধন বিলাইল সংসারে।

* * * *

কহিবার কথা নহে কহিলে কেহো না বুঝয়ে
হেন চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে
হয় তার দাসানুদাস সঙ্গ ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।

কবিকর্ণপূর প্রতাপরুদ্র মহারাজের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

আস্তঃ কোঽপি পুমান্
নবোৎসুক-বধূকৃষ্ণানুরাগব্যথা-
স্বাদী চিত্রমহো বিচিত্র-
মহহো চৈতন্যলীলান্বিতম্।

এই যে 'নবোৎসুক-বধূকৃষ্ণানুরাগব্যথা,' ইহাই 'রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।'

শ্রীমদ্ভাগবতে 'প্রেম' আছে। গোপীদের প্রেমের পরাকাষ্ঠা আছে। কিন্তু নাই রাধাভাবের ভজন। সেই আত্মহারা প্রেমের অর্ঘ্য সাজাইয়া

ভগবচ্চরণে অর্পণ করিবার পন্থা প্রদর্শন করিলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি যে এই প্রেমকেই পরম পুরুষার্থ বলিলেন, ইহাই ভক্তিধর্ম্মের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। আমার প্রতিপাদ্য এই যে, সেই নূতন তত্ত্ব— বিশেষতঃ কান্তাভাবের ভজন সম্বন্ধে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যদেশের ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তিনি অনেক সময়ে এই ভাব আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ রায় রামানন্দ সাধ্যসাধনতত্ত্ব-নির্ণয় প্রসঙ্গে এই সুন্দর ভাবটির মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করেন :—

'রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।'

যাহা হউক, ভক্তিধর্ম্মের প্রভাব যে দাক্ষিণাত্যদেশ হইতে আসিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই ভক্তিধারা বৃন্দাবনের পথে বাঙ্গালায় পঁহুছিলেও ইহার মূল প্রস্রবণ বোধ হয় দাক্ষিণাত্যে।' সমালোচকও স্বীকার করেন 'শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনার সময় অন্যান্য দেশে শুদ্ধাভক্তিসম্পন্ন লোক যখন অল্পসংখ্যক ছিল এবং তাম্রপর্ণী এবং কাবেরীর তীরে দ্রবিড়দেশে বহুসংখ্যক ছিল, তখন অনুমান করা যাইতে পারে, এই ভক্তির জন্মস্থান দ্রবিড় দেশ।'*

কান্তাভাবের উপাসনাও দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছে। রাধানাম পূর্ব্বে থাকিলেও, রামানন্দ-মিলনের আগে 'রাধাভাব' লইয়া এমন প্রেম-ভক্তির ধর্ম্ম গড়িয়া উঠে নাই। ইহাই আমার বক্তব্য! চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায়, মহাপ্রভু 'গোপী' 'গোপী' বলিয়া এক সময়ে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে রাধাভাবের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

* রমাপ্রসাদ চন্দ—মাসিক বসুমতী

প্রেমসম্পুট

[আঁধারের নিতল নীল বুকের মাঝে তারাগুলি নিমিখ-শূন্য দৃষ্টিতে জাগিয়া থাকে, রহস্যাচ্ছন্ন কালের বক্ষেও তেমনি কতকগুলি উজ্জ্বল চরিত্র অম্লান জ্যোতিতে দেদীপ্যমান থাকে। শ্রীরাধা সেইরূপ একটি চরিত্র। শ্রীরাধা বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ।] তিনি কৃষ্ণময়ী। কৃষ্ণ-প্রেম বলিতে যাহা বুঝায় তিনি তাহার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। তিনি সর্ব্বাংশে কৃষ্ণ-স্বরূপিণী।

'সর্ব্বাংশৈঃ কৃষ্ণসদৃশী তেন কৃষ্ণ-স্বরূপিণী'—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

[প্রেমের স্বভাব এই যে উহা দুইটি হৃদয়কে গলাইয়া এক করিয়া দেয়। যতক্ষণ এই একত্ব সাধিত না হয়, ততক্ষণ প্রেম হইল না।] শ্রীরাধা

কৃষ্ণ প্রাণাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী—ঐ

কৃষ্ণ হইতে অতিরিক্ত কোনও সত্তা তাঁহার নাই। তাই তাঁহাকে পণ্ডিতেরা বলেন 'প্রেম-শিরোমণি' 'মহাভাবস্বরূপিণী' 'প্রেমরসের সীমা'। কল্পনা প্রেমের এতদপেক্ষা কোনও উজ্জ্বলতর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে নাই। সাংসারিক প্রেমের কলঙ্ক-কালিমাময় নিকষে সোনার রেখাটির মত এই প্রেমের চিত্র। [এই প্রেম-চিত্রের সম্মুখে স্বকীয়া পরকীয়া প্রভৃতি প্রশ্ন উঠিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। প্রেম যেখানে পাগলা ঝোরার মত শত শত ধারায় ছুটিয়া সব ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেখানে নীতিবাদীদের সমস্ত সংশয় বিতর্ক স্তব্ধ হইয়া যায় না কি? গোষ্পদ বা পুষ্করিণীর গভীরতা ও দৈর্ঘ্য সমালোচনার বিষয় হয় বটে, কিন্তু মহাসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া কেহ কি সে সকল কথা একবারও ভাবে? রাধা-প্রেম ঐ পাগলা ঝোরার ন্যায় সকল বাধাকে উপেক্ষা করে, গভীরতায় সমুদ্রকেও নিন্দা করে, নিঃস্বার্থতায় সমস্ত উপমাকে হার মানায়।]

এই প্রেমের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল পদাবলী সাহিত্যে। পদাবলী সত্যই প্রেমসম্পুট বা প্রেমের রত্নকৌটা। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রেমের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা বর্ণে ও বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। চৈতন্যদেব এই প্রেমের পরিমলে পাগল। বৈষ্ণবেরা বলেন তিনি ভগবানের অবতার।

কিন্তু এ এক নূতন অবতার—এ প্রেমের অবতার। তিনি প্রেমের ঠাকুর। এমন অবতারের কথা পূর্ব্বে কেহ কখনও শুনে নাই। মহাপ্রভু সন্ন্যাসী, কিন্তু প্রেমিক। প্রেমিক কখনও সন্ন্যাসী হইতে দেখা যায় না, সন্ন্যাসী কখনও প্রেমিক হয় না। কিন্তু গোরা কখনও প্রেমে অজ্ঞান, কখনও বিরহে ব্যাকুল।

কি ভাব উঠিল মনে কান্দিয়া আকুল কেনে
সোনার অঙ্গ ধূলায় লুটায়।

এই যে চিত্র, ইহার সহিত শ্রীরাধা-চিত্রের সাদৃশ্য বড় সুস্পষ্ট। সেই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গকে বলে 'রসরাজ মহাভাব'। তিনি প্রেমিক, রসিক-শেখর, এই জন্য রসরাজ। তিনি প্রেমের চরম অভিব্যক্তি, এই জন্য মহাভাব।

এই যে প্রেম ও রসে মাখামাখি, ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ় ও পরমাস্বাদ্য রহস্য। ইহা হইতে মধুর ও উপভোগ্য আর কিছুই নাই। অন্য সমস্তই বাহ্য। প্রেম-যমুনার মূলপ্রপাত খুঁজিতে গিয়া মহাপ্রভু যখন উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর শিখর অতিক্রম করিয়া রাধা-প্রেমরূপ যমুনোত্রীর স্বচ্ছ ধারায় অবগাহন করিলেন, তখন আর কোনরূপ বিচার রহিল না। এইখানে সমস্ত জিজ্ঞাসা, সমস্ত কৌতূহল মুহূর্ত্তে নিরস্ত হইয়া গেল!

শ্রীচৈতন্যের পরে এই রাধাপ্রেমের মাধুর্য্য কাব্যে ও ছন্দে আরও বিকসিত হইয়া উঠিল। গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতির

কাব্যে এই প্রেমের মাহাত্ম্য নানা ছন্দে, নানা ভাবে বর্ণিত হইল। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ 'প্রার্থনা'র পদে বলিলেন :—

হরি হরি আর কবে হেন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে আহিরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব।

ইহারও পরে, পণ্ডিত প্রবর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'প্রেম-সম্পুট' নামক গ্রন্থে এই রাধা-প্রেমের একটি সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা-ভঙ্গীটি এরূপ চিত্তাকর্ষক যে, উহা একটু বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীরাধার মন পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী-বেশ ধারণ করিয়া বৃষভানু রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাধিকা সেই অবগুণ্ঠনবতী যুবতীকে দেখিয়া তাঁহার সখীদিগকে বলিলেন—'জানিয়া আইস, ঐ রমণী কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন।' সখীগণ যুবতীকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলে তিনি মৌনী রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। তখন রাধিকা তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'অয়ি শুভে! আপনি কে? এবং কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছেন? আপনার রূপ দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের কুলবধূ; আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।'

এইরূপ ভাবে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া রমণী-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'আমি দেবী, স্বর্গে আমার নিবাস। আমি যে-নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি তাহা শ্রবণ কর।

'তোমাদের এই বৃন্দাবনে যে বেণুধ্বনি হয়, তাহার বিক্রম স্বর্গপুরে প্রবেশ করিয়া চিরযৌবনা দেবাঙ্গনাগণকেও বিভ্রান্ত করিয়াছে। আমি সেই বংশীধ্বনির অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছি। কয়েকদিন বংশীবটে

অবস্থান করিয়া তোমাদের অনুপম বিবিধ বিলাসও দর্শন করিলাম। অবশ্য কোনও পরপুরুষ আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।'

ইহা শুনিয়া শ্রীরাধা পরিহাস করিয়া সেই নবীনা যুবতীকে বলিলেন "গোপনে আপনি যখন শ্রীহরির লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তখন আপনার আর পরপুরুষের প্রয়োজন কি ?"

দেবাঙ্গনাবেশী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'সখি, তোমার সঙ্গে পরিহাসে কে পারিবে ? তুমি সর্ব্বগুণযুক্তা। তুমি মানবী হইলেও, সুরাঙ্গনাগণ তোমার গুণকথা নতমস্তকে শ্রবণ করেন। বৈকুণ্ঠেও তোমার ন্যায় প্রেমবতী কেহ নাই। আমি কৈলাসে হৈমবতীর সভায় তোমার অনেক গুণ-বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি।

'কিন্তু আমি আসিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে আমার দুঃখের অবধি নাই।

'আমি দেখিলাম সুচতুরশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বঞ্চনা করিয়া অন্য রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন। তোমাকে সঙ্কেত-স্থানে আগমন করিতে বলিয়া তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে তোমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য নায়িকার কুঞ্জে নিশিযাপন করিলেন। এইরূপ কপটাচারী শঠের প্রতি তোমার এত অনুরাগ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছি।'

শ্রীমতী ধীর ভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া কুমারসম্ভবের পার্ব্বতীর ন্যায় ক্রোধে স্ফুরিতাধর হইলেন না। ছদ্মবেশী শিবের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া পার্ব্বতী ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন নাই। একবার তিনি যে কারণে দেহত্যাগ করিয়া কর্ণযুগলকে শাস্তি দিয়াছিলেন, আবারও প্রায় তেমনি দশা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীরাধিকা জানিতেন যে, তাঁহার প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে পারা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই তিনি প্রতিবাদরূপে কেবল বলিলেন, 'সুন্দরি, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তোমারও এই একটি গুণ দেখিতেছি যে, তুমি আমার সমক্ষে আমার প্রিয়তমের এত নিন্দা

করিলেও আমি তোমার প্রতি ক্রমশঃ অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছি। তোমার উপর আমার ক্রোধ হইতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য।

'তবে তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন শোনো। আমার প্রিয়তম যে সঙ্কেতকুঞ্জে আমাকে আহ্বান করিয়া নিজে আগমন করিতে পারিলেন না, ইহাতে তাঁহার দোষ কিছুমাত্র নাই। অন্য কর্তৃক নিবারিত হইয়াই তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সুখী হইতে পারেন নাই। আমি যে সজল নয়নে নিশিজাগরণে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি, এই চিন্তা সর্ব্বদা মনে হওয়াতে তিনিও সেই রজনী অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি আমার নিকট আসিলে আমি যে অভিমান করিয়াছিলাম, তাহা কেবল প্রিয়তমের দুঃখ স্মরণ করিয়া। আমার সেই সকোপ তিরস্কার তিনি অত্যন্ত উপভোগ করিয়াছিলেন।

'আর যে রাসমণ্ডল হইতে আমাকে বনান্তরে লইয়া গিয়া হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার কথা বলিলে, সখি, তাহাতে প্রাণাধিকের কিছুমাত্র দোষ নাই। কেন, তাহা বলিতেছি—

'তিনি আমাকে লইয়া যখন অন্যত্র চলিয়া গেলেন, তখন আমার অন্য সখীরা আমার প্রতি স্বভাবতঃই ঈর্ষ্যাপরায়ণা হইয়াছিল। সেইজন্য প্রিয়তম আমাকে নানাপ্রকারে আনন্দ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অভিপ্রায় এই যে, অন্য গোপীরা আমাকে তদবস্থায় দেখিলে তাহাদের ঈর্ষ্যা ত দূর হইবেই, অধিকন্তু কৃষ্ণবিরহে আমার কি দশা হয়, তাহা দেখিয়া তাহারা আমার প্রেমের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিবে। সুতরাং হে সুন্দরি! আমার প্রাণবল্লভের কোনও অপরাধ নাই। তিনি 'প্রেমাম্বুধি গুণমণিখনিঃ', তাঁহার তুলনা নাই।

শ্রীমতীর এই সকল যুক্তি শুনিয়া সেই যুবতী বলিলেন,

'দোষা অপি প্রিয়তমস্য গুণা যতঃ স্যুঃ
তদ্দত্তকষ্টশতমপ্যমৃতায়তে যৎ।

তদ্দুঃখলেশকণিকাপি যতো ন সহ্যা
ত্যক্ত্বাত্মদেহমপি যং ন বিহাতুমীষ্টে।
যোঽসন্তমপ্যনুপমং মহিমানমুচ্চৈঃ
প্রত্যায়য়ত্যনুপদং সহসা প্রিয়স্য ॥
প্রেমা স এব…………

যাহাতে প্রিয়তমের দোষগুলিও গুণের ন্যায় প্রতীত হয়, যাহাতে তাঁহার প্রদত্ত শত শত কষ্টকেও অমৃত বলিয়া মনে হয়, যাহাতে প্রিয়তমের দুঃখলেশ-কণিকাও সহ্য করিতে পারা যায় না, যাহার নিমিত্ত নিজের দেহপাত হইলেও প্রিয়তমকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না যাহা প্রিয়তমের মহিমা না থাকিলেও পদে পদে অনুপম মহিমা অনুভব করাইয়া থাকে, তাহারই নাম প্রেম…

'রাধে, বুঝিলাম ইহাই তোমার প্রেমের রহস্য। সত্যই তুমি প্রেমবতী। হৈমবতীর সভায় যাহা শুনিয়াছিলাম যে, তোমার ন্যায় প্রেমিকা জগতে নাই, আজ তাহার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার সন্দেহ যাইতেছে না; কৃষ্ণের মনের অভিপ্রায় তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে? তিনি যে-কারণে তোমার নিকট আসিতে পারেন নাই অথবা যে অভিপ্রায়ে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে? তোমার কি অচ্যুত-যোগ সিদ্ধ আছে, যাহার দ্বারা অপরের মনের কথা জানিতে পারা যায়?'

তখন রাধিকা বলিলেন, 'হে সুন্দরি, তোমরা দেবাঙ্গনা, অচ্যুত-যোগ-সিদ্ধিতে তোমাদের প্রয়োজন থাকিতে পারে; আমি মানবী, আমরা উহা কোথায় পাইব? প্রিয়তমের মনের ভাব জানিতে আমার কি কোনও যোগের প্রয়োজন হয়? আমরা যে পরস্পরের মনোভাব জানিতে পারিব, ইহা বেশী কথা কি?

একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেঽত্যগাধে
একাসুসংগ্রথিতমেব তনুদ্বয়ং নৌ।

কস্মিংশ্চিদেক সরসীব চকাসদেক-
নালোত্থমব্জযুগলং খলু নীলপীতম্ ।

সখি, একটি সরোবরে নীলপীত দুইটি পদ্ম একনাল হইতে উত্থিত হইলে যেমন হয়, তেমনি অতি অগাধ রসপূর্ণতম একটি আত্মা হইতে আমাদের দুই তনু আবির্ভূত হইয়া একই প্রাণসূত্রে তাহা সংগ্রথিত আছে। এইজন্যই একের মনের ভাব অপরের মনে তৎক্ষণাৎ প্রতিফলিত হয়।'

তখন সেই মোহিনী বলিলেন, 'প্রিয় সখি, তুমি যাহা বলিলে তাহা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি ইহার প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ না পাইলে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না।' রাধিকা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমার চাই বল?'

তখন সেই সুন্দরী কৌতুক সহকারে বলিলেন, 'আচ্ছা, কৃষ্ণ নিকটেই থাকুন, বা দূরেই থাকুন, তুমি তাঁহাকে একটি বার স্মরণ কর। তিনি যদি তোমার আহ্বান শুনিয়া তোমার নিকটে এই মুহূর্তে আগমন করেন, তাহা হইলে আমার সংশয় দূরীভূত হইবে। হে কৃষ্ণপ্রিয়ে, এ সময়ে গুরুজনের এখানে আগমনের সময় নহে, অতএব তুমি নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাকে একটিবার স্মরণ কর, কৃষ্ণ এখানে আসুন, আমরা দেখিয়া আনন্দলাভ করি।'

এইরূপভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া বৃষভানু-নন্দিনী নেত্রযুগল নিমীলিত করিয়া নিজ কান্তের ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া যোগিনীর মত মৌনাবলম্বন করিলেন।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নারীবেশ পরিত্যাগ করিয়া 'ধ্যানস্তিমিত নয়না গলদশ্রুবয়না' শ্রীরাধিকাকে মুহুর্মুহু চুম্বন করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৬০৬ শকে এই প্রেমসম্পুট কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্যে কবি যে প্রেমের বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য। অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগণও শ্রীরাধা-প্রেমের চিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যশোদা যেরূপ বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি,

রাধিকা তেমনই প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি। বৈষ্ণব কবিরা যেন হৃদয়ের শোণিত বিন্দু দিয়া এই প্রেমের ছবি আঁকিয়াছিলেন। জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাসের পদাবলী হইতে এই প্রেম-পরিকল্পনার একটু নমুনা দিতেছি।

[কিশোরী কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন। কিন্তু লজ্জাবিজড়িত নবোঢ়ার ন্যায় সখীগণকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। সখীরা একদিন অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন—

লহু লহু মুচকি হাসি চলি আওলি
পুন পুন হেরসি ফেরি।
জনু রতি পতি সঞে মীলল রঙ্গভূমে
ঐছন কয়ল পুছেরি॥
ধনি হে বুঝলুঁ এ সব বাত।
এতদিনে তুহুঁক মনোরথ পূরল
ভেটলি কানুক সাথ॥

তুমি মৃদু মৃদু মুচকি হাসিয়া চলিয়া আসিতেছ এবং পুনঃ পুনঃ পিছনে ফিরিয়া চাহিতেছ। তোমার রঙ্গ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন রঙ্গমঞ্চে রতি মদনের সহিত মিলিত হইয়াছেন। মদন অনঙ্গ বলিয়া তাঁহাকে দেখা যায় না কিন্তু রতির অভিনয় দেখিয়া যেমন অনঙ্গের অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়, তোমার হাসি-হাসি ভাব ও পুনঃপুনঃ ফিরিয়া চাওয়া দেখিয়া তোমার প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের কথাও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বুঝিলাম যে, এতদিনে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে এবং নাগরেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমার দেখা হইয়াছে।

হাম সব নিজ জন কহসি রাতিদিন
সো সব বুঝলুঁ আজে।
জ্ঞান দাস কহ সখি তুঁহু বিরমহ
রাই পায়ল বহু লাজে॥

।খীগণ বলিতেছেন—আমরা তোমার একান্ত আপনার জন, একথা রাত্রি-দিন বলিয়া থাক। কিন্তু আজ সে সকল বুঝা গেল! অর্থাৎ তোমার প্রেমের কথা আমাদিগের নিকট গোপন করিতেই ব্যস্ত। ইহাকে কি াাপনার জন বলে? জ্ঞান দাস বলিতেছেন, সখি তুমি আর বলিও না, াাধিকা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছেন।

সখীগণ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গিনী মাত্র নহেন, তাঁহারা াই প্রেমের কারিকর।] এই পিরীতিরত্ন ভাঙিলে তাহা জোড়া লাগাইতে 'হারাই পটু। বস্তুতঃ সখী নহিলে এই প্রেমলীলা অসম্পূর্ণ থাকিত। বীন্দ্রনাথ শকুন্তলার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, [শকুন্তলা-চিত্র অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তেমনি আমরা বলিতে পারি, সখী ব্যতীত রাধার চিত্র কখনও পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিত না।] সখীগণ শ্রীরাধার অনেকখানি। [সখীগণের অনুযোগের উত্তরে রাধিকা ালিতেছেন—]

দরশনে লোর নয়ন যুগ ঝাঁপ।
করইতে কোর দুহু ভুজ কাঁপ॥
দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ॥
চেতন না রহ চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছে রভস-রস-কেলি।

াখি, তোমরা আমাকে মিছাই দোষ দিতেছ। আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাদের নিকট কিছুই গোপন করি নাই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার প্রণয়ের কথা তোমরা জানিতে চাহিতেছ, কিন্তু আমি কি বলিব? যাঁহাকে দেখিলে নয়নযুগল অশ্রুতে ভরিয়া যায় (ভাল করিয়া দেখিবার পক্ষে বাধা জন্মায়) যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলে ভুজদ্বয় কম্পিত হয়, তাঁহার সহিত প্রেম-ক্রীড়ার কথা কি বলিব? সখী সে-সকল প্রসঙ্গ আর তুলিও না।

যাঁহার নাম মনে হইতেই অঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসে, যিনি চুম্বন করিলে আমার চেতনা লুপ্ত হয়, তাঁহার রভস-কেলি কেমন তাহা কি আমি জানি? আমি নিজেই জানি না, তা তোমাদিগকে বলিব কি প্রকারে?

কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপে পরক সমুঝাব॥

কৃষ্ণের স্পর্শে যে-সকল বিচিত্র অনুভাব উদিত হয়, তাহা আমি নিজে বুঝিলে ত পরকে বুঝাইব?

তবহু জগত ভরি অকিরিতি এহ।
রাধা-মাধব অবিচল নেহ॥

আমার ত ব্যাপার এই, অথচ এর মধ্যে জগতে এই কলঙ্ক রটিয়াছে যে, রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয়।

এ কিয়ে সুদঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দ দাস কহ না ভাঙ্গে বিবাদ॥

এই যে লোকে বলে ইহা কি সুনিশ্চিত অর্থাৎ সত্য কথা, অথবা মিছাই কলঙ্ক? গোবিন্দ দাস বলিতেছেন যে, এ সন্দেহ কোন দিন ঘুচিবে না।]

রাগানুগা ভক্তি

ভক্তি এবং জ্ঞানের প্রাধান্য লইয়া অনেক বাদানুবাদ শুনিতে পাওয় যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা স্মরণ না রাখিলে স্বভাবতঃ যে বিষয় জটিল, তাহার জটিলতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয়। প্রথমেই মনে রাখা আবশ্যক এই বিষয়টি ভগবৎ-সম্বন্ধী। অন্য কোনও প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। অর্থাৎ বস্তুবিচার বা তত্ত্ব-মীমাংসায় এ বিতর্কের কোনও স্থান নাই। [জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ লভ্য হয়। সারসত্যের আলোচনায়ও জ্ঞানই সাধন। কিন্তু ভক্তির দ্বারা বস্তুজ্ঞান লভ্য হয় না

যখানে ভগবানই সারসত্য বা পরমার্থ তত্ত্ব, সেখানে অবশ্য ভক্তির অধিকার াছে।] সুতরাং সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর যেখানে নুসন্ধান বা উপলব্ধির বিষয়, সেখানেই ভক্তি ও জ্ঞানের প্রাধান্য বিষয়ক প্রশ্ন উঠিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান বলিতে কি বুঝি, ভক্তি বলিতেই বা কি বুঝি, তাহা স্থির না হওয়া পর্যন্ত, জ্ঞান ও ভক্তির প্রাধান্যের কথা উঠিতে ারে না।

প্রাথমিক এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানের রণ লইতে হইবে। আমরা হয়ত নিজ নিজ মতের প্রতি পক্ষপাতিত্বের াতিশয্যে এই কথাটি অনেক সময়ে স্মরণ রাখি না। জ্ঞান ও ভক্তি ভয়ই চিত্তের ব্যাপার। সুতরাং মনস্তত্ত্ব হইতেই ইহাদের সম্বন্ধ জানা ায়। মনোবিজ্ঞান অনুসারে জ্ঞান এবং ভক্তিকে পৃথক্ ব্যাপার বা rocess বলিয়াই বোধ হয়। তাহার কারণ এতদুভয়ের ধর্ম অনেকটা থক্। [যদিও জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ই পরিণত মনের ক্ষেত্রে যুগপৎ ক্রিয়াশীল, থাপি উহাদের কার্য এবং গতি স্বতন্ত্র। জ্ঞানের বিষয়বস্তু সত্য, ভক্তির ষয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসাম্য-বিশিষ্ট পদার্থ।] একখণ্ড শর্করা জ্ঞানের বিষয়ীভূত ইতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভক্তি দৃষ্ট হয় না। মানব মনের শ্লেষণে যে তিনটি বিভাগ প্রধান বলিয়া বর্ণিত হয় অর্থাৎ চেতনা, অনুভূতি বং ইচ্ছা, তন্মধ্যে চেতনার পরিণতি জ্ঞানে এবং সুখদুঃখরূপা অনুভূতির বস্থাবিশেষ ভক্তি। অতএব জ্ঞান ও ভক্তিকে পৃথক্‌রূপে না ভাবিয়া উপায় াই। [চিত্তের যে রসস্বরূপ একটি ধর্ম (Sentiment) আছে, ভক্তি তাহারই াপার।] অথচ এমন অনেকে আছেন যাঁহারা জ্ঞান ও ভক্তিকে এক বলিয়া নে করেন। তাঁহাদিগের নিকট পরাবিদ্যাও যাহা, পরাভক্তিও তাহাই।

মহাভারতে শান্তিপর্বে ব্রহ্মসংস্থার উল্লেখ আছে। এই 'সংস্থা' ক্তিরেব ন জ্ঞানং। শঙ্করাচার্যও এখানে ব্রহ্মসংস্থার অর্থ করিয়াছেন ব্রহ্মণি াম্যগবস্থিতিঃ। আচার্য শঙ্করের ব্রাহ্মীস্থিতি ভক্তির নামান্তর হইতে পারে।

কারণ যাঁহারা যোগদৃষ্টির দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাঁহাদের তন্ময়তা ভক্তি হইতে হয়ত পৃথক্ নহে। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে ভক্তির স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা পরিমিত নহে। উপনিষৎ যখন বলেন—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥ কেনোপনিষৎ

অর্থাৎ যিনি জানেন না, তিনিই জানেন, যিনি জানেন, তিনি জানেন না। যিনি জানেন, তাঁহার অবিজ্ঞাত এবং যিনি জানেন না, তাঁহারই বিজ্ঞাত। জ্ঞানের অনুসরণে আমরা এই রহস্যবাদে উপনীত হই। যাঁহাকে জানিবার জন্য অনাদি কাল হইতে মানব-মন ছুটিয়াছে, তাঁহাকেই জানা যায় না—ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া নিরাশ হইতে হয়। কঠোপনিষৎ বলিলেন যে তিনি আছেন, এইমাত্র বলিতে পারা যায়।

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

তর্কের মুখে এতটুকুও টেকে না। সুতরাং উপনিষৎ যখন বলিলেন যে, তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়, তখন আমরা এক নূতন আলোকের সন্ধান পাইলাম। আমরা বুঝিলাম জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিধি যে-বিরাট্ পুরুষকে ছুঁই ছুঁই করিয়াও ধরিতে পারে না, তিনি প্রেমের কাছে আপনি ধরা দেন। উপনিষদের সেই আলোকে আমরা পথের কিছু সন্ধান পাই; এবং সে সন্ধান পাইয়া ধন্য হই। তাই আমাদের বরেণ্য কবি সকলের হইয়া বলিয়াছেন—

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়
বিত্ত হতে প্রিয়তর যা কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে
আত্মার অন্তরতম, তাদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার

ভারতীয় ভক্তিবাদের ইহাই মূলসূত্র। ঋষি তাই বলিলেন—

ওঁ ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী।

[পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে ভক্তির উপাদান দুইটি। এক প্রেম, অপর ভয়। 'Reverence is love mixed with awe'.] আমরা তাহা বলি না, আমরা বলি ভক্তি শুধুই প্রেম। সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। ভক্তি অর্থে প্রেম, অনুরাগ, রতি, পরমাবিষ্টতা। জ্ঞান স্থির, ধীর, অচল, অটল; ভক্তি ব্যাকুলতাময়ী। নারদভক্তিসূত্রে ভক্তিকে 'পরম ব্যাকুলতা' বলা হইয়াছে।

আমরা জানি ভগবদ্‌ভজনের নাম ভক্তি। ভগবদ্-ভজনে যে সকল চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ। এইখানে ভক্তি জ্ঞানায় কল্পতে। অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায়, তাঁহাকেই সত্যরূপে জানিতে পারা যায়। জ্ঞান এবং ভক্তির যোগে তখন চিত্ত বিমল শান্তি লাভ করে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি। সব চাওয়া সব পাওয়ার শেষ এইখানে।]

যীশুখ্রীস্টও এই ভগবৎ প্রেমের মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন এক তার্কিক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ত চলিলেন; আপনার শেষ আদেশটি কি, প্রভু?" যীশুখ্রীস্ট ব্যথার কণ্টকক্ষত হৃদয়ে তাঁহাকে অমোঘ বাণী শুনাইয়া দিলেন, ভগবান্‌কে ভালবাস। "Love God."

কিন্তু এই ভালবাসা কি পদার্থ, তাহার সম্যক্ আলোচনা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বা খ্রীস্ট্রীয় ধর্ম-যাজকেরা করেন নাই। প্রেম তাঁহাদের সুপরিচিত একটি চিত্তধর্ম বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, ঐ love কথাটিকেই তাঁহারা পর্যাপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে পণ্ডিতেরা কিন্তু ভক্তির প্রেমস্বরূপতা নির্দেশ করিয়া সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাদের মতে ভক্তি এক অনির্বচনীয় প্রেম—ওঁ অনির্বচনীয়-প্রেমরূপং। এ প্রেম যে কি বস্তু, তাহা

বলিয়া বুঝানো যায় না। মূকাস্বাদনবৎ। বোবা যেমন কোনও দ্রব: আস্বাদন করিলে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, সেইরূপ। [কিন্তু এই প্রেমের একটি গুণ এই যে ইহা গুণরহিত, কামনা রহিত।] সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং (নারদ পাঞ্চরাত্রে)। ইহারই ব্যাখ্যায় বলা হইল :—

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

নির্গুণ ভক্তিযোগের এই লক্ষণ—পুরুষোত্তমে যে অহৈতুকী ও অব্যবহিত প্রীতি তাহারই নাম ভক্তি। অর্থাৎ ইহা নির্মল এবং কামশূন্য। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীরূপ বলিলেন :—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

কোনও অভিলাষ বা কামনা থাকিবে না, জ্ঞানের দ্বারা বিতর্কিত হইবে না, কর্মের দ্বারা বাধিত হইবে না এমন ভাবে কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভজন করিলে তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা যায়।

এখন কথা হইল এই যে, কৃষ্ণের ভজন অর্থে যদি তাঁহাকে 'একান্তভাবে আশ্রয়' করা যায়, তাহা হইলে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় যে শরণাগতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই সাধনতত্ত্বের শেষ কথা বলিয়া মানিতে হয়।

সর্ব ধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম যখন প্রেম ও ভক্তির মধ্যে সমস্ত ব্যবধান ঘুচাইয়া দিল অর্থাৎ ভক্তি ও ভগবৎ-প্রেমের তাদাত্ম্য প্রতিষ্ঠাপিত হইল, তখন প্রেম কি বস্ত তাহা জানিবার প্রয়োজন হইল। যতই অনির্বচনীয় হউক, প্রেম একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞাবিশিষ্ট চিত্তবৃত্তি। কাজেই উহার স্বরূপ কি, উহার উপাদান কি কি প্রণালীতে উহা পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তাহা অনুসন্ধানের বিষয় হইল

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনোবিজ্ঞানেই সমস্ত চিত্তবৃত্তির উৎপত্তি ও প্রকৃতি আলোচিত হয়। আমাদের দেশে এই কার্য অলঙ্কারশাস্ত্র করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে মনোবিজ্ঞানের অস্তিত্ব সপ্তদশ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু প্রায় স্মরণাতীত কাল হইতে এদেশে অলঙ্কার-শাস্ত্রসমূহ মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আসিতেছে। কাব্যের আস্বাদ্য হিসাবে প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা এদেশের অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহার কারণ প্রেমই কাব্যের চিরন্তন ও প্রধান আস্বাদ্য বস্তু। ভগবৎ-প্রেম যখন প্রেম পদবাচ্য, তখন ইহা সাধারণ নরনারীর অনুরাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইতে পারে না। অপরা অনুরক্তি আমাদের পরিজ্ঞাত। কাজেই পরানুরক্তি তাহারই সুচির ও চরমোৎকর্ষভূত পরিণতি মনে করিতে পারা যায়। সমস্ত অসীমের কল্পনাই সসীমের উপলব্ধি হইতে জাত। প্রেমের যে কামনা-বাসনা-শূন্য আত্মহারা পরিণতি, তাহাই ভগবদ্ভজনের অনুকূল। ভগবান্ অনন্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পূজার ফুল মানুষের গৃহসংলগ্ন উদ্যানেই ফোটে। সেইরূপ আদর্শ মানবীয় প্রেমের এক অনির্বচনীয় পরিণতি যে ভক্তি তাহাই ভগবান্‌কে লাভ করিবার একমাত্র অথবা প্রশস্ত উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে ভগবান্ যদি চৈতন্য-স্বরূপ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা লভ্য বলিয়া মনে করিতে বাধা ছিল না। কিন্তু তিনি ত কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহেন। তিনি 'সচ্চিদানন্দ'—আনন্দঘন বিগ্রহ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ—ব্রহ্মসংহিতা

সৎ, চিত্ত ও আনন্দ এই তিনগুণের সমবায়ে সেই পরম ঈশ্বর কৃষ্ণের বিগ্রহ রচিত। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যক)—তিনি আনন্দস্বরূপ। আনন্দ হইতেই সমস্ত জীব জন্মলাভ করিয়াছে, আনন্দই জীবের উপজীব্য। প্রেমের গঠনে আনন্দই সর্বপ্রধান উপাদান। পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানও এই কথাই

বলে। Love is the highest form of delight. প্রেমে দুঃখও সুখ* মানবজীবনে প্রেমের মত আর কিছুই নাই।

চণ্ডীদাস কহে শুনহে নাগরি
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার॥

রস অর্থে আনন্দ, আনন্দেরই নামান্তর প্রেম।

ভগবৎ-প্রেমের আলোচনা করিতে যাইয়া মনস্তাত্ত্বিক এই অনির্বচনী তত্ত্বে উপনীত হন। প্রেম জ্ঞানের মত শান্ত ও স্থির নহে; মানুষের প্রা সমস্ত Emotion বা Sentiment চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তোলে। প্রে ব্যাকুলতায় ভরা। যেখানে ব্যাকুলতা নাই, সেখানে প্রেম নাই শান্তশিষ্টভাবে ভালবাসা হয় না। ভালবাসা পাগল করিয়া ছাড়ে ইহারই নাম 'রাগ'।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাঽত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা—(বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

এই যে পরমাবিষ্টতা—একান্ত তন্ময়তা—ইহাতে শ্রুতি, বুদ্ধি বা শাস্ত্র জ্ঞানের অপেক্ষা করে না।

নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি-কারণং। শ্রীরূপগোস্বামী

---

* দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥—উজ্জ্বলনীলমণি

প্রণয়ের উৎকর্ষ হেতু যে স্থলে চিত্তমধ্যে অতিশয় দুঃখও সুখরূপে অনুভূত হয়, তাহাকে 'রাগ' কহে।

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা এই স্বরূপলক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা এই তটস্থ লক্ষণ॥ —চৈতন্যচরিতামৃত

প্রেমের লক্ষণ গাঢ়তৃষ্ণা। কাজেই ভক্তিবাদের আলোচনায় আমরা এক নূতন স্তরে উপনীত হইলাম। [প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যে আবিষ্টতা দেখা যায়, যাহা কোনও কিছুর অপেক্ষা করে না, যাহা শাস্ত্রের শাসন মানে না, যাহা ধর্মাধর্মের বিচার রাখে না, যাহাতে উৎকট লোভই হয় পথপ্রদর্শক, তাহাই ভক্তি। এই ভক্তির নাম রাগানুগা ভক্তি।]

কৃষ্ণ তদ্‌ভক্ত কারুণ্যমাত্রলোভৈক হেতুকা।
পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

[এই যে ধর্মাধর্ম নিরপেক্ষ ভক্তিবাদ ইহা সর্বসম্মত হইতে পারে নাই। কারণ আমরা দেখি এক দল ভক্ত বলিতেছেন যে, ইহাতে উৎপাতের সৃষ্টি হইতে পারে :

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায় কল্পতে॥

যাঁহারা এই রাগানুগা ভক্তির দুর্লভ এবং আশঙ্কাপূর্ণ পন্থা অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদের জন্য বৈধী ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে।] রাগমার্গে ভজনশীল ব্যক্তিও বিধিমার্গ পরিত্যাগ করিবেন না, ইহাই রূপ গোস্বামিপাদের অভিমত বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতস্তু লোভপ্রবর্তিতং বিধি মার্গেণ সেবনমেব রাগমার্গ উচ্যতে।

পশ্চিমাঞ্চলে বল্লভাচার্য কর্তৃক পুষ্টিমার্গ উপদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে বোধ হয় রূপগোস্বামী প্রথমে ইহার উল্লেখ করেন। অন্ততঃ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সেইরূপ ধারণা ছিল কারণ তিনি রাগবর্ত্মচন্দ্রিকায় তাঁহাকেই সর্বাগ্রে নমস্কার করিয়াছেন—

শ্রীরূপবাক্সুধাস্বাদি চকোরেভ্যো নমঃ নমঃ।
যেষাং কৃপালবৈর্বক্ষ্যে রাগবর্ত্মনি চন্দ্রিকাম্॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া এই রাগানুগা ভক্তির ব্যাখ্যা শুনাইয়াছেন:

রাগানুগাভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন।

* * *

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ-স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসি-ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

ইহা কৃষ্ণভজন-প্রণালীর সংকেত এবং ভক্তির ব্যাখ্যায় ইহাই এ পর্যন্ত সর্বশেষ স্তর বলিয়া মনে হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমের আদর্শ

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমের যে আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে, অন্য কোথায়ও তাহার তুলনা মিলে না। অন্য অনেক সাহিত্যেও প্রেমের বর্ণনা আছে, আস্বাদন আছে, তাহাতেও আমাদের মন মুগ্ধ হয়। কিন্তু প্রেম যেমন বৈষ্ণবের সর্বস্ব, এমনটি আর কোথাও নাই। বৈষ্ণবের আরাধ্য প্রেম, বৈষ্ণবের ভজন সাধন প্রেম, বৈষ্ণবের স্বর্গও প্রেম। বৈষ্ণবের সাহিত্য প্রেমের কবিতা, বৈষ্ণবের গান প্রেমের গান, বৈষ্ণবের ভগবান্ প্রেমময়, 'প্রেম দিয়া গড়া তনু'। তাঁহাদের মতে সংসারের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম। তাঁহারা ভুক্তি বা ভোগের কামনা করেন না, মুক্তিরও কামনা করেন না। আনন্দকন্দ-শ্রীনন্দনন্দনই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য।

ভগবানের সহিত মানুষের যে প্রেমের সম্বন্ধ, সে কথা অন্য অনেক ধর্মে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবেরা যেমন প্রেমের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অন্য কোনও মতবাদে তাহার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবেরা তত্ত্বের দিক্ দিয়া প্রেমকেই ধর্মের ভিত্তি করিয়াছেন। ধর্মে প্রেমের প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, প্রেমকেই ধর্মে পরিণত করিয়াছেন। এই পরিণতির ফলে বৈষ্ণব কাব্যের গূঢ় অর্থ হইয়াছে এই যে, ইহা উপাস্যেরই স্তুতি। বৈষ্ণব সঙ্গীত মাত্রই ভজন। ভজনই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়; কাজেই বৈষ্ণব সাহিত্যের মণি-মন্দির এই প্রেম-কবিতায় ভরিয়া গেল। পূজার ফুলের মত এই কবিতার রাশি বাঞ্ছিতের চরণোপান্তে সঞ্চিত হইয়া স্তূপাকার হইয়াছিল। গানে গানে দেশের আকাশ বাতাস একদিন পূর্ণ হইয়াছিল। কারণ গীতায়, ভাগবতে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। এই ভক্তিই প্রেম। যাহার নাম ভক্তি তাহাই যখন প্রেম বলিয়া নিরাকৃত হইল, তখন কাব্যে, কবিতায় প্রেমের নির্ঝর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আমরা সাধারণভাবে স্থির করিয়া লইয়াছি যে, সংসারে নরনারীর মধ্যে যে সর্বগ্রাসী আকর্ষণ, তাহাই বৈষ্ণবদের প্রেম। কথাটা যে একেবারে অমূলক, তাহা হয়ত নয়। কারণ ভাষা মানুষের স্বাভাবিক মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্যই কল্পিত হয়। আমরা প্রিয়তমের জন্য যে মালা গাঁথি, তাহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। কাজেই দেবতার উদ্দেশে আমরা যাহা নিবেদন করি তাহাও আমাদের সেই বিরলে গাঁথা মালাখানি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাবো কোথা ?

কিন্তু বৈষ্ণবেরা এই পার্থিব গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের প্রেমকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অপ্রাকৃত জগতে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এ প্রেম বুঝানো যায় না, ইহা এক অনির্বচনীয় ব্যাপার। নারদ ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন 'অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপং'।

একজন হিন্দী কবি তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন—

প্রেম হৃদয়কী বস্তু হ্যায় পরমগুহ্য অনমোল।
কথনীমে আবৈ নহী সকৈ ন কোউ বোল।

ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এই গুহ্যাতিগুহ্য প্রেম, ইহা অনুভবের বস্তু অর্থাৎ হৃদয়ে (ভাগ্যগুণে) যদি বা অনুভূত হয়, কথায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। আর একজন ভক্ত কবি এই প্রেমের লক্ষণ বলিয়াছেন—

রসময় স্বাভাবিক বিনা স্বারথ অচল মহান্।
সদা এক রস বঢ়ত নিত্ত সুদ্ধ প্রেম রসখান॥

এই রসখান একজন পাঠান ছিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইনি একজন ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। ঘটনাচক্রে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া রসখান মুগ্ধ হইলেন। ইঁহার কবিতায় যে ভক্তিভাব ফুটিয়াছে, তাহা সত্যই অদ্ভুত।

যাহা হউক, উপরে যে কাব্যাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে বাংলার বাহিরেও বৈষ্ণবদের ধারণা কত উচ্চে উঠিয়াছিল। প্রেম বিশুদ্ধ, সহজ, নিঃস্বার্থ, অচল ও মহান্, নিত্য বৃদ্ধিশীল এবং চিরানন্দস্বরূপ। ভক্তিসূত্রেও এই লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই—

গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানং
অবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবস্বরূপম্। নারদভক্তিসূত্র ৫৪

এই প্রেম সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম এবং কেবল অনুভূতিবেদ্য।

[প্রেম যে কি বস্তু, তাহা নির্দেশ করাও যায় না, অথচ বৈষ্ণবদের চেষ্টারও অবধি নাই। যাহা সহজে জানা যায় না, তাহাই জানিবার জন্য মানুষের অফুরন্ত কৌতূহল।] কিন্তু বৈষ্ণবদের মত এত কৌতূহল আর কেহ দেখান নাই, আর এত বিশ্লেষণও অপর কোনও স্থলে দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্য-দেবের সঙ্গে রূপ গোস্বামীর মিলন প্রসঙ্গে যে প্রেমতত্ত্ব-ব্যাখ্যা আমরা পাই, তাহা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও বিস্ময়কর। মহাপ্রভু বলিতেছেন যে—

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য

অর্থাৎ প্রেম হৃদয়ে সঞ্জাত হইলে উহা স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগের মধ্য দিয়া ভাব ও পরে মহাভাবে পরিণত হয়। সুতরাং প্রেমের স্তর বিন্যাসে মহাভাবই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এই মহাভাব আবার দ্বিবিধ: রূঢ় ও অধিরূঢ়। গোপিকাগণের যে প্রেম তাহার নাম অধিরূঢ় মহাভাব। ইহার মধ্যেও আবার বিরহে যে অধিরূঢ় মহাভাব হয় তাহার নাম মোহন। [মোহনাখ্য

মহাভাবে দিব্যোন্মাদ হয় যাহাতে সমস্তই কৃষ্ণময় হইয়া যায়, এমনকি আপনাকেও কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম হয়।

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মাধাই।—বিদ্যাপতি

ইহারও পূর্বে জয়দেব লিখিয়াছেন—

মুহুরবলোকিত-মণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥

এই দিব্যোন্মাদই প্রেমের বিবর্তনে শেষ কথা। তখন ভক্ত

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি॥

বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রেম নামক চিন্ময় রসের যে স্তর-পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অন্য কোথায়ও দেখিতে পাই না। সুতরাং প্রেম বৈষ্ণবের আদর্শ বা লক্ষ্য, ইহা বলিলেই সব বলা হইল না। যে প্রেম ঈশ্বর-প্রাপ্তির একমাত্র সাধন বা উপায়, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি শুধু ইহাই বলিতে চাহি যে, বৈষ্ণব তত্ত্ববিদেরা প্রেমের সুর এইরূপ উচ্চগ্রামে বাঁধিয়াছিলেন বলিয়াই বৈষ্ণব কাব্যে ইহার এত প্রসার দেখিতে পাই। বৈষ্ণব কবিরা প্রেমের কথা বলিতে অজ্ঞান। কোনও উপমাই ইঁহাদের বাদ পড়ে নাই, তথাপি যেন তৃপ্তি নাই। এত বলিয়াও বলার শেষ নাই। প্রেম যে অনির্বচনীয় বস্তু, কাব্য কথার স্বর্ণসূত্রে সে বাঁধা পড়িতে চাহে না। বিদ্যাপতির রাধা উপমার পর উপমা সাজাইতেছেন, পঞ্চ প্রদীপের মত আরতি করিয়া তাঁহার প্রেমকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না :

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥

হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখীক পাখ, মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈসে মাধব কহ তুহুঁ মোয়॥
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহা হোয়॥

'প্রিয়তম তুমি আমার হাতের আরসী, মাথার ফুল, আঁখির কাজল, অধরের তাম্বুল, হিয়ার মৃগমদচিত্র, গলার মালা, দেহের সর্বস্ব, সংসারের সার, পাখীর পাখা, মীনের নীর, জীবনের জীবন'—এত বলিয়াও বলার শেষ হইল না। শেষে বলিতেছেন, তুমি কেমন আমাকে বলিয়া দেও। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, তোমরা উভয়ে উভয়ের তুলনা—অর্থাৎ তোমাদের তুলনা নাই।]

চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ প্রেমের তুলনার জন্য প্রকৃতির ভাণ্ডার উজাড় করিতেছেন, তথাপি সে প্রেমের নাগাল পাওয়া গেল না :

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি ;
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহু কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কভু নাহি জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি—সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥

কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে ॥]

এই সকল উপমা সম্বন্ধে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ত্রিভুবনে ইহার তুলনা হয় না। মুরারি গুপ্ত সেইজন্য বলিয়াছেন :

খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বঁধু বিনা আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমনি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥

[বিদ্যাপতির একটি উপমা মামুলি বুলি ছাড়াইয়া গিয়াছে :

খোজলুঁ সকল মহীতল গেহ।
খীর নীর সম ন হেরল নেহ ॥
যব কোই বেরি আনল মুখ আনি।
খীর দগু দেই নিরসত পানি ॥
তবহুঁ খীর উমড়ি পড় তাপে।
বিরহ বিয়োগে আগ দেই ঝাঁপে ॥
যব কোই পানি আনি তাহি দেল ॥
বিরহ বিয়োগ তবহি দূর গেল ॥
ভনই বিদ্যাপতি এহেন সুনেহ।
রাধামাধব ঐসন নেহ ॥

সমস্ত পৃথিবী খুঁজিলাম দুগ্ধ ও জলের মধ্যে যে প্রেম, তাহার তুলনা দেখিলাম না। যদি কেহ জলমিশ্রিত দুগ্ধ আগুনে চাপাইয়া দেয় এবং জল শুকাইয়া দেয় (নিরসত), তাহা হইলে দুগ্ধ উৎলাইয়া জলের বিরহে আগুনে ঝাঁপ দেয়। তখন যদি কেহ তাহাতে একটু জল দেয়, তখন বিরহ দূরে যায়

এবং দুধ শান্ত ভাব অবলম্বন করে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন যে, ইহারই নাম প্রেম এবং রাধামাধবের প্রেম এইরূপই।

গোবিন্দদাসের রাধা যখন বিরহে কাতর, মিলনের আর কোনও আশাই যখন দেখা যায় না, তখন মরণে মিলন কামনা করিতেছেন :

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ॥

হে সখি, আজ বিরহ মরণ নির্দ্বন্দ্ব হউক, যাহাতে আমি (মরণের মধ্য দিয়া) আমার প্রিয়তমকে লাভ করিতে পারি। আমার শরীরের পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যাউক এবং আমার অঙ্গ প্রিয়তমের গমন পথের মৃত্তিকা হউক। যে সরোবরে প্রিয়তম নিত্য স্নান করেন, আমার অঙ্গের সলিলাংশ যেন সেই সরোবরের সলিল হয়।*

এ প্রেম কি সহজ? ভগবদ্‌গীতা যে বলিয়াছেন 'মামেকং শরণং ব্রজ' সেই 'কৃষ্ণৈকশরণ' কি কথার কথা?

পীরিতি পীরিতি সব জন কহে
পীরিতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি
নাহি মিলে যথাতথা॥

* সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে এই কবিতা রচিত।

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাসের মত পিরীতিপাগল আর কেহ ছিলেন না। চণ্ডীদাসের প্রেমের আদর্শ আজিও অম্লান শুভ্রতায় সদ্যঃপ্রস্ফুটিত যুঁই ফুলের মত দেবতার বেদীমূলে উজ্জ্বল হইয়া আছে। প্রেমে—এমন কি মানবীয় প্রেমে—যে তন্ময়তা আনে, তাহারই চরম বিকাশ চণ্ডীদাসের প্রেমে। গীতায় যেমন ভগবান্ বলিয়াছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ষষ্ঠ অঃ

এই প্রকার প্রেমিক ভক্ত প্রকৃত প্রেম উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহার চিত্ত কৃষ্ণময় হইয়া যায়। চক্ষু কৃষ্ণ বিনা কিছু দেখে না, কান মধুরাতিমধুর ব্রহ্মময়ী বেণুধ্বনি বিনা আর কিছুই শুনে না। নাসিকা সেই অঙ্গ-সৌরভে উন্মত্ত। জিহ্বা নিরন্তর তাঁহারই নামলীলারসে বিভোর হয়। ইহারই নাম কৃষ্ণপ্রেম। তখন দিনরাত্রি ঘরপর কিছুই আর জ্ঞান থাকে না।

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি ॥ —চণ্ডীদাস

কলঙ্ক সে ত গলার হার। গরব করিয়া কলঙ্কের হার পরিতে সাধ হয়। কাহারও কথায় কিছু আসে যায় না। বিধি নিষেধেরও তখন অধিকার থাকে না।

বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
(তোরা) নিসাড়া হইয়া আয়লো সজনি
আঁধার পেরিয়ে আলা॥

যে সেই প্রেম সমুদ্রে ডুব দিয়াছে, তাহার পক্ষে বাহির জগতের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। বাহির জগৎ খোলা থাকিতে ত অনুভূতি প্রাণে জাগে না। যোগে যেমন চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয়, এই প্রেমের যোগীরও সেইরূপ সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তি প্রেমাস্পদের অনুভূতিতে নিমজ্জিত হইয়া যায়। তোরা কথা কহিস না, অনুভূতির নেশা ছুটিয়া যাইবে। ক্ষণিকের জন্য হয়ত মনে হইবে যে, বহির্জগৎ হইতে চিত্ত বিযুক্ত হইলে বুঝি আর কিছুই রহিল না, শুধু অন্ধকার। কিন্তু তাহা নহে, কিছুক্ষণ পরেই চিত্তে প্রেমের যে নির্মল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে জীবনের সমস্ত আঁধার, সমস্ত সংশয় নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

আর একজন কবি কি ভাবে এই একান্ত আত্ম-বিলয়ের কথা বলিয়াছেন তাহাই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

শ্রীমতী বলিতেছেন,

নব রে নব রে নব নবঘন-শ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম॥
তোমার পিরীতি-সুখ-সায়রের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুলশীল লাজ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি॥

তুমি যে আমার বন্ধু আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার॥

ত্বদীয়তাময় এবং মদীয়তাময় প্রেমের দুইটি ধারা এখানে একত্র মিশিয়া গিয়াছে। এই নিত্য নবায়মান প্রেমে তুমি-আমির পালা শেষ হইয়া এক অখণ্ড, অনবচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ, কেবলানন্দময় অনুভূতি জাগরিত হয়।

হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।—গোবিন্দ দাস

আমার হৃদয়মধ্যে প্রেমময় ভগবান্ একাত্ম হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন, প্রেমই শুধু জাগিয়া আছে।

ভক্তিবাদ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত

ভক্তিবাদ অতি প্রাচীন। বর্তমানে যে সকল ধর্ম্মমতের প্রতি লোকের আস্থা দেখা যায়, তাহার সবগুলির মধ্যেই ভক্তিবাদ অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত আছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন ভক্তিবাদ লোকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইয়াছিল। ভগবদ্গীতায় ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়; চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে:

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহ ব্রবীৎ॥

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, তিনি পূর্বে এই অব্যয় যোগ সূর্য্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সূর্য্য তাঁহার পুত্র মনুকে এবং মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ পরম্পরাক্রমে এই যোগ অবগত হইয়া-

ছিলেন। কিন্তু কালবশে এই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। 'আজ আমি তোমাকে সেই পুরাতন যোগের কথা বলিতেছি।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥'

গীতা ৪র্থ অঃ

অর্জ্জুনের মনে সংশয় হইল। তিনি বলিলেন, 'তুমি ত আধুনিক অর্থাৎ এখন বর্তমান্, বিবস্বান্ (সূর্য্য) প্রাচীন কালের লোক তুমি কি প্রকারে তাঁহাকে এই যোগ শিক্ষা দিলে?'

তাহার উত্তরে ভগবান্ বলিলেন, 'আমি অজ হইয়াও বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তুমি-ও তাই। আমি সে সব রহস্য জানি, তুমি অবিদ্যার অধীন বলিয়া ভুলিয়া গিয়াছ।'

যাহা হউক্, গীতারও বহু পূর্বে যে এই ভক্তিতত্ত্ব ভারতে সুবিদিত ছিল, তাহা বুঝা যায়। গীতার রচনাকাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জ্যাকোবি প্রভৃতির মতে গীতা মহাভারতের অংশ হইলেও উহাতে প্রথমে কোনও ধর্মতত্ত্ব ছিল না। গীতার যে সমস্ত শিক্ষা সভ্যজগতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে, উহা নাকি পরবর্তী কালের যোজনা! এরূপ মতবাদের সারবত্তা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক্ না কেন, ভক্তিবাদ্ যে খ্রীষ্ট-জন্মেরও পূর্ব হইতে ভারতে পরিজ্ঞাত ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

ভক্তিবাদের প্রধান প্রচারক ছিলেন পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়। মহাভারতের শান্তিপর্বে যে 'হরিগীতং পুরাতনম্' আছে, তাহা এই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়েরই মত। শান্তিপর্ব এবং তদন্তর্গত মোক্ষধর্ম ও নারায়ণীয় পরবর্তী কালে সংযোজিত বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ প্রক্ষেপবাদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অবশ্য সুদুষ্কর। কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, এরূপ মতবাদের ভিত্তি নিতান্তই শিথিল। দক্ষিণ দেশের একজন

স্থল বোধ হয় উত্তর-ভারতের পদাবলী। [এই সকল তামিল দেশীয় ভক্ত-কবি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হন] বলিয়া জানা যায়। ইঁহাদের ভক্তিবাদ দ্রাবিড়াম্নায় নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ইহার এক অংশ দ্রাবিড় সামবেদ নামে কথিত। শঠারি, শঠকোপ বা নম্মা আলবার এই সামবেদের রচয়িতা। নম্মা আলবার সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মৌন ছিলেন। এই সময়ে তিনি এক বকুল বৃক্ষের তলে বসিয়া থাকিতেন এবং ভগবান্ অনেক সময়ে তাঁহাকে দর্শন দিতেন। ষোল বৎসরের পর তিনি যখন 'প্রকাশ' হইলেন তখন লোকে দেখিল যে তাঁহার দেহে নানা অলৌকিক ভাব প্রকটিত হয়। অশ্রুকম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ সমূহ দেখা দিল। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও গান করেন। এই সমস্ত দেখিয়া লোকে তাঁহাকে অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিল। কেহ কেহ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। নম্মা আলবারের শিষ্য মধুরকবি নামক আলবার বলিয়াছেন যে, ব্রজরমণীগণের যে ভাব ছিল শ্রীকৃষ্ণে, শঠারি মুনিরও সেই সকল ভাব দেখা যাইত।

ভাগবতেও আমরা অনুরূপ ভাবের বর্ণনা পাই :

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
তুন্মত্তবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ভাগবত ১১।২।৪০

তামিল দার্শনিক কবি বেদান্তদেশিকাচার্য 'তাৎপর্য রত্নাবলী' নামক শঠারি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রজরমণীগণের রীতি অবলম্বনে গবানকে আস্বাদন করিয়াছিলেন :

ব্রজযুবতীগণ-খ্যাতনীত্যাহস্বভুংক্ত।

অর্থাৎ ব্রজযুবতীগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিয়াছিলেন, ইঁনি

(শঠারি) সেই বিখ্যাত নীতিতে ভগবানকে উপভোগ করিয়াছিলেন। এখানে আমরা মধুর ভাব বা কান্তাভাবের উপাসনা-পদ্ধতির সর্বপ্রথম পরিচয় লাভ করিতেছি। আলবারদিগের মধ্যে ১২ জন খুব বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের শেষ ব্যক্তি তিরুমঙ্গই আলবার খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। অন্যান্য আলবাররা ইঁহার পূর্বে পাঁচ কি ছয় শত বৎসরের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। নম্মা আলবার এই দ্বাদশ জনের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

সেই অতি প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্মের এই অভ্যুত্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, ভাগবতধর্ম সারা ভারতবর্ষে কি অদ্ভুত প্রেরণা যোগাইয়াছিল। গ্রীক্ দূত কর্তৃক খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাসুদেবের নামে দাক্ষিণাত্যে বেসনগর স্তম্ভ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল; কবি ভাস শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়া বালচরিতম্ লিখিলেন, মহাকবি কালিদাস মেঘদূতে শ্রীকৃষ্ণের নবঘনশ্যামরূপের উল্লেখ করিলেন—এ সমস্ত ব্যাপারই ইহা হইতে, বুঝিতে পারা যায়। তামিল ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ 'কুরল', এই গ্রন্থে প্রেমের যে বিশ্লেষণ আছে তাহা রাধাকৃষ্ণের লীলাই স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রণয়, মান, মানান্তে মিলন প্রভৃতির সুন্দর চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ভক্তিধর্মের অভ্যুত্থানের যে অদ্ভুত ইতিহাস আমরা দক্ষিণ ভারতে পাই, অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। পরবর্তীকালে বাংলায় যে প্রেমভক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল, পাঞ্জাবে এবং উত্তর পশ্চিমে যে ভক্তিধর্মের ধারা নানকজি, মীরাবাই প্রভৃতির মধ্যে দেখিতে পাই, তাহার মূল উৎস অনুসন্ধান করিতে সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতেই যাইতে হইবে। পূর্বে যে আলবারদের কথা বলিলাম, তাঁহাদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন, তাঁহার নাম আণ্ডাল। এই মহিলা-আলবারের পিতা পেরি আলবারও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আণ্ডালের এই অভিমান ছিল যে, শ্রীরঙ্গনাথ তাঁহার স্বামী! এই হেতু তাঁহার পিতা

আণ্ডালের বিবাহ দেন নাই। আণ্ডালের বিগ্রহ এখনও শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে পূজিত হয়। মীরাবাই আণ্ডালেরই যেন প্রতিমূর্তি এইরূপ মনে হইবে। এই দুই মহিলার চরিত্রে এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় যে, একই উৎস হইতে অনুপ্রাণনা আসিয়াছিল এরূপ মনে না করিয়া উপায় নাই।

এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় শ্রেষ্ঠ একখানি ভক্তিগ্রন্থের রচনার জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন, তাহা প্রাচীন কালে দক্ষিণ ভারত ব্যতীত অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না। ভাগবতের ন্যায় কাব্য, দর্শন, ইতিহাস ও ধর্মের এরূপ অপূর্ব সমন্বয়-বিশিষ্ট গ্রন্থ আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীচৈতন্যের মতে শ্রীমদ্‌ভাগবতই বেদের ন্যায় প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ঠিক কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কুলশেখর পেরুমাল নামে একজন আলবার অষ্টম শতাব্দীতে তাঁহার মুকুন্দমালা নামক গ্রন্থে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।* রামানুজাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। রামানুজাচার্য দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (১০১৭-১১৩৭) এবং ভক্তিবাদের প্রথম দার্শনিক প্রবর্তক তিনিই। নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্যও দক্ষিণ ভারতের লোক। কাহারও কাহারও মতে নিম্বার্কই দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বপ্রথম বৈষ্ণব মত প্রচার করেন।† নিম্বার্ক সনকাদি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক এবং সনকাদি সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া কথিত হন। জয়দেব, গীতগোবিন্দে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মত অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবতঃ রামানুজ তাঁহার পূর্বগামী। আনন্দতীর্থ স্বামী

* সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার বলেন, কুলশেখর ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ছিলেন এবং তিনি খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন।

† Hinduism—Monier Williams. Sir George Grierson Encyclopaedia of Religion & Ethics-এ ভক্তিমার্গ নামক প্রবন্ধে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

এবং মুগ্ধবোধ-প্রণেতা বোপদেব ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহারা কেহই দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী নহেন। ইঁহারা উভয়েই দক্ষিণ ভারতের লোক এবং উভয়েই শ্রীমদ্‌ভাগবতকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, একাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ (১০১৭-১১৩৭) ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, আর দ্বাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতীয় আচার্যগণ ভাগবতকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই শেষোক্ত আচার্য্যগণ কিন্তু এমন কোনও আভাস দেন নাই যে তাঁহারা কোনও সাম্প্রতিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিতেছেন।

রামানুজাচার্য ভাগবত হইতে কেন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য হইলেও এই মূল্যবান্ গ্রন্থ যে ভক্তিধর্মের মণিমঞ্জুষা, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এবং ইহার রচনা এরূপ কোনও সময়ে হইয়াছিল যখন ভক্তিধর্মের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। এইজন্যই মনে হয়, যে যখনই ভাগবত রচিত হইয়া থাকুক, দক্ষিণ ভারতেই উহা হওয়া সম্ভব। কারণ খৃষ্টাব্দের প্রথম কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ভারতে ভক্তিধর্মের সেরূপ উল্লেখযোগ্য কোনও আন্দোলন দেখা যায় না। ভাগবত পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, বহু বিষ্ণুভক্ত দক্ষিণ দেশে আবির্ভূত হইবেন,

তাম্রপর্ণী নদীযত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥ ইত্যাদি।

—ভাগবত ১১।৫

এই বর্ণনার মধ্যে একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। এই সকল নদী ও স্থান আলবারদের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাম্রপর্ণী নম্মা আলবারের দেশ, কৃতমালা রঙ্গনাথসেবিকা আণ্ডালের দেশ। পয়স্বিনী (পলর) তৎপরবর্ত্তী কয়েকজন আলবারের দেশ। কাবেরীর তীরে তিরুমজই আলবার, এবং কুলশেখর পেরুমাল মহানদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। *

* History of Indian Philosophy Vol III. Dr. S. N. Das Gupta.

'প্রপন্নামৃতে' আলবার দিগের বর্ণনায় যে ভক্তিভাবের ধারা আছে, তাহার অনুরূপ ভক্তিভাবের ব্যাখ্যা উত্তর ভারতের কোনও গ্রন্থে বিরল। সেইজন্য পদ্মপুরাণান্তর্গত ভাগবত মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভক্তিদেবী দ্রাবিড় দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য নামে তাঁহার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কর্ণাটকে গেলেন এবং সেখানে সমৃদ্ধিশালিনী হইলেন। পরে মহারাষ্ট্র ও গুর্জরে প্রবেশ করিয়া জর্জরিত হইলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ও ঘোর কলির প্রভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। শেষে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া ভক্তিদেবী আবার নবীনতা প্রাপ্ত হইয়া সুদর্শনা হইলেন।

এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে যে পরিবেশের চিত্র আমাদের নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়, তাহার অনুরূপ কোনও রূপ পরিবেশ আমরা সেই প্রাচীনকালে আর কোথাও পাই না। সেইজন্য এই অনুমানই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত দক্ষিণ ভারত হইতেই আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

দক্ষিণ ভারতের এই অবদান স্বীকার করিলে উত্তর ভারতের গর্ব খর্ব হইবার আশঙ্কা অমূলক, কারণ উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বহুকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তবে সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার মত দৈন্য যেন কখনও আমাদের মনে না আসে। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব যে এক সময়ে দক্ষিণ ভারতে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ দক্ষিণ ভারতের বিপুল সাহিত্য। ভক্তিবাদের বহু গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত যে দক্ষিণ দেশ হইতেই আমরা পাইয়াছি, ইহা সকলেই জানেন। দক্ষিণ ভারতেই রামানুজাচার্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন, নিম্বার্কও দক্ষিণ ভারতের বেলারি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রামানুজের শ্রীবৈষ্ণব ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মত, বাংলার বৈষ্ণবেতিহাসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মধ্বাচার্যও দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের পূর্বগামী বটে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যের গুরু-পরম্পরায়

মধ্বাচার্যের নাম উল্লিখিত হয়, যদিও শ্রীচৈতন্য যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব মত। এই মতে যে 'গোপবেশ বেণুকর নব-কৈশোর নটবর' নন্দনন্দনের ভজন প্রবর্তিত হইল, তাহা দক্ষিণ ভারতে খুবই বিরল! দক্ষিণ ভারতের প্রধান বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ স্বামী নারায়ণ। অতল শয়নে নারায়ণ, লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবায় রতা, অনন্ত তাঁহার শয্যা, অসংখ্য ফণা তাঁহার ছত্র—এই বিগ্রহই বেশীর ভাগ মন্দিরে। শ্রীরঙ্গম্, শ্রীরঙ্গপত্তন্, মহাবলীপুরম্ প্রভৃতি বিখ্যাত মন্দিরগুলিতেও নারায়ণ বা মহাবিষ্ণু মূর্তিই দেখিয়াছি। সুতরাং বাংলার বৈষ্ণব ধর্মে যে নূতনত্ব আছে, তাহা শ্রীচৈতন্যেরই অবদান। কিন্তু এখানেও একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য যে কান্তাভাবের ভজন প্রবর্তন করিলেন, তাহারও মূল অনুসন্ধান করিলে দক্ষিণ ভারতের কথাই মনে হইবে। গোদাবরী তীরে রামানন্দের সহিত সংলাপের পূর্বে বঙ্গদেশে এই রাধাভাবের ভজনের কোনও বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না একথা আমি অন্যত্রও বলিয়াছি।* গীতার শরণাগতি বা প্রপত্তিও দক্ষিণ ভারতের তামিল গ্রন্থ অহির্বুধ্নসংহিতায় বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বেবরণং তথা
আত্ম-নিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

অহির্বুধ্নস্য সংহিতা

এই শরণাগতিরও পরের কথা হইল—প্রেম। ইহা শুধু ভগবানের কৃপা-ভিক্ষায় পর্যবসিত নহে। ভগবানকে আমাদের বিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষারহিতভাবে উপাসনা, ইহাই হইল শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের সার কথা। তাঁহার অন্ত্যলীলায় যে দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি মহাভাবের বিকাশ দেখিতে পাই, তাহা বাংলারই অমূল্য সম্পদ্ অন্য কোনও দেশের নহে।

* বাংলার প্রেমধর্ম পৃষ্ঠা ১।

দ্বিতীয় শাখা

শ্রীচৈতন্য ও পদাবলী

শ্রীচৈতন্য

বাসন্তী পূর্ণিমা। শীতের অপগমে আকাশ প্রসন্ন হইল, মলয়ানিল বহিল, দিকে দিকে প্রেমের বার্ত্তা বাহিত হইল। বসন্তের সখা মদন। ঋতুরাজের সঙ্গে মদনের সার্থক মিতালি—বসন্তকালই প্রেমের প্রশস্ত সময়।

নব বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥

এই বসন্তেই বৃন্দাবনচন্দ্রের বসন্ত রাস। বাসন্তী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা—সব লালে লাল'। বিশ্বের নরনারীর হৃদয় অনুরাগে অরুণ হইয়া উঠে—সেই রঙ লইয়াই বিশ্বপতির আবীর খেলা।

এমনই একদিনে বাঙ্গালীর ঘরে নামিয়া আসিলেন এক দেবশিশু। সেদিন সন্ধ্যায় চন্দ্র-গ্রহণের উপলক্ষে নবদ্বীপে হরিধ্বনির রোল উঠিয়াছিল। যিনি আসিলেন তিনি যেন এই হরিধ্বনি সম্মুখে করিয়াই আবির্ভূত হইলেন। লোকে বলিল,

কলিযুগে সার ধর্ম নামসঙ্কীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥

নাম-প্রেম প্রচারের জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা। ইহার আবশ্যকতা বুঝিতে হইলে সে সময়কার ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। দেশের স্বাধীনতা অস্তমিত, আত্মশক্তিতে লোকের আস্থা তিরোহিত এবং

প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস বিলুপ্ত প্রায়। আড়াই শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান আক্রমণে শিথিল সমাজদেহ আরও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার যে শিথিলতার সুযোগে বাঙ্গলাদেশ তুড়ি দিয়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহার প্রতিক্রিয়া ভাবনাহীন নিরুদ্যমে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছিল। বাঙ্গালী তাহার দৈহিক, মানসিক ও চারিত্র বল হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যে বৌদ্ধধর্ম একদিন সমগ্র ভারতে নির্বাণের অমোঘবাণী ঘোষণা করিয়াছিল, সেই সদ্ধর্মও নানা কদাচার ও কদর্থের কূপে পড়িয়া চরম দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধতান্ত্রিক পাষণ্ডীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তৈলাধার পাত্র অথবা পাত্রাধার তৈল—এই চিন্তা করিতে করিতে বিরলকেশ মস্তকে প্রচুর তৈল মর্দন করিতেছিলেন, সাধারণ জনগণ যোগীপালের গানে ও বিষহরির পূজায় ধর্মকর্মের পরাকাষ্ঠা মনে করিতেছিল, সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য ভগবানের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আপামর সাধারণকে ধর্মভাবে দীক্ষিত করিলেন; কোনও বিচার করিলেন না, ভেদ রাখিলেন না, ভগবন্নামের মালা গাঁথিয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের গলায় দোলাইয়া দিলেন।

নিজ গুণে গাঁথি নামচিন্তামণি
জগতে পরাওল হার।—গোবিন্দদাস

নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সভারে।

—চৈতন্যচরিতামৃত / কৃষ্ণদাস কবি

ধর্ম যে কৃচ্ছ্রসাধ্য নহে এবং সকলেরই যে ইহাতে সমান অধিকার আছে, ইহাই শ্রীচৈতন্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ইহার ফলে জাতিভেদের অসংখ্য প্রাচীর একে একে ধ্বসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল:

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥

সেদিন সমাজ এই বিপ্লবী মতবাদে স্বেচ্ছায় সাড়া দিয়াছিল। যদিও বেশীদিন এই সাম্যবাদ হিন্দু সমাজে স্থায়ী হইতে পারে নাই, তথাপি ইহা এক নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছিল—ভারতে সাম্যবাদ স্থাপন করিতে হইলে ধর্মের উপরই তাহার ভিত্তি নিহিত করিতে হইবে। হিন্দুর জাতি-ভেদরূপ বিষধর এই সাম্যবাদের নিকট উদ্যতফণা অবনত করিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেও এই অভেদনীতি কার্যকরী হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বঙ্গের বহু হিন্দু যে এই জাতিভেদের গ্লানি হেতু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম শুধু যে এই ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়াইয়া ইহার প্রকোপ ব্যাহত করিল, তাহা নহে, বহু মুসলমানকেও এই ধর্মের প্রতি পক্ষপাতী করিয়া তুলিল। তাহার ফলে আমরা বহু মুসলমান কবিকে পাইলাম—যাঁহারা বাংলাভাষায় পদরচনা করিয়া মহাজনের পর্যায়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ের সামাজিক অবস্থা একটু প্রণিধান করা আবশ্যক। আমরা জানি যবন হরিদাস বৈষ্ণবধর্মে প্রীতির জন্য তাঁহার সম্প্রদায় কর্তৃক লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সমাজ জীবনে এমন একটি সময় আসিয়াছিল, যে সময়ে অনুদারতা বা সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। কারণ ইহা নিশ্চিত যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংকীর্ণ বা প্রসারহীন চিত্তবৃত্তি থাকিলে কখনই এত মুসলমান কবি বা পদকর্তা আমরা পাইতাম না।

সমাজের দিক দিয়া, চৈতন্য প্রচারিত ধর্ম শুধু জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের শিথিলতা সম্পাদন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অবনতদিগকে উন্নত করিতেও ইহা বহুল পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অবনতির যুগে যে সকল পঙ্কিলতা সমাজদেহকে কলুষিত করিতেছিল, তাহার কুফল কতদূর গড়াইত, তাহা বলা যায় না, যদি সেই সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম বাধা না জন্মাইত। আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দের পুত্র

বীরচন্দ্র প্রভু বহু নেড়ানেড়ি ও তথাকথিত সহজিয়াকে বৈষ্ণব ধর্মে স্থান দান করিয়াছিলেন। ইহাও জানা যায় যে, পরবর্তীকালে ইহাতে বৈষ্ণবধর্মে কতকটা মলিনতা প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা চৈতন্যের সংকল্পিত আদর্শের দোষে নহে। কারণ বৈষ্ণবধর্মের আদর্শ সেই যুগে যে উচ্চ ধাপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা যে কোন যুগে যে কোনও দেশের পক্ষে গৌরব-জনক ইহা নিঃসংকোচে বলা যায়।

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

—চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা

স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা-গ্রহণের জন্য মহাপ্রভু প্রিয়ভক্ত হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ আদর্শ যে পরবর্তীকালে অনুসৃত হয় নাই, তাহাই বৈষ্ণব ধর্মের অবনতির অন্যতম কারণ, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সংসারে থাকিয়া এরূপ আদর্শ পালন করা অসম্ভব বলিয়া শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ সঙ্গিগণ সংসারের মায়ামোহ হেলায় উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইঁহারা সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারকে অবজ্ঞা করেন নাই। সংসার পাপের কুণ্ড অতএব সংসার ছাড়িয়া না গেলে মুক্তিলাভ অসম্ভব—এই চিন্তা লইয়া চৈতন্য সংসার ত্যাগ করেন নাই। পক্ষী যেমন বায়ুভরে উর্ধ আকাশে উড়িয়া সস্নেহে নিম্নের পৃথিবীর দিকে চাহিয়া থাকে, শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পারিষদগণের অন্তরও সেইরূপ জগতের প্রতি করুণায় পরিপূর্ণ ছিল। দুর্গত মানবের উপায় কি হইবে? তাহারা কি উপায়ে সহজে উন্নততর জীবনের স্বাদ লাভ করিবে, ইহাই তাঁহাদের সন্ন্যাসপূত জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জগতের জন্য কান্দিয়াই মহাপ্রভু জগতের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। প্রেম যাহার নিকট পরম পুরুষার্থ স্নেহপ্রণয়রতি যাহার সমস্ত কামনা সমস্ত

কল্পনার সার বস্তু, জগৎ তাহার নিকট এক নূতন সত্যরূপে প্রতিভাত হইবে, ইহা বিচিত্র কি?

সংসারের অসারতা, জগতের অনিত্যতার কথা নিত্য শুনিয়া শুনিয়া মানুষের মনে যে অনপনেয় দৈন্য, যে নৈরাশ্যপূর্ণ ক্লৈব্য আসিয়াছিল, তাহা কতকটা এই নূতন ধর্মের শিক্ষায় দূর হইতে লাগিল। সংসার দুঃখময়, ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভই একমাত্র কাম্য—এই শিক্ষায় যে কুফল ফলে, তাহা আমরা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছি। চৈতন্যের প্রেমধর্ম এই শিক্ষার মোড় ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। মানুষকে সর্বপ্রকার হীনতা হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীচৈতন্য তাহাকে সংসারের মধ্যেই স্থাপন করিলেন। সবার উপরে মানুষ সত্য। ভগবানের যত লীলা আছে, তাহার মধ্যে "সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ"। মানুষকে এমন করিয়া মর্যাদা দান আর কেহ কখনও করে নাই। ভগবান মানুষের সঙ্গে মানুষ সাজিয়া লীলাখেলা করেন। মানুষ হেয় নহে, অসার নহে, মানুষ ভগবানের নিত্য দাস। এই দাসত্বই তাহার সারাজীবনের সারকামনা। গোপীভর্ত্তুশ্চরণ কমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ।

জীব যে কৃষ্ণের নিত্য দাস তাহা ভুলিয়া গিয়াই যত গণ্ডগোল বাধাইল এবং মায়া তখনই তাহার গলায় ফাঁস পরাইল। তাহা না হইলে মানুষ নিজ স্বরূপে অবস্থান করিয়া সংসারের দুঃখ শোক মোহ হেলায় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইত। যে ভগবৎপ্রেম মানুষের পক্ষে পরম কাম্য তাহা তাহার জন্মগত অধিকার। এ অধিকার কষ্টসাধ্য তপ জপ আসন প্রাণায়ামের দ্বারা লাভ করা যায় না। আপনা হইতেই এই মনুষ্য জন্মেই ভগবানের দান হিসাবে ইহা আমরা লাভ করিয়াছি।

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।

সংসার দুঃখময় কে বলিল? যে সংসারে থাকিয়া এই মনুষ্য দেহেই কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করা যায়, তাহা হইতে পলায়ন করাই যে শ্রেয়ঃ এরূপ মনে করিবার কি হেতু আছে? বৈষ্ণবেরা এই জন্য মুক্তি চাহেন না।

এই যে দৃষ্টিভঙ্গী জগতের সম্বন্ধে, সমাজের সম্বন্ধে, মানবজীবনের সম্বন্ধে ইহা সম্পূর্ণ অভিনব। ভগবান প্রেমময়, তিনি জগৎ সংসারকে দুঃখকষ্টের আগার করিয়া সৃষ্টি করিবেন কেন? ভগবান মধুর, এই জগৎ মধুর, তুমি মধুর, আমিও মধুর। মাধুর্য্যভরা এই জগতের মাঝখানে মানুষকে স্থাপন করিয়া ভগবান তাহার প্রেম লুণ্ঠন করিবার জন্য সর্বদা লালায়িত। এই মাধুর্যবাদ সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায়।

বাংলাদেশে সাহিত্য যে প্রেরণা লাভ করিল, তাহার ফলে অসংখ্য কবি অসংখ্য কবিতার অর্ঘ্য রচনা করিলেন প্রেমের উদ্দেশে, প্রেমময়ের উদ্দেশে। সেই যুগে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী যুগে কাব্য সাহিত্যে যেরূপ বান ডাকিয়াছিল, তেমন আর কোনও দেশে,কোনও যুগে দেখা যায় নাই। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি পদ রচনা করিয়া যুগলভজনের প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পরে সেই পথে অসংখ্য যাত্রী প্রেমের মন্দিরে যাত্রা করিল। অধিকন্তু নূতন যুগে সেই যাত্রাপথের পুরোভাগে সর্বসম্মতিক্রমে স্থাপন করিল শ্রীচৈতন্যকে। সেই হইতে গৌরচন্দ্রিকায় সাহিত্যের আর এক বিরাট পর্ব আরম্ভ হইল। গৌরাঙ্গলীলা স্বতন্ত্রভাবেও সাহিত্যে একটি সুপরিসর স্থান করিয়া লইল। খেতরীর মহোৎসব হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর বৈষ্ণব কবিতায় শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রতিহত প্রভাব চলিয়া আসিতেছে। এখানেও আমরা দেখি যে, শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের যে দরদ তাহার তুলনা আমরা আর কোথাও পাই না।

পূর্বে চৈতন্যের প্রবর্তিত সাম্যবাদের কথা বলিয়াছি। এই সময়ের পদাবলী সাহিত্যে সেই অখণ্ড সাম্যবাদের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী পদকর্তাদের পরিচয়ে দেখি "দ্বিজ", "বড়ু" (ব্রাহ্মণ তনয়) প্রভৃতি আভিজাত্যবোধক শব্দের ছড়াছড়ি। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যে সকলেই সমান। সকলের উপাধি দাস। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রত্যেক বর্ণই দাস-সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে চাহিতেছেন। ইহাকে "বিনয়" মাত্র মনে

করিলে ভুল করা হইবে। এখন অনেকস্থলে বৈষ্ণবদের দৈন্ত বা বিনয় উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, বিনয় মিলনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। যতক্ষণ মনে অভিমান বা অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ কোনও প্রকার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজের মধ্যে যে অসংখ্য প্রকার উচ্চনীচ ভেদ চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সমভূমিতে আনয়ন করিতে না পারিলে সমস্ত সাম্য-চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণ বুঝিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু এখনও তাহা বুঝিতে পারি নাই। জগতে মানুষে মানুষে যদি কখনও প্রীতি সম্ভব হয়, তবে তাহার প্রথম সোপান রচিত হইবে এই বিনয়েরই মধ্য দিয়া; সনাতন রক্ষণশীলতার অপ্রতিহত প্রভাব সেই স্থানে ব্যর্থ। সহস্র সহস্র টোলে বাঙ্গালা ও ভারতের নানাস্থান হইতে ছাত্রেরা নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায়, দর্শন, কাব্য, স্মৃতির আলোচনা করে; বিদ্যার বিলাসই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণদের জীবনের প্রধান আনন্দ। জাতিভেদের কঠিন নিগড়ে সমস্ত সমাজ বাঁধা, ব্রত নিয়ম অনুষ্ঠান, আচার ও প্রথার নির্মম অনুশাসনে সমাজ জীবন নিষ্প্রভ, মানুষের চলার পথ শত বাধানিষেধে কণ্টকিত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমেই সেই প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানের অচলায়তনের উপর নির্মমভাবে আঘাত করিলেন, শুষ্ক তর্ক ও বিদ্যাবিলাসের মোহকে ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ছুৎমার্গের নাগপাশকে শিথিল করিয়া দিলেন। তিনি নির্ভীকভাবে প্রচার করিলেন, ঈশ্বরে ভক্তিই ধর্ম—জ্ঞান ও তর্কের পথে এই ধর্মলাভ হয় না। ভগবানের দৃষ্টিতে উচ্চ নীচ জাতিভেদ নাই। প্রেমধর্মের মধ্য দিয়া মানুষকে তিনি নূতন মর্যাদা দিলেন, হিন্দু সমাজের সম্মুখে তিনি নূতন আদর্শ স্থাপন করিলেন। সমাজের যে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ, দীনাতিদীন, সেও তাহার প্রেমস্পর্শে আত্মোপলব্ধি করিতে শিখিয়াছিল। মহাপ্রভু তাঁহার অমোঘ ভাষায় বলিয়া দিলেন,

যে-ই ভজে, সে-ই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥

অর্থাৎ মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিতে পারে একমাত্র প্রশস্ত ক্ষেত্রে; সেই ক্ষেত্র হইতেছে ধর্মের বিস্তৃত প্রাঙ্গন। ধর্ম বাহিরের বস্তু নয়, প্রাণের জিনিষ। প্রাণের মিলনই সত্যকার মিলন। সুতরাং ভারতবর্ষে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শ্রীচৈতন্তের শিক্ষাই অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থের জন্ত, সুযোগ সুবিধার জন্ত যে মিলন তাহা সাময়িক ভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেও তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে না।

শ্রীচৈতন্যের বিদ্যাবিলাস

শ্রীচৈতন্তকে যাঁহারা ভগবানের স্বরূপ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের নিকট তিনি কতদূর লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, এ প্রশ্ন একান্ত অবান্তর ও অনাবশ্যক। যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিভূত্বমণ্ডিত, যিনি সরস্বতীপতি ও অন্তর্যামী, তাঁহার সমস্ত জ্ঞান করামলকবৎ, সমস্ত বিদ্যা অধীত। কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র-তনয় বিশ্বম্ভর, শচীর আদরের দুলাল, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মেখলা-মণ্ডিত নবদ্বীপের অধ্যাপক নিমাই কোন্ কোন্ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ নবপ্রকাশিত একখানি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, চৈতন্তের বিদ্যার দৌড় ছিল কলাপ ব্যাকরণ, কিছু কাব্য ও কিছু অলঙ্কারশাস্ত্র এই পর্যন্ত।* শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

* "His (Chaitanya's) studies, however, appear to have been chiefly onfined to Sanskrit Grammar especially Kalapa Grammar and possibly o some literature and rhetoric to which allusion is made.

Padyavali—By Rupa Gosvamin edited by Professor Sushil Kumar De -Introduction, Page xviii.

"It is misdirected zeal which invests him (Chaitanya) with the false lory of scholastic eminence"...... —Ibid P, xxxiv

গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণ মাত্র কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥
অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥—১৫ পরি

অর্থাৎ কলাপ-ব্যাকরণের ত্রিলোচনদাসকৃত পঞ্জীটীকায় তিনি পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার পরে কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন দাসের উপর বরাৎ দিয়াছেন:

অধ্যয়ন লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্য মঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন॥—ঐ

বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন যে, বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন শোকের সেই প্রথম আবেগে পুত্রবৎসল জগন্নাথ মিশ্র স্থির করিলেন যে, নিমাইকে আর পড়িতে দিবেন না; পড়িলে হয়ত বিশ্বরূপের মত বিশ্বম্ভরও ফাঁকি দিয়া পলাইবে! কিন্তু শচীদেবী এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খ হইয়া থাকিবে? মূর্খ ছেলেকে লোকে কন্যা দিতে সম্মত হইবে কেন? মায়ের মত কথাই বটে। যাহা হউক, বিশ্বম্ভরকে পড়িতে দেওয়া হইল। তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।

গঙ্গাদাসে করিলেন পুত্র সমর্পণ।
গঙ্গাদাস যত্নে পড়ায়েন ব্যাকরণ॥—ভক্তিরত্নাকর

কিন্তু তাঁহার বিদ্যা এই ব্যাকরণেই সীমাবদ্ধ ছিল কি.না তাহাই অনুসন্ধেয়। চৈতন্যভাগবত বলেন যে চৈতন্য পাণ্ডিত্য-গৌরবে এরূপ উদ্ধত হইয়া উঠিলেন যে, কোনও পণ্ডিতকে দেখিলেই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া বিব্রত করিয়া।

সবে বলেন ভাই ইহানে দেখিয়া।
ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া॥

একদিন পথিমধ্যে মুকুন্দকে দেখিয়া প্রভু ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, আজ তোমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাইতে হইবে।

মুকুন্দ বলেন ব্যাকরণ শিশু শাস্ত্র।
বালকেতে ইহার বিচার করে মাত্র ॥

আমি তোমাকে অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর দাও দেখি।

বিষম বিষম যত কবিত্ব প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার ॥

প্রভু সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। শেষে বলিয়া দিলেন, আজ যাও। ভাল করিয়া পুঁথি দেখিয়া কাল আবার আসিও। মুকুন্দ অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন।

'ঋষিসম শ্রীমুরারি গুপ্ত নদীয়াতে' (ভক্তিরত্নাকর)। তিনি গৌরচন্দ্রকে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রশ্ন করিয়া ঠকাইতে চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে অলঙ্কারশাস্ত্রেও গৌরচন্দ্রের জ্ঞান অসাধারণ।

মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা ॥

আর একদিন গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের বিচার হইল। গৌরাঙ্গ তাঁহাকেও নিরুত্তর করিয়া দিলেন।

গদাধর ভাবে আজি বর্ত্তি পলাইলে।

অতঃপর সকলেই বুঝিলেন যে, চৈতন্য অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছেন।

পরম পণ্ডিত জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন দেখি সংভ্রম অপার ॥ —চৈঃ ভাগবত
যত বিদ্যাবন্ত বৈসে নদীয়া নগরে।
সকলেই সমীহা করেন বিশ্বম্ভরে ॥ —ভক্তিরত্নাকর

শুধু তাহাই নহে। গৌরাঙ্গ ইচ্ছা করিয়া যুক্তিবলে সমস্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে পারিতেন, আবার যুক্তিবলে সে সমস্ত স্থাপন করিতেন।

হয় ব্যাখ্যা নয় করে নয় করে হয়।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয় ॥

এইরূপ পাণ্ডিত্য গ্রীস দেশে সক্রেতিসের সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়। সেকালে ঐ দেশে আরও কতকগুলি পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শুধু তর্কের জোরে এইরূপ 'হয়'কে 'নয়' এবং 'নয়'কে 'হয়' করিতে পারিতেন। তাঁহাদের নাম ছিল 'সফিষ্ট' (Sophist)। এই সকল পণ্ডিতের সম্বন্ধে আর যাহাই বলা যাক্ না কেন, তাঁহারা যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক হইয়া নিমাই শত শত ছাত্র পড়াইতেন,

শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমৎকার মন ॥

—চৈঃ চ—১৬শ পরি

নিমাই পণ্ডিত তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে একবার পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তখন সেই বাইশ বছরের 'বালক' পণ্ডিত কিরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন, তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। সেখানে—

বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিল পড়িতে ॥

কিছুদিন পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জন করিয়া নিমাই নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন।

ঘরেরে আইলা প্রভু নানাধন লঞা।
মাতৃস্থানে দিল ধন হরষিত হঞা ॥

—লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল—আদি

লোচন দাসের মতে অধ্যাপক গঙ্গাদাস ব্যতীত বিষ্ণু পণ্ডিত এবং সুদর্শন পণ্ডিতের নিকট চৈতন্য পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন।

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িবারে গেলা বিষ্ণু পণ্ডিতের ঘর॥
সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে।
পঢ়িলা জগত-গুরু তা' সভার হিতে॥ —ঐ, ঐ

ইহার দ্বারা বোধ হয় চৈতন্য গঙ্গাদাসের নিকট ব্যাকরণ এবং বিষ্ণুপণ্ডিত এবং সুদর্শনের নিকট কাব্য, দর্শন ও অলঙ্কার ইত্যাদি পড়িয়াছিলেন।

এই সময়ে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বহুস্থান হইতে জয়পত্র লইয়া নবদ্বীপে আসিলেন। তিনি অনেক হাতী ঘোড়া দোলা লোকজন লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাহা না হইলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এরূপ বিভব হওয়া সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, গঙ্গাতীরে আসিয়া তিনি নিমাই পণ্ডিতের সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্বিজয়ী বলিলেন:—

ব্যাকরণ পড়াও নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্য শাস্ত্রে লোক কহে তোমার গুণগ্রাম॥
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ॥

—চৈতন্য চরিতামৃত ; আদি

দিগ্বিজয়ীর গঙ্গাস্তব শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত তাহার অলঙ্কার-দোষ ধরিলেন। দিগ্বিজয়ী বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

ব্যাকরণিয়া তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥

কিন্তু এই অলঙ্কারের বিচারেই দিগ্বিজয়ী পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

ইহারা সকলেই যখন নিমাইকে কলাপ ব্যাকরণের পণ্ডিত বলিতেছেন, তখন অধ্যাপক সুশীলকুমার বলিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু কথা

এই যে, যাঁহারা নিমাই পণ্ডিতকে ব্যাকরণিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারাই আবার তাঁহাকে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত বলিতেছেন। কাজেই তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে সমগ্রটাই গ্রহণ করিতে হয়। এক অংশ গ্রহণ করিয়া অন্য অংশ বর্জন করা সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় আইন (Evidence Act)ও অনুমোদন করে না।

মহাপ্রভু যখন নীলাচলে গমন করিলেন, তখন সার্বভৌম সেই অপরিণত বয়স্ক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কিছু সদুপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সার্বভৌম প্রবীণ পণ্ডিত। তিনি সমস্ত উত্তর ভারতে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করিয়া উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের রাজপণ্ডিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহা শুধু বাসুদেব সার্বভৌমের ব্যক্তিগত গৌরব নহে, ইহা বঙ্গদেশের গৌরব। সার্বভৌম বলিলেন, সন্ন্যাস-গ্রহণে কি লাভ? ইহাতে কেবল অহঙ্কার, দাম্ভিকতা বাড়ে। সন্ন্যাসী হইলেই তাঁহাকে মহাজ্ঞানী সাজিতে হয়। মহাভাগগণ সন্ন্যাসী দেখিলেই প্রণাম করেন। অথচ তাঁহাদের প্রণাম গ্রহণ করা মহাপাপ। তুমি এমন কার্য্য কেন করিবে? কৃষ্ণভক্ত যে হয়, সে সকলকেই প্রণাম করে। শিখাসূত্র ঘুচাইয়া লাভ হয় এই যে, কাহাকেও প্রণাম করিতে হয় না, সকলের প্রণাম গ্রহণ করা যায়।

মহাপ্রভু বলিলেন, আমি সন্ন্যাসী এ-কথা আপনাকে কে বলিল? আপনি আমাকে কৃপা করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দান করুন!

সন্ন্যাসী করিয়া,জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥

—চৈতন্য ভাগবত

যাহা হউক, মহাপ্রভু বিনীত ভাবে বলিলেন—

—মোর এক আছে মনোরথ।
তোমার মুখেতে শুনিবাঙ ভাগবত॥

সার্বভৌম জিজ্ঞাসিলেন—

বল দেখি তোমার সন্দেহ কোন স্থানে।
আছে তাহা যথাশক্তি করিব বাখানে॥

মহাপ্রভু তখন তাঁহাকে 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ে' ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ বলিতে বলিলেন। সার্ব্বভৌম ভাগবতের এই প্রসিদ্ধ শ্লোকের তের রকম ব্যাখ্যা করিলেন। তখন

ঈষৎ হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কয়।
যত বাখানিলে তুমি সব সত্য হয়॥
এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান।
বুঝ দেখি বিচারিয়া হয় কি প্রমাণ।— চৈতন্য ভাগবত

অর্থাৎ সার্ব্বভৌম যে তের প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার পরেও চৈতন্য আরও অনেক রকম ব্যাখ্যা করিয়া সার্বভৌমকে স্তম্ভিত করিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নিমাই পণ্ডিত শুধু কলাপ ব্যাকরণে পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে :

গৌরাঙ্গ সুন্দর পঢ়ে নিরন্তর
ভোট কম্বলে বসিঞা।
কলাপে আলাপ করয়ে প্রলাপ
ঈষৎ হাসিঞা॥

* * * *

সটীক ব্যাস বৈ কাব্য অলঙ্কার
নাটক তর্ক সাহিত্যে।
না দেখি না শুনি বেদশাস্ত্র বাখানি
সভা মোহে কবিত্বে॥

মহাপ্রভু দক্ষিণাপথে বৃদ্ধকাশী দর্শন করিয়া যখন এক গ্রামে আসিলেন, তখন ব্রাহ্মণগণের সহিত শাস্ত্র বিচারে চৈতন্ত তাঁহার পারদর্শিতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন :

তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম ॥
নিজ নিজ শাস্ত্রোদগ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দুষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ —চৈঃ চঃ মধ্যলীল

প্রভুর পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া পাষণ্ডীরা আসিল। পাষণ্ডী অর্থে বৌদ্ধ, নাস্তিক প্রভৃতি বুঝাইত। মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্য্য স্বয়ং আসিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং ভক্তির দোহাই দিয়া ইহাঁকে নিরস্ত করা সম্ভব হইল না।

তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে ॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥—ঐ ঐ

গোবিন্দদাসের করচার প্রমাণও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। করচাকে অনেকে প্রমাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু অধ্যাপক সুশীল-কুমার দে করচা হইতে যখন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিয়া দেখাইব যে গোবিন্দদাসের প্রমাণ অনুসারেও মহাপ্রভু একজন অসামান্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও কবিরাজ গোস্বামীর ন্যা নানাস্থানে শাস্ত্রবিচারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য ছিল সকলকে হরিনাম লওয়াইতে। যাঁহারা তাঁহা প্রেমাশ্রু দেখিয়া গলিয়া যাইতেন, তাঁহাদিগকে সহজেই নিজ মতে আনয়ন করিতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহারা তার্কিক, মায়াবাদী বা নাস্তিক তাঁহাদের সঙ্গে বিচার করিতে হইত। গোবিন্দ লিখিয়াছেন যে এই সকল বিচারে—

কখন তামিল বুলি বলে গোরারায়।
কভু বা সংস্কৃত বলি শ্রোতারে মাতায়॥

যেখানে যেখানে তিনি গিয়াছেন সেখানে 'সকলের বুলি বুঝে শচীর দুলাল।' গোবিন্দ নিজে সে সকল 'কাঁই মাই' বুঝিতে পারিতেন না বলিয়া এবং তাঁহার বিদ্যা বেশী ছিল না বলিয়া তিনি শাস্ত্র-বিচারের বিশদ বিবরণ দিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে সকল বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতেই চৈতন্যের পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি দাক্ষিণাত্যদেশে গমনের পূর্ব্বে নারায়ণগড়ে এক ধনীর সঙ্গে তর্কে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। তিনি বটেশ্বরে তীর্থরাম নামক ধনীকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপ নাগর নগরে এক দুরাত্মা ব্রাহ্মণকে ধন্য করিয়াছিলেন। ত্রিপাত্র নগরে প্রসিদ্ধ শৈবপণ্ডিত ভর্গদেবকে তিনি হরিনাম লওয়াইয়াছিলেন। বেঙ্কট নগরে এক পণ্ডিত ছিলেন, বেদান্তে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। প্রভুর সঙ্গে তিনি বিচার করিতে আসিলেন। প্রভু বলিলেন, আমি হারিলাম, বিচার প্রয়োজন কি? কিন্তু পণ্ডিতটি নাছোড়বান্দা! তখন বিচার হইল,

অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়।
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তুলি চৈতন্য বুঝায়॥
অবশেষে ঘোরতর বিচার বাধিল।
ক্রমে ক্রমে দণ্ডিস্বামী হারি মানি নিল॥

ত্রিবঙ্কু দেশে ব্রহ্মবাদী আসিয়া তর্ক করিতে লাগিল। চৈতন্য তাহাকে 'বেদ বেদান্তের কথা শাস্ত্রের প্রমাণ' বলিয়া বুঝাইলেন। গুর্জ্জরী নগরে অর্জ্জুন নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে 'বেদান্তের সূক্ষ্ম কথা' খুলিয়া "তন্ন তন্ন করিয়া" বুঝাইলেন। সহ্যকুলাচল ত্যাগ করিয়া উত্তরে গিয়া পূর্ণনগরে যখন গৌরাঙ্গ উপনীত হইলেন, তখন সেখানে বহু পণ্ডিত তর্ক করিতে আসিলেন। 'অসংখ্য পণ্ডিত আসে বিচার করিতে।'

এইরূপ ভাবে যেখানেই চৈতন্যদেব গিয়াছেন সেখানেই শাস্ত্রের বিচার করিয়া নিজমত স্থাপন করিতে হইয়াছিল।

ইহার দ্বারা মনে হয় না কি যে সেই কালে যখন ভারতবর্ষে পাণ্ডিত্যের প্রতিভা অব্যাহত ছিল, যে কালে সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই কালে শ্রীচৈতন্য শুধু ভক্তির প্রাবল্যে নহে, নিজের অসাধারণ বিদ্যা-প্রভাবে দক্ষিণ দেশ ও নীলাচলে আপনার গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন?

শ্রীগৌরাঙ্গ ও লীলাকীর্ত্তন

শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে এক ফাল্গুনের সন্ধ্যায়। পূর্ণিমার রজনী। সেদিন আবার চন্দ্র গ্রহণ। সহস্র সহস্র লোক গ্রহণ-স্নান করিবার জন্য নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে আসিতেছে। সকলেই হরিবোল হরিবোল বলিতেছে। ভক্তগণ হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে স্নানে আসিতেছেন।

"হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥"

আর একদিন যখন কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেদিনও আমরা প্রকৃতির সঙ্গে এইরূপ এক বিশেষ সামঞ্জস্য দেখি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী। কারাগৃহ অন্ধকার। কিন্তু সহসা দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হইয়া উঠিল, ঋক্ষ গ্রহ নক্ষত্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল, নদীসকল নির্মল জলে পূর্ণ হইল, সরোবরে পদ্মফুল ফুটিল, বনরাজি কুসুমনিচয়ে শ্রীসমন্বিত হইল, পক্ষিকুল কলধ্বনি করিতে লাগিল। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের নির্বাণোন্মুখ বহ্নি দীপ্ত হইয়া জ্বলিল, সমুদ্রের জলকল্লোলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া জলধরগণ গুরু গুরু

ডাকিতে লাগিল। এমনি এক ঘোর অন্ধকার নিশীথে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। কৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রয়োজন পৃথিবীর ভার-হরণ। পাপের ভারই দুর্বহ। পৃথিবীর যখন পাপের মাত্রা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে তখন ভগবান আবির্ভূত হয়েন, ইহাই সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণ অবতারের প্রয়োজন পাপের উচ্ছেদ-সাধন—শত্রু-সংহারের দ্বারা, যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা। শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারও পাপের উচ্ছেদ-সাধন নিমিত্ত—কিন্তু সংহারের দ্বারা নহে, ভক্তির দ্বারা, নাম-প্রেমের দ্বারা। তিনি হরিনাম প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কাজেই হরিধ্বনির মধ্যে তাঁহার জন্ম। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অবতার-প্রয়োজনের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য।

নবদ্বীপে চন্দ্র-গ্রহণের সময় সজ্জন দুর্জন সকলেই হরিবোল বলিয়া গঙ্গায় ডুব দিতেছে বটে। কিন্তু ইহার দ্বারা সে সময়কার অবস্থা প্রতীয়মান হয় না। লোকের মধ্যে ভক্তির অভাব ছিল, দেশে তখন মুসলমানদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া গিয়াছে। বাসুলী বিষহরি যোগীপাল ভোগীপাল প্রভৃতি দেবতার পূজা অর্চ্চনা হইতেছে। পূজায় তান্ত্রিক আচারেরই প্রাচুর্য্য। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংক্রামিত হইয়া নানা বীভৎস আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে। পাষণ্ডী, ভণ্ড ও নাস্তিকের অত্যাচারে ভক্তগণ সন্ত্রাসিত। পূজা-অর্চ্চনায় লোকে ধন-পুত্রই কামনা করে, কীর্ত্তন শুনিলে উপহাস করে। ভগবৎ-নামের কোনই প্রসঙ্গ নাই। এমনই কলিতিমিরাকুল যুগে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইলেন।

নিরুপায়ের উপায় ভগবান সর্বকালেই! কিন্তু এবারে এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইল, যাহা কোনও অবতারে কখনও হয় নাই। সে নূতন উপায় হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা জীবের উদ্ধার। প্রত্যেক অবতারেই ভগবান যুগধর্ম স্থাপন করেন।

'কলি যুগের যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥'

মুরারি গুপ্ত বলিতেছেন যে, চৈতন্যাবতারের মুখ্য প্রয়োজন কীর্ত্তন প্রচার।

'কীর্ত্তনং কারয়ামাস স্বয়ং চক্রে মুদান্বিতঃ।'

শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া হইতে ফিরিয়া এই নাম-কীর্ত্তনের পদ্ধতি দেখাইলেন।

হরিকীর্ত্তনমাদিশৎ স্মরণ্
পুরুষার্থায় হরেরতিপ্রিয়ম্।
স গয়াসু পিতৃক্রিয়াং চরণ্
হরিপাদাঙ্কিতভূমিষুস্বয়ম্ ॥

—মুরারিগুপ্তের করচা ১ম প্র, ১ম সর্গ।

নিমাই পণ্ডিত আর অধ্যাপনা করিতে পারিলেন না।

"গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে,
তদবধি কৃষ্ণ ব্যাখ্যা আন নাহি স্ফুরে।
যে প্রভু আছিল ভোলা মহাবিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাহি বাসে ॥
সর্ব্বদা বলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে হাস হুঙ্কার ক্ষণে বহু রঙ্গ ॥"

"শিষ্য বলে পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর।
প্রভু বলে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মর ॥"

তখন প্রভু বলিলেন—

"তোমা সবা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥"

যেখানে তোমাদের ইচ্ছা হয় গিয়া পড়িতে পার, আমার দ্বারা আর হইবে না।

"কৃষ্ণ বিনা আর বাক্য না স্ফুরে আমার।"

পড়িতে বসিলেই আমি দেখি,

'কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।'

শিষ্যেরাও অধ্যাপকের উপযুক্ত; তাঁহারা বলিলেন আমরা আর পড়িব না।

"এত বলি,

পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর।"

তখন গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন তবে কৃষ্ণ নাম কর।

'কৃষ্ণ নামে পূর্ণ হউক সবার বদন।'

পড়ুয়ারা বলিলেন আমরা ত সংকীর্ত্তন করিতে জানি না, আমাদিগকে শিখাইয়া দিন। তখন প্রভু করতালি দিয়া 'দিশা' দেখাইয়া দিলেন।

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।"

ছাত্র এবং অধ্যাপক মিলিয়া এই নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে কোলাহল হইয়া উঠিল; তখন নবদ্বীপের সব লোক ধাইয়া আসিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—

'এবে সংকীর্ত্তন হৈল নদীয়া নগরে।'

ইহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে পূর্ব্বে এমনটি ছিল না।

ইহার পর হইতে রীতিমত কীর্ত্তন চলিল। কিন্তু সে কীর্ত্তনে কি গীত হইত, কি প্রণালীতে গান করা হইত, তাহা ত আমরা জানিবার সুযোগ পাই না। চৈতন্য-ভাগবত হইতে এইমাত্র জানিতে পারি যে এই সংকীর্ত্তন হইতে—

'নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।'

এখন হইতে তাঁহার চেষ্টা হইল যাহাতে

"ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ,
সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।"

ইহার পরে নিত্যানন্দচন্দ্র নবদ্বীপে আসিয়া উদিত হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন

"নদীয়ায় শুনি বড় হরি সংকীর্ত্তন।
কেহ বলে এথায় জন্মিলা নারায়ণ।"

ইহার পর হইতে

'মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে।'

নিরন্তর ভক্তগণ মধ্যে এই কীর্ত্তনানন্দ হইত।

শ্রীবাসবিপ্রাদিগণৈঃ ক্বচিন্নবং
গায়ত্যসৌ নৃত্যতি ভাবপূর্ণঃ।

মুরারির করচা—১ম ১৬শ

রাত্রিকালে শ্রীবাসের গৃহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন হইত। সে কীর্ত্তনের আসরে সকলের প্রবেশাধিকার থাকিত না।

এই মত প্রতি নিশা করয়ে কীর্ত্তন।
দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্যজন॥

এই কীর্ত্তনে গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেন। বৃন্দাবনদাস যখনই এই কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, তখনই তিনি এই নৃত্যের কথাই কহিয়াছেন।

তিনি মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন যে নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনের একমাত্র জন্মদাতা। 'সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ।' কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে চন্দ্রগ্রহণের সময় শত সহস্র লোক সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে আগমন করিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গৌরচন্দ্রের পূর্ব্বেও একরূপ সংকীর্ত্তন হইত। তাহা হইলে কীর্ত্তনের ইতিহাসে শ্রীগৌরাঙ্গের

স্থান কোথায়? শুধু যে বৃন্দাবনদাস ইহাকে (এবং নিত্যানন্দকে) সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলিতেছেন, তাহা নহে। কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলিয়াছেন,

'চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম সংকীর্ত্তন।'

কবিরাজ গোস্বামী ইহা কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটক হইতে অনুবাদ করিয়াছেনঃ—

রাজা। ঈদৃশং কীর্ত্তনকৌশলং ক্বাপি ন দৃষ্টম্।

সার্ব্বভৌম। ইয়মিয়ং ভগবচ্চৈতন্যস্য সৃষ্টিঃ।

প্রতাপরুদ্র রাজা মহাপ্রভুর কীর্ত্তন শুনিয়া যখন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন

'কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন।'

তখন সার্বভৌম বলিলেন, 'মহারাজ! ঠিকই বলিয়াছেন। এই সংকীর্ত্তন চৈতন্যের সৃষ্টি।' এই কীর্ত্তনে প্রভু তাণ্ডব নৃত্য করিতেন। সে সময়ে তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত। কবিরাজ-গোস্বামী ইহাকেই চৈতন্যের কীর্ত্তন-বিলাস বলিয়াছেন।

'মহাপ্রেম মহানৃত্য মহাসংকীর্ত্তন।'

এইরূপ উক্তি হইতেও বুঝা যায় যে চৈতন্যের এই কীর্ত্তন এক পরম অদ্ভুত ব্যাপার ছিল।

লোচনদাস এই সংকীর্ত্তনকে সর্বধর্মসার বলিয়াছেন। এই হরিসংকীর্ত্তন পঞ্চম বেদ এবং ইহার প্রবর্তক গৌরচন্দ্র।

'জয় জয় সংকীর্তন দাতা গৌর হরি।'

'অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি আমারে আনিয়া।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞ স্থাপে সুদৃষ্টি হইয়া।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে সকলেই একবাক্যে মহাপ্রভুকে সংকীর্ত্তনের

জনক বলিতেছেন। তাঁহার অবতারের প্রয়োজনও বঙ্গীয় গোস্বামীদিগের মতে 'সংকীর্ত্তন-প্রকাশ।'

শ্রীবাসাদির গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া এই সংকীর্ত্তন হইত। অবশ্য ইহার উদ্দেশ্য এই যে অভক্ত কেহ এই নৃত্যবিলাসে উপস্থিত না থাকেন। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে ভজনের এই নূতন পদ্ধতির হয়ত সমাদর হইবে না এই সন্দেহও সম্ভবতঃ মনে ছিল বলিয়া দ্বার রোধ করা হইত।

বৃন্দাবনদাস একদিনকার এক ঘটনায় ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নবদ্বীপের এক পরম সাধুপ্রকৃতি ব্রহ্মচারীর বড় সাধ হইল মহাপ্রভুর কীর্ত্তন দেখিবার জন্য। তিনি শ্রীবাসকে ধরিয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীবাস বলিলেন 'প্রভুর আজ্ঞা না হইলে ত তোমাকে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না, প্রভু যদি রাগ করেন!' শেষে সেই বিপ্রের আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সন্ধ্যাকালে নিজের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিলেন। প্রভুর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তিনি মুকুন্দ মুরারি বনমালী প্রভৃতি ভক্তের সঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু আনন্দ হইল না; তখন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে একজন গৃহকোণে লুকায়িত রহিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ সে ব্রহ্মচারীকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল; সে ব্রাহ্মণ যার-পর-নাই লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, যাহা হউক ভাগ্যে ত কিছু দর্শন ঘটিল, ইহাই পরম লাভ।

'অদ্ভুত দেখিনু নৃত্য অদ্‌ভুত ক্রন্দন।
অপরাধ অনুরূপ পাইনু তর্জ্জন॥'

তিরস্কৃত হইয়াও যে ব্রহ্মচারী মনে মনে অভিমান করিলেন না, ইহা বুঝিয়া প্রেমের ঠাকুর তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কৃপা করিলেন। এই কীর্ত্তনের বর্ণনায় চৈতন্যভাগবত বলিতেছেন—

'হরিবোল হরিবোল হরি বল ভাই।
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই।"

সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে শ্রীবাসঅঙ্গনে নামকীর্ত্তনই অনুষ্ঠিত হইত। এই কীর্ত্তন-মঙ্গলের কথা ক্রমেই সুপ্রচারিত হইয়া পড়িল। তখন নাগরিকগণ দধি ঘৃত কদলী মাল্য প্রভৃতি লইয়া মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন 'কৃষ্ণভক্তি হউক সবার' এবং বলিয়া দিলেন 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপ করিলে সর্বসিদ্ধি হইবে। এই নাম করিতে কোনও বিধির প্রয়োজন নাই। সর্বক্ষণ এই নাম লওয়া যাইতে পারে।

"দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥"

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

মহাপ্রভু সর্বক্ষণ নাম করিতেন বলিয়া সদানন্দ নামে একজন উড়িয়া কবি তাঁহাকে 'হরিনাম-মূর্ত্তি' আখ্যা দিয়াছিলেন।

পদাবলী যে সে সময়ে সুপরিচিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। জয়দেবের কোমল-কান্ত পদাবলীর ত কথাই নাই, বাঙ্গালা পদাবলীও আস্বাদ্য ছিল। মহাপ্রভুর সমসাময়িক মুরারি গুপ্ত বলিতেছেন

ভাবানুরূপ শ্লোকেন রাসসংকীর্ত্তনাদিনা
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ লীলারসবিদ্যা-নিদর্শনম্।

এই ভাবানুরূপ শ্লোক ও রাসসংকীর্ত্তন বাঙ্গালা পদাবলীও হইতে পারে। সে সময়ে যে বাঙ্গালা পদাবলীর মাধুর্য বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃত হইত তাহা নানা প্রমাণ হইতেও বুঝা যায়।

কাটোয়া হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দের 'প্রেমপূর্ণ কৌশলে' অদ্বৈতভবনে উপনীত হইলেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্য বিদ্যাপতির একটি পদ গাহিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন :

কি কহবরে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

অনেকদিন পরে মাধব গৃহে ফিরিয়াছেন, সখি! আজ আমার আনন্দের সীমা। অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা আনন্দ আর হইতে পারে না। এই বলিয়া তিনি নৃত্য, গর্জন, হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া ও পদটি শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম-ব্যথা জাগিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া মুকুন্দ 'ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গায়িতে।' মুকুন্দ অতি সুমিষ্ট গান করিতেন। পদাবলীও তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। মুকুন্দের গীতে মহাপ্রভুর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। মহাপ্রভু তিনদিন উপবাসী ছিলেন; তাহা হইলেও আচার্য্যপ্রভু তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন নৃত্য করিবার জন্য। মুকুন্দ তখন গান ধরিলেন:

হা হা প্রাণ প্রিয়সখি কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেম বিষে মোর তনুমন জরে॥
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ।
যথা গেলে কানু পাঙ তথা উড়ি যাঙ॥

এই পদটি সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের। কিন্তু ইহার ভনিতা নাই। পদকল্পতরুতেও পদটি উদ্ধৃত হয় নাই। যাহা হউক এই পদটি শুনিয়া মহাপ্রভু প্রথমে সংজ্ঞা হারাইলেন। পরে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত হরিদাস প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।*

সন্ন্যাসের পূর্বে মহাপ্রভু কোনদিন শ্রীবাসের গৃহে, কোনদিন বিদ্যানিধির গৃহে, কোনদিন মুরারির, কোনদিন বা আচার্য্যরত্নের গৃহে

* ৺সতীশচন্দ্র রায় এই ঘটনাকে মধ্যলীলার শেষ সময়ে লইয়া ফেলিয়াছেন। "এই মধ্যলীলার শেষ সময়ে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনের পথ ভুলিয়া রাঢ়দেশে উপনীত হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমপূর্ণ কৌশলে তিনি শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে সমানীত হইয়াছিলেন"—শ্রীপদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড ভূমিকা ৯৭।

কীর্ত্তন করিতেন। (চৈঃ চন্দ্রোদয় নাটক)। এইরূপে নবদ্বীপে ক্রমে কীর্ত্তনের প্রসার বাড়িতে লাগিল। খোল করতাল লইয়া নাগরিকগণ কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে কাজি সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। কাজির হুকুমে সরকারী লোক তখনই খোল ভাঙ্গিয়া দিল এবং লোকের গৃহদ্বারে অনাচার করিল।

'ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।'

এইরূপ অত্যাচার যখন চলিতে লাগিল তখন মহাপ্রভু নগরকীর্ত্তন বাহির করিলেন। অনেকে মহাত্মা গান্ধীকে Civil Disobedienceএর প্রবর্ত্তক মনে করেন, কিন্তু ইহার প্রথম প্রবর্তন হয় নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা। তিনি কাজির হুকুম অমান্য করিয়া কীর্তন বাহির করিলেন। নবদ্বীপের প্রতিগৃহ পূর্ণকুম্ভ রম্ভা ও আম্রপল্লবে শোভিত হইল, ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলিল, নগরের যত লোক সকলেই কীর্ত্তনের মিছিলে যোগদান করিল। প্রত্যেক লোকের হাতে প্রদীপ। খোল করতাল শঙ্খ লইয়া কীর্ত্তন বাহির হইল। কাজি তাহার প্রতিষেধ করিতে না পারিয়া রক্ষা করিলেন। এই নগরকীর্ত্তনে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আপামর সাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। দ্বিতীয়, লোকের মনে ইহা অদ্ভুত সাহসের সঞ্চার করিল। এই সাহস গণতান্ত্রিকতার একটি ফল—অর্থাৎ বহু লোকের সহযোগিতা এক অনাস্বাদিতপূর্ব শক্তির সন্ধান দিল। তৃতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই যে এই কীর্ত্তনে মহাপ্রভু একটি পদ গাহিয়া নৃত্য করিতেছেন; সে গানটি এই—

তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে
শার্ঙ্গধর তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥

সম্ভবতঃ এই কলিটি কোনও প্রচলিত গানের ধুয়া। এরূপ ভাবে পদাবলী গান করিয়া সম্ভবতঃ ইহার পূর্বে কীর্ত্তন করা হইত না। সেইজন্যেই বলা হইয়াছে

চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্ত্তন।

এই কীর্ত্তনের নাম বেড়া-কীর্ত্তন। এক এক দল স্বতন্ত্র হইয়া কীর্ত্তন করেন, এইরূপ বহুদলে বিভক্ত হইয়া একসঙ্গে কীর্ত্তনের নাম বেড়া-ক প্রথম বারের এই বেড়া-কীর্ত্তনে আর একটি পদ গান করা হইয়াছে:

বিজয় হইলা হরি নন্দ ঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী গলে দোলে বনমালা ॥

—চৈতন্য-ভাগবত, মধ্য

এইরূপ কীর্ত্তন কেহ কখনও দেখে নাই। ইহাতে শাস্ত্রের বচনের সহিতও অপূর্ব মিল হইল—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদৈঃ
সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজ্ঞৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

চৈতন্য অবতারের অস্ত্র সঙ্গোপাঙ্গ এবং যজ্ঞ সংকীর্ত্তন। ভাগবতের ২য় অধ্যায়ে কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি গৌরাঙ্গের লীলায় দেখিতে পাই।

নবদ্বীপ হইতে যখন গৌরাঙ্গ নীলাচলে গেলেন, তখনও তিনি কীর্ত্তন করিতেন। গম্ভীরায় বসিয়া রাত্রিদিন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দরায়ের জগন্নাথবল্লভনাটক, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গলঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গান করিতেন এবং শুনিতেন। এগুলি কি ভাবে গীত হইত তাহা আমরা জানিতে পারি না, মহাপ্রভু এগুলির আস্বাদন করিতেন এইমাত্র জানি। মহাপ্রভুর ভাবোল্লাসের গতি বুঝিয়া এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে মুকুন্দ এবং স্বরূপদামোদর শ্লোক ও কবিতা আবৃত্তি করিতেন বা গান করিতেন ইহাই বুঝা যায়। গম্ভীরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এই সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে রীতিমত কীর্ত্তন হইত তাহা বলা যায় না। এই পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি সংস্কৃত, একখানি বাঙলা, অপর একখানি মৈথিল, ব্রজবুলি বা বাঙ্গালা তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। সেকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

মধ্যে সংস্কৃতের চলনই বেশী ছিল। সেইজন্য আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে, মহাপ্রভু সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়া কীর্ত্তন করিতেছেন; কখনও কখনও উড়িয়া পদেও পরম আবেশে নৃত্য করিতেছেন।

"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ।
মন মজিলারে চকা চন্দ্রকু চাউ॥"
উড়িয়া পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হইল।
স্বরূপেরে সেই পদ গায়িতে আজ্ঞা দিল॥

হে জগন্নাথ, তোমার পদে মস্তক নত করি। আমার মন-চকোর তোমার মুখচন্দ্র দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছে। এই গীতে প্রভু তিন প্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন।

পুরীতে জগন্নাথমন্দিরেও বেড়া-কীর্ত্তন হইয়াছিল। গৌড়ীয় ভক্তগণ সেখানে সম্মিলিত হইয়াছেন। জগন্নাথ মন্দিরে সন্ধ্যাধূপ আরতি দেখিয়া ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন।"
"অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।"
"চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায়॥"

যতদিন গৌড়ীয় ভক্তেরা পুরীতে ছিলেন ততদিন প্রত্যহ তিনি এইমত কীর্তন করিতেন। স্বরূপদামোদর উচ্চকণ্ঠে গান করিতে পারিতেন। মহাপ্রভু তাহাতে নাচিয়া আনন্দ পাইতেন। এইরূপ গুণ্ডিচা মন্দিরে এবং রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণ লইয়া মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতেন।

রথযাত্রায় গৌড়ীয় কীর্ত্তনীগণকে চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইজন খুলি বাদ্য করিতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে এক একজন নৃত্য করিবেন স্থির হইল।

নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥

ইহা ব্যতীত কুলীন গ্রামের এক কীর্ত্তনের দল, অদ্বৈত-আচার্য্যের এক কীর্ত্তনের দল, শ্রীখণ্ডের এক কীর্ত্তনের দল লইয়া সর্ব্বসমেত ৭টি সম্প্রদায় হইল এবং চৌদ্দ মাদল বাজিতে লাগিল। জগন্নাথের রথের আগে ৪ দল দুই পার্শ্বে দুই দল এবং পশ্চাতে একদল গান করিতে করিতে চলিলেন। পরে মহাপ্রভুর যখন নাচিতে মন হইল, তখন সাত সম্প্রদায়কে মিলিত করিলেন। স্বরূপদামোদরাদি দশজন প্রভুর সঙ্গে গায়িতে লাগিলেন। অন্য দল সব দূরে থাকিয়া যোগ দিলেন। প্রভু এইবার উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং প্রথমে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহার উদ্বোধন করিলেন। কতক্ষণ এইভাবে নৃত্য করিয়া প্রভু ভাববিশেষে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তাণ্ডব নৃত্য পরিত্যাগ করিলেন। স্বরূপ ভাবের গতি বুঝিয়া—

সেই ত পরাণ নাথে পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ॥

গান ধরিলেন। এ পদটি কাহার তাহা আমরা জানি না। 'হা হা প্রাণপ্রিয় সখি', পদটিরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। শেষোক্ত পদটির অবশিষ্ট কলি একজন বন্ধু পুরাতন কাগজের মধ্যে চণ্ডীদাসের নামে পাইয়াছেন। কিন্তু 'সেই ত পরাণ নাথে পাইলুঁ' এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। স্বরূপগোস্বামী এই ধুয়ামাত্র গাহিয়াছিলেন। তাহাতেই আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া দিয়াছেন। জানিতে ইচ্ছা হয় পদটির শেষে কি ছিল। 'সেই ত পরাণনাথে পাইলুঁ'—'ত' দেওয়াতে রহস্য আরও জটিল হইয়াছে। একি 'রেবা রোধসি বেতসীতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে' এই শ্লোকের অনুবাদ? এই মধুর পদটি কাব্যপ্রকাশে উদ্ধৃত হইয়াছে; এই পদ্যের ভাব লইয়া শ্রীরূপগোস্বামী লিখিলেন—সেই আমার প্রাণ রমণকে কুরুক্ষেত্রে দেখিলাম বটে, কিন্তু "মনো মে কালিন্দী-পুলিনায় স্পৃহয়তি'। আমার সাধ

হইতেছে সেই কালিন্দী পুলিনের নীপঘন ছায়ায় মিলনের জন্য, যেখানে শ্যামের মোহন বাঁশী বাজিয়া যমুনাকে উজান বহাইত। আমার বোধ হয় স্বরূপ-গোস্বামী নিজেই এই কবিতার ভাব লইয়া ঐ বাঙ্গালা পদটি লিখিয়াছেন। স্বরূপদামোদর অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং তৎকালপ্রচলিত বাঙলা পদাবলীর সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন। স্বরূপ-গোস্বামীর ধুয়া শুনিয়াই প্রভু আনন্দে মধুর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন জগন্নাথের রথ চলিতে লাগিল। আগে আগে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন করিয়া চলিলেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে মহাপ্রভুর সময়ে পদাবলীর প্রচার থাকিলেও কীর্ত্তন বলিতে ইঁহাদের নৃত্য ও ভাবাবেশ বুঝাইত। কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন :—

সান্দ্রানন্দময়ী ভবন্নমুদিনঃ দেবো নরীনৃত্যতে।

—চৈতন্যচন্দ্রোদয়—২য় অঙ্ক।

আমরা কীর্ত্তন বলিতে যাহা বুঝি গরাণহাটী মনোহরসাহী প্রভৃতির সুর—ইহা অবশ্য পরবর্ত্তীকালের সৃষ্টি। মহাপ্রভুর সময়ে কীর্ত্তনে কিরূপ সুর ছিল তাহা আমরা জানি না। তবে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এখনকার মত পালাবদ্ধভাবে সাজাইয়া কীর্ত্তন করিবার প্রণালীর দৃষ্টান্ত আমরা কোথাও দেখিতে পাই না। প্রধানতঃ নামকীর্ত্তনই কীর্ত্তন নামে অভিহিত হইত। লীলাকীর্ত্তন যাহা ছিল, তাহা ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভু নবদ্বীপে ও নীলাচলে আস্বাদন করিতেন। কিন্তু তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই নাই। গৌরনিত্যানন্দকে সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলা হয় তাহার কারণ এই—মহাপ্রভু যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন কীর্ত্তনকে তাহার বাহন করিলেন। ধর্ম্মের সাধক (এবং প্রধান সাধক) যে কীর্ত্তন —ইহা মহাপ্রভুর পূর্বে স্বীকৃত হয় নাই। তিনি এবং নিতাইচাঁদ নিজের দ্বারা দেখাইলেন যে সংকীর্ত্তনের দ্বারা নরনারীর মন যত সহজে

আকর্ষণ করা যায় এমন আর কিছুতে নহে। ধর্ম জনকতক ভক্তের মধ্যে, ঋষিযোগী বা সাধুসন্ন্যাসীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলেই হইল না। সকলকে পারের খেয়ায় তুলিতে না পারিলে শুধু দুই একজন পার হইলেই কি, আর না হইলেই কি? আয়াসসাধ্য ভজন-সাধনারাধনার পরিবর্তে এই কীর্ত্তনযজ্ঞ বা নামযজ্ঞ মহাপ্রভু সকলের চক্ষুর সমক্ষে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসহ ধারণ করিলেন। ইহাই চৈতন্যচন্দ্রের অবদান কীর্ত্তনের ইতিহাসে।

দক্ষিণাপথে আর একজন ভাবুক এইরূপভাবে কীর্ত্তন-মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার নাম তুকারাম।

তুকারামের অভঙ্গ বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় প্রসিদ্ধ। তুকারাম একজন মারাঠী বৈষ্ণব সাধু ছিলেন। তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ছিল 'রাম কৃষ্ণ হরি'। এই মন্ত্র তিনি স্বপ্নে পাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সহিত তুকারামের অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তুকারাম নামের প্রভাবে মাতোয়ারা ছিলেন। "নাম অতি মধুর। নাম যে কত মধুর তাহা বর্ণনা করা যায় না। নামের মাধুর্য্য ক্রমেই বাড়ে। একবার এই নামের মাধুর্য্য যে আস্বাদন করিয়াছে, তাহার আর কিছুই ভাল লাগে না। ভগবান নিজে তাঁহার নাম যে কত মধুর তাহা জানেন না। পদ্মফুল কি জানে যে তার সৌরভ কত মিষ্ট? শুক্তি কি তার মুক্তার মূল্য জানে? নাম করার যে মহিমা, সেই মহিমা কীর্ত্তনের। ভগবানকে পাইতে হইলে কীর্ত্তনের মত এমন আর কোনো উপায় নাই। যেখানে কীর্ত্তন হয়, সেখানে ভগবান আপনি সমাগত হন। কীর্ত্তন শুনিয়া যার কর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না, তার কান মূষিকের গর্তের ন্যায়।" তুলনা করুন, মহাপ্রভুর উক্তি—

কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম জানিহ সেই শ্রবণ
জন্ম তার হৈল অকারণে।

কীর্ত্তন করিতে হইলে শরীরের সামর্থ্য থাকা চাই। সেইজন্ত তুকারাম প্রার্থনা করেন "হে ভগবান আমার শরীর যেন কখনও অসমর্থ না হয়। জীবন একদিন যাইবেই, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকি, ততদিন যেন কীর্ত্তন গায়িতে পারি।" কীর্ত্তনকে তুকারাম নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন—এই নদী ভগবানের দিকে ঊর্দ্ধমুখে প্রবাহিত হয়। কখনও তিনি কীর্ত্তনকে বলিয়াছেন ভজনের ত্রিবেণী—ভক্ত, ভগবান ও নাম এই ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়া কীর্ত্তন হইয়াছে। কীর্ত্তনে যে অমৃতের ধারা বহে, তাহাতে জগৎসংসার পবিত্র হইয়া যায়। [যিনি কীর্ত্তন করিবেন, তিনি অর্থ লইবেন না, অনাহারে থাকিবেন, গন্ধমাল্যাদি ধারণ করিবেন না। এইরূপভাবে কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া দক্ষিণাপথে তুকারাম এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।] প্রবাদ এই যে, ভগবান নিজে আসিয়া তাঁহাকে আপনার রথে তুলিয়া লইয়া যান।

সে যাহাই হউক, শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তনকে যে ভাবে প্রভাবিত করিয়া গিয়াছেন, তুকারাম তাহা পারেন নাই। চৈতন্যের প্রভাব এইরূপ যে, এক্ষণে [কোনও বৈষ্ণব মহাপ্রভুর নাম আগে না করিয়া কীর্ত্তন করিতে সম্মত হইবেন না। এই যে কীর্ত্তনের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর নাম করা হয় ইহাকে গৌরচন্দ্রিকা বা সংক্ষেপে গৌরচন্দ্র বলে।] কীর্ত্তনের আসরে তাঁহাকে আবাহন করাই গৌরচন্দ্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। রাধাকৃষ্ণলীলা গান করিবার পূর্ব্বে মহাপ্রভুর তদ্‌ভবোচিত পদ গান করিবার রীতি আছে। যথা, শ্রীকৃষ্ণের রূপগান করিবার পূর্ব্বে গৌরাঙ্গের রূপ, বিরহ গায়িবার পূর্ব্বে গোরাচাঁদের সংসারত্যাগ, হোলি গানের পূর্ব্বে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক রাধাকৃষ্ণের হোলিলীলা স্মরণ, ইত্যাদি।

এই যে গৌরচন্দ্রিকা গান করিবার প্রথা, ইহা কত দিনের? অবশ্য মহাপ্রভুর প্রকট সময়ে নিশ্চয়ই এইরূপ হইত না। এমন কি শ্রীবাস প্রভৃতি পারিষদগণ যখন চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত করিয়া

তাঁহার জয়গান করিতে লাগিলেন, তখন প্রভু অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন।

"অহে অহে শ্রীনিবাস পণ্ডিত উদার।
আজ তুমি সব কি করিলা অবতার॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলে আমারে তা বুঝাও এখন॥"

কিন্তু কে শুনে কাহার কথা? লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর জয়গান করিতে লাগিল। শ্রীবাস বলিলেন, আমাদের না হয় দণ্ড দিতে পার, কিন্তু—

আব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জনে দণ্ড তুমি করিবা কেমনে।"

এই হইতে গৌরাঙ্গ-গীতি বিশেষভাবে প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সময়ে গৌরচন্দ্রিকার উল্লেখ আমরা কোথাও পাই নাই।

আমার বোধ হয় গৌরচন্দ্রিকার সূত্রপাত নরোত্তম ঠাকুর হইতে। নরোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোভাবের অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি রাজপুত্র হইয়াও অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীবৃন্দাবনধামে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি নিজ জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন এবং গ্রামের প্রান্তে ভজনখুলি নির্ম্মাণ করিয়া সাধনভজন করিতে থাকেন। নরোত্তম দাসের উদ্দেশ্যে খেতরীতে যে মহোৎসব হইয়াছিল, সে অতি অপূর্ব ব্যাপার। বর্ণনা পড়িয়া যাহা মনে হয়, তাহাতে এরূপ বিচিত্র উৎসব উহার পূর্বে বা পরে অনুষ্ঠিত হয় নাই। গৌরনিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং তাঁহাদের পার্ষদেরা অনেকেই তখন নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবাদেবী ছিলেন এই উৎসবের হোত্রী, শ্রীনিবাস প্রধান পুরোহিত, নরোত্তম উদ্‌গাতা এবং রাজা সন্তোষ দত্ত যজমান। খেতুরীতে ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই মহোৎসব হয়:

শ্রীগৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
শ্রীরাধারমণ রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে।

এই ছয় বিগ্রহের প্রথমেই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে স্থাপিত দেখিতে পাই। নরোত্তম শ্রীখণ্ডে গিয়া প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আসেন। শ্রীখণ্ডের ঋষিকল্প নরহরি সরকার ঠাকুর এই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দিবানিশি তাঁহার সম্মুখে ভজনসাধন করিতেন। খেতরীতে যে সকল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইল তাহার মধ্যে গৌরাঙ্গ-বিগ্রহই সর্বাগ্রবর্ত্তী। ইহা হইতেই তখনকার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উৎসবে অপূর্ব সঙ্কীর্ত্তনস্থল প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই সংকীর্ত্তনস্থলে শ্রীনিবাসাদি আর্য্যগণ এবং প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক সমবেত হইয়াছিলেন। বঙ্গের এমন কোনও বিখ্যাত গায়ক, বাদক, ভক্ত মহাজন ছিলেন না যিনি খেতরীর মহোৎসবে যোগদান করেন নাই। শ্রীজাহ্নবা দেবী সকলের অলক্ষ্যে বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ নরোত্তমকে গান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর নরোত্তমকে মাল্যচন্দন দিলেন। নরোত্তম ভূমিতে মস্তক ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন এবং দেবীদাস অমৃতের ন্যায় ধ্বনি করিয়া মর্দ্দলে শব্দ করিলেন। গৌরাঙ্গদাস প্রভৃতি সেই সঙ্গে মৃদঙ্গ করতাল প্রভৃতি বাজাইতে লাগিলেন। ভক্তিরত্নাকরে এই কীর্ত্তনের বিশদ বর্ণনা আছে। গ্রন্থকার খেতরীর উৎসবের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীনদের মুখে শুনিয়া তিনি এই উৎসবের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। নরহরি বা ঘনশ্যাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই সম্ভবতঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা জানা যায়। খেতরীর মহামহোৎসবের একশত বৎসর পরেও যে ইহার স্মৃতি উজ্জ্বলভাবেই বৈষ্ণব-সমাজে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। নরোত্তমদাস ঠাকুরের পরিবারভুক্ত নরহরি চক্রবর্ত্তী যে নরোত্তমের লীলা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ

করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা যায়। ভক্তিরত্নাকরে ও নরোত্তমবিলাসে তিনি এই কীর্ত্তনান্দের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না যে তিনি শুধু কল্পনার মালা গাঁথিয়া ইহা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে কীর্ত্তন দুই প্রকার ছিল—নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ। অনিবদ্ধ কীর্ত্তন গোকুলদাস গান করিলেন। সুর তান রাগিণী মূর্চ্ছনা প্রভৃতি বিস্তার করিয়া তিনি এই গান করিয়াছিলেন। আর নরোত্তম নিজে গাহিয়াছিলেন নিবদ্ধ কীর্ত্তন। আমার বোধ হয় পালাক্রমে যাহা গান করা হইত তাহার নাম ছিল নিবদ্ধ কীর্ত্তন। নরোত্তম নিজে গরাণহাটি সুরের স্রষ্টা, তিনি অসামান্য পদকর্ত্তা। নরোত্তমের প্রার্থনার পদের ন্যায় কবিতা কোনও ভাষায় নাই। নরোত্তম পালা সাজাইয়া গান করিয়াছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধিকাভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ।
সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ॥
আকর্ষণ মন্ত্র কি উপমা তায় দিতে।
হইল বিহ্বল তাহা প্রথমে গাইতে॥
তদুপরি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের বিলাস।
গাইবেন মনে এই কৈল অভিলাষ॥

—ভক্তিরত্নাকর ১০ম।

ইহাই গৌরচন্দ্রিকার আরম্ভ। ঠাকুর মহাশয় যে দৃষ্টান্ত দিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী গায়ক ও পদকর্ত্তগণ অনুসরণ করিয়াছেন।

চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রতি অধ্যায়ের সূচনায় গৌরচন্দ্রের নাম করিবার রীতি দেখা যায়। সে সময়ে বৈষ্ণবদের মধ্যে গৌরচন্দ্রকে প্রণাম না করিয়া কোন গ্রন্থ বা নূতন কোন অধ্যায় আরম্ভ করিবার প্রথা ছিল না। কিন্তু কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকা শুধু গৌরচন্দ্রকে প্রণাম মাত্র নহে। এক্ষণে গৌরচন্দ্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই যে,

শ্রীরাধাকৃষ্ণের কোন লীলা গান করিতে হইলে সেই লীলার ভাবোচিত গৌরাঙ্গবিষয়ক গান করিতে হয়। এই প্রণালীর সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই—খেতরীর উৎসবের বর্ণনায়। তখনও পালাক্রমে গান করিবার পদ্ধতি সুপ্রচলিত হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। কারণ ঐ খেতরীর মহোৎসবে দেখিতে পাই—

কেহ হোলিযাত্রা পদ্য পঢ়য়ে উচ্ছায়।
কেহ নবদ্বীপ বৃন্দাবন লীলা কেহ গায়॥—নরোত্তমবিলাস

ইহা হইতে বুঝা যায় যে গান করিবার প্রণালী তখনও সুনিয়মিত হয় নাই। সে দিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা। যে দিন মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় নবদ্বীপে, সেদিনও ফাল্গুনী পূর্ণিমা। খেতরীতে মহাপ্রভুর জন্মোৎসব গান করা হইয়াছিল। আর হোলির দিন বলিয়া কেহ কেহ উৎসাহসহকারে ('উচ্ছায়') হোলি সম্বন্ধে পদ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, খেতরীর উৎসবে শ্রীঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক যে প্রথার উদ্ভব হইল, তাহাই পরবর্ত্তীকালে নানা গায়ক মহাজন কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া—বর্ত্তমান আকারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পূর্বে অনেক মহাজন গৌরলীলা সম্বন্ধে পদ লিখিয়াছিলেন। সেইগুলি যথানিয়মে সন্নিবেশিত করিয়া পালা সাজানো হইতে লাগিল। খেতরীতেই নরোত্তমদাস আরতির পরে বাসুঘোষের পদ গাহিয়া গৌরচন্দ্রিকা করিয়াছিলেন, ইহা নরোত্তমবিলাসে জানা যায়—

সখি হে, ওই দেখ গোরা কলেবরে।

এই অনুরাগের পদটি ঠাকুর মহাশয় গান করিয়াছিলেন। খেতরীতে যাহা হইল, সমস্ত বৈষ্ণব জগৎ তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল। প্রচারের দিক দিয়া খেতরীর মহোৎসব এক অতি প্রয়োজনীয় ঘটনা। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম, মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন খেতরীর উৎসব হইতেই দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। নবদ্বীপে যে ধর্মের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, বৃন্দাবনের গোস্বামীপাদগণ যে ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, খেতরীর মহোৎসবে তাহা আপামর সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল।

কীর্ত্তনে গৌরচন্দ্রিকা

রাই রূপে তার অঙ্গ ঢাকা।
হেরিলাম গৌর বাঁকা ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর সেই 'নাগর বনমালী', গোপীজনবল্লভ মদনমোহন। কিন্তু রাইরূপে তাঁর নীলকান্তমণি সদৃশ অঙ্গকান্তি ঢাকা পড়িয়াছে। শুধু যে তিনি শ্রীরাধিকার স্বর্ণকান্তি চুরি করিয়াছেন, তাহা নহে। সেই মহাভাব-স্বরূপিণীর ভাবরাশিও তিনি অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন। কখনও তিনি প্রেমের কাঙ্গাল, আবার কখনও প্রেমের ঠাকুর, প্রেমিক শিরোমণি; কখনও শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া আকুল, আবার কখনও 'জয়রাধে শ্রীরাধে' বলিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন; তিনি কখনও ভক্ত, কখনও ভগবান। তাই একজন আধুনিক কবি বলিতেছেন

দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে
দেখে যারে তোরা দেখে যা।

বাঙলার কবিতায়, গানে শ্রীগৌরচন্দ্র চির মধুধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। কেহ তাঁহার তত্ত্ব বুঝে, কেহ বুঝে না। কেহ তাঁহাকে ভগবান্ জ্ঞানে আরাধনা করেন, কেহ তাঁহাকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। যিনি যে ভাবে তাঁহাকে ভাবুন না কেন বাঙলার সাহিত্যে, বাঙলার সঙ্গীতে বাঙলার ভাবধারায় মহাপ্রভু অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—

যে বা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত গৌরাঙ্গ-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলে হইবে বড় হিত ॥

মহাপ্রভু সন্ন্যাসী, ত্যাগী, বিরক্ত, বৈরাগী। অথচ তিনি শুষ্ক, নীরস ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন রহেন নাই। যোগীর ন্যায় তিনি সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তি রোধ করিয়া নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত ধীর স্থির অচঞ্চল ভাবে শ্বাসরোধ করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন নাই। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়মহিমায় বিভোর হইয়া থাকিতেন, নিভৃতে স্বরূপ রামানন্দ ন্যায় ভক্তের সঙ্গে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদাবলী আস্বাদন করিতেন—আর কাঁদিয়া আকুল হইতেন। কখনও কখনও ভাবের আতিশয্যে অজ্ঞান হইয়া যাইতেন। তাঁহার চোখের জলে পাষাণ গলিয়া যাইত। তাঁহার এই দিব্যোন্মাদনা পূর্ণ গানে এদেশে ভাবের যমুনা একদিন উজান বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পুরুষোত্তমে জগন্নাথ-দেবের মন্দির মধ্যে গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যখন তিনি শ্রীমূর্তি দর্শন করিতেন, তখন তাঁহার নয়ন-জলে সেখানকার 'খাল' ভরিয়া যাইত—এমন দৃশ্য এদেশের ইতিহাসে পূর্বে বা পরে কেহ কখনও দেখে নাই।

গরুড়ের সন্নিধানে রহি করে দরশনে
সে আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড় স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্নখালে
সেই খাল ভরে অশ্রুজলে॥

ইহাই কীর্তনের আদর্শ। এই অনুরাগ, এই ব্যাকুলতা, এই আকুতি কীর্তনগানের, তথা বৈষ্ণবধর্মের মূল সূত্র। এইটুকু বাদ দিলে গান শুধুই অনুষ্ঠান। প্রতিমাতে যেমন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার রীতি আছে, গানেও সেইরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। প্রাণহীন গানের কসরতে নিপুণতা প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রাণের প্রেরণা পাওয়া যায় না। দেবতার পূজার পূর্বে অধিবাসের নিয়ম আছে, সেই অধিবাসে প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কল্পে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। এই জন্যই হিন্দুরা পুতুল পূজা করিবার অপবাদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন। অধিবাসে যে

প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই, ঋত্বিক্ এমন প্রতিমার পূজা করেন না সেইরূপ যে কীর্ত্তনে গৌরচন্দ্রিকা গীত হয় না, এমন কীর্তন ভক্তেরা শ্রবণ করেন না। পূজার যেমন অধিবাস, কীর্তনের সেইরূপ গৌরচন্দ্রিকা। গৌরচন্দ্রিকা অর্থে শ্রীগৌরচন্দ্র সম্বন্ধীয়। কীর্ত্তনে যে রসের গান হইবে, গৌরচন্দ্রিকায় সেই রসাশ্রিত পদ গান করিতে হয়। সুতরাং গৌরচন্দ্রিকা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে গায়ক অভিসার, মান, বিরহ অথবা রাসলীলা গান করিবেন। এইরূপ পূর্ব্বাভাস থাকে বলিয়া গৌরচন্দ্রিকার গৌণ অর্থ হইয়াছে সূচনা বা পূর্বাভাস।

গৌরচন্দ্রিকার উদ্দেশ্য সকলে বুঝিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্যই এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত। কীর্তন-গান মহাপ্রভুর সম্পত্তি। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে সংকীর্তনের একমাত্র জনক বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অন্য সমস্ত কারণ ছাড়িয়া দিলেও শুধু কৃতজ্ঞতার দিক দিয়া গৌরচন্দ্রিকার আদর হওয়া উচিত। বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ নহে; তাহারা অন্যের সম্পত্তি ব্যবহার করিতে হইলে তাহার নাম করিতে ভুলে না। সেইজন্য কোনও পুরাণ পাঠ করিতে হইলে নরনারায়ণকে নমস্কার করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাসদেবকে নমস্কার করিতে হয়। সুতরাং যে করুণাবতার কীর্তনের ভাগীরথী ধারা বঙ্গে আনয়ন করিয়া এদেশ ধন্য করিয়াছিলেন, কীর্তনের প্রারম্ভে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া বাঙালী দু'ফোঁটা চোখের জল কেন না ফেলিবে? মহাপুরুষদিগের কীর্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া তাঁহাদের স্মৃতির অর্চনা করিবার প্রথা সমস্ত সভ্য ও উন্নত জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সেদিক দিয়াও গৌরচন্দ্রিকা আমাদের পরম আদরের বস্তু হওয়া উচিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা গৌরচন্দ্রিকার মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। শ্রোতাদিগের কথা দূরে থাক্, একজন সুকণ্ঠ কীর্তন গায়ক আমার নিকটে গৌরচন্দ্রিকার আবশ্যকতা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন

শুনিয়াছি এখন তিনি গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়া থাকেন। অনেক কীর্তন-গায়িকার গানে গৌরচন্দ্রিকা কোনও রূপ প্রকারে নমঃ নমঃ করিয়া সারিয়া দেওয়া হয়। দোহারগণ মহাকলরবে গৌরচন্দ্রিকার এক কলি বা দুই কলি গান করিয়া ক্ষান্ত হয়, তখন গায়িকা ধীরে ধীরে বৃন্দাবন লীলা গায়িতে আরম্ভ করেন। ঢপ কীর্তনে অনেক বিষয়েই কীর্তনের নিয়ম রক্ষিত হয় না, সুতরাং এক গৌরচন্দ্রিকা সম্বন্ধে অনুযোগ করিলে কি হইবে ?

সাধারণ শ্রোতাদিগেরও যে এদিকে মনোযোগ আছে, তাহা মনে হয় না। অনেকে গৌরচন্দ্রিকার পরে আসরে আসিতে পারিলেই যেন সুখী হয়েন। একস্থলে আমি গান করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার সময় কম দেখিয়া উদ্যোক্তা বলিলেন আপনি একটু পরেই না হয় যাবেন ; ততক্ষণ আমরা গৌরচন্দ্রিকা সারিয়া রাখিব। আমি মনে মনে হাসিলাম কিছু বলিলাম না, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ঠিক সময়ে উপস্থিত হইলাম ; তাহাতেও নিস্তার পাইলাম না। বন্ধুবর নিয়মিত সময়ের পূর্বেই ঐ অনাবশ্যক জিনিষটি আরম্ভ করাইয়া দিয়াছেন এবং প্রায় তাহা সাঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন !

গৌরচন্দ্রিকার সম্বন্ধে এইরূপ অনাদর হওয়ার অন্যতম কারণ গায়কদিগের অত্যাচার। অনেক স্থলে দেখা যায় কীর্তনওয়ালারা গৌরচন্দ্রিকার নামে এমন অযথা চেঁচামিচি জুড়িয়া দিয়াছেন যে, শ্রোতাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হয়। নিরঙ্কুশ গলাবাজি ও বিকৃত অঙ্গভঙ্গী বাদ দিলে গৌরচন্দ্রিকার কোনও ক্ষতি হয় না ; শ্রোতাদিগেরও রুচি অক্ষুণ্ণ থাকে। এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, গৌরচন্দ্রিকার পূর্বে যে 'মেল' হয়, অর্থাৎ গায়কদিগের পক্ষে সুর ভাঁজিয়া যে কণ্ঠ মিলাইবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে চেঁচামিচি সারিয়া লইলে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।

আর একটি কারণ আমার মনে হয় এই যে, বৈষ্ণব পদাবলীতে মহাপ্রভুকে যে স্থান দেওয়া হইয়াছে, অনেকে হয়ত তাহা দিতে কুণ্ঠিত হয়েন। মহাপ্রভু

স্বয়ং ভগবান্, ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, অথবা তাঁহার কোনও অবতার, অথবা একজন ভক্তশ্রেষ্ঠ, ইহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। [ব্রহ্মণ্য প্রভাবান্বিত হিন্দুসমাজ মহাপ্রভুকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিতে চিরদিনই কুণ্ঠিত।] এই খানেই বৈষ্ণব ও ব্রহ্মণ্য সমাজের মধ্যে পার্থক্য। এ পার্থক্য লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন সন্ন্যাসী অথচ প্রেমিক জগতে আর হয় নাই, পতিত জীবের জন্য এমন করিয়া অজস্র অশ্রু কেহ বিসর্জন করে নাই, এমন সকল ভুলিয়া ভগবানকে ভালবাসা আর কেহ শিখায় নাই, এমন করিয়া জীবনের পরতে পরতে কৃষ্ণবিরহ আর কেহ অনুভব করে নাই, জগতের মঙ্গলের জন্য নামপ্রেম এমন করিয়া আর কেহ যাচিয়া যাচিয়া বিলায় নাই। এই মহামহিমময় বৈশিষ্ট্য শ্রীগৌরাঙ্গকে জগতের মহাপুরুষগণের মধ্যে যে এক অতি উচ্চস্থান দিয়াছে, অবতারগণের মধ্যেও যে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। [তার পরে আমাদের শাস্ত্রে ভক্ত ও ভগবানে বিশেষ প্রভেদ করে নাই। শাস্ত্র বলেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

ভগবান্ বলিতেছেন, সাধুদিগের হৃদয় আমাতে অর্পিত; আমি সাধুদিগের হৃদয়-স্বরূপ। তাঁহারা আমাকে ভিন্ন জানেন না; আমিও মুহূর্তের জন্য তাঁহাদিগকে ভিন্ন জানি না।]

গৌরচন্দ্রিকার যে সম্যক্ আদর হয় না, তাহার আরও একটি কারণ এই যে, গৌরচন্দ্রিকা সাধারণের পক্ষে কিছু দুর্বোধ্য। যেহেতু কীর্তনের প্রথম গীত গৌরচন্দ্রিকা বলিয়া সকল গায়কই গৌরচন্দ্রিকায় আপন আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিবার জন্য উৎসুক। প্রায়শঃই গৌরচন্দ্রিকা হালকা সুরে বা চপল তালে গান করা হয় না। গৌরচন্দ্রিকার পদগুলিও যেমন ভাবগর্ভ, সাধারণের পক্ষে একটু কঠিন; ইহার তাল এবং সুরও সেইরূপ গুরুগম্ভীর।

কীর্তনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিলম্বিত তালগুলি যথা যোতসমতাল, বড় রূপক প্রভৃতি গৌরচন্দ্রিকায়ই প্রযোজ্য। রাগরাগিণীর কলা-কৌশল দেখাইবার পক্ষেও গৌরচন্দ্রিকা প্রশস্ত। কিন্তু পূর্বে স্বর মূর্চ্ছনাদি দেখাইবার ও আলাপ করিবার যে রীতি ছিল, তাহা এক্ষণে কচ্‌কচিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্বে সঙ্গীত হিসাবে কীর্তনের যে গৌরব তাহা বহু পরিমাণে গৌরচন্দ্রিকার উপর নির্ভর করিত। সুতরাং এই দিকে আমি সঙ্গীতজ্ঞগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-কীর্তনই হউক আর ধ্রুপদই হউক সাধারণের তেমন উপভোগ্য হয় না। না হউক, কিন্তু তাহা বলিয়া এই সঙ্গীতের প্রাধান্যটুকু অস্তমিত হইতে দেওয়া কোনও ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। এখনও চেষ্টা করিলে যথাযোগ্য উৎসাহদানের দ্বারা এবং স্বরলিপির সাহায্যে হয়ত কতকগুলি গীতের আভিজাত্য রক্ষা করা যাইতে পারে। আর কিছুদিন পরে হয়ত তাহা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং যদি কোনও চেষ্টা করিতে হয়, এখনই তাহা করা উচিত বলিয়া মনে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে কাব্যের দিক দিয়া গৌরচন্দ্রিকাগুলি সাধারণতঃ অতি সুললিত ভাবগর্ভ কবিতা। এরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতা বঙ্গভাষায় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাবসমৃদ্ধ কবিতাগুলি বুঝিতে কিছু বিলম্ব হয়, কিন্তু বুঝিতে পারিলে তাহা হইতে অপূর্ব রসের আস্বাদন লাভ করা যায়। সেগুলি যত নিংড়ানো যায়, ততই যেন মধু নির্গত হয়। একটি নমুনা দিতেছি—

কো কহ অপরূপ প্রেম-সুধা-নিধি
কোই কহত রসমেহ।
কোই কহত ইহ সোই কলপতরু
মঝু মনে হোয়ত সন্দেহ॥
পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম।
যাচত যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে
ঐছে রতন হরিনাম॥

যো এক সিন্ধু বিন্দু নাহি যাচত
পরবশ জলদ-সঞ্চার।
মানস অবধি রহত কল্পতরু
কো অছু করুণা অপার ॥
যছু চরিতামৃত শ্রুতি পথে সঞ্চরু
হৃদয় সরোবর পূর।
উমড়ই নয়নে অধম মরুভূমহি
হোয়ত পুলক অঙ্কুর ॥
নামহি যাক সব তাপ মিটই
তাহে কি চাঁদ উপাম।
ভন ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত
কোটী কোটী এক্ ঠাম ॥

কেহ বলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর অপূর্ব (অপরূপ) প্রেমরূপ সুধার সমুদ্র (নিধি), কেহ বলেন তিনি রসের (প্রেম, ভক্তির) মেঘস্বরূপ, কেননা অবিরল তিনি অশ্রু বাদলের সৃষ্টি করেন। আবার কেহ বলেন যে এই পৃথিবীতে (ইহ) সেই কল্পতরুই আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু আমার (মঝু) মনে সন্দেহ হয় অর্থাৎ ইহার কোনওটি মহাপ্রভুর যোগ্য তুলনার স্থল বলিয়া মনে হয় না।

আমি দেখিলাম গৌরচন্দ্র তুলনাহীন (অনুপাম)! কারণ ত্রিভুবনে যাহার মূল্য নাই এমন যে হরিনাম-রত্ন তাহা তিনি যাচিয়া (যাচত) সাধিয়া লোককে বিলাইয়া দেন। (যে রত্ন অত্যন্ত দুর্মূল্য, কেহ তাহা কখনও কাহাকেও দান করে না। কিন্তু আমার গৌরসুন্দর ত্রিভুবনে মূল্য নাই যাহার এমন রত্ন নয়নজলে বুক ভাসাইয়া কাতর ভাবে সাধিয়া সাধিয়া সকলকে বিতরণ করেন। ইঁহার তুলনা কোথায়? সেইজন্যই বলিতেছি যে 'গৌরচন্দ্র অনুপাম')।

তারপর দেখ, সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিতেছ; কিন্তু সমুদ্রের অপ্রমেয়

জলরাশি থাকাতেও কখনও কাহাকেও যাচিয়া এক বিন্দু দেয় না। তোমার কণ্ঠ শুষ্ক হউক, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাক্, সিন্ধু কখনও বলিবে কি, 'ওগো আমার অনেক জল আছে, তুমি এক বিন্দু পান করিয়া পিপাসা শান্ত কর?

মেঘের সঙ্গেও তাঁহার তুলনা হয় না, কারণ মেঘ পরবশ। যদি অনুকূল পবন প্রবাহিত হয়, তবেই মেঘ জল বর্ষণ করিয়া পৃথিবী শীতল করে; নচেৎ নহে। আর শ্রীগৌরাঙ্গ অবিরলধারে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন কোনও কিছুরই অপেক্ষা নাই। প্রেমবন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিতেছেন, কে কোথায় আছ পাপীতাপী, আকণ্ঠ ভরিয়া পান কর।

কল্পতরুর কথা বলিতেছ? কিন্তু কল্পতরুর নিকট যাহা অভীষ্ট (মানস) কর, সেই বাঞ্ছিত ফল পর্য্যন্ত (অবধি) পাওয়া যায়, তদতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন (অছু) অপার করুণাময় কে আছেন, যিনি জীবের চরম ও পরম মঙ্গলকর ফল অসাধনে, অযাচিত ভাবে দান করেন!

আবার দেখ, মেঘ যেখানে উদিত হয়, সেইখানেই বারিবর্ষণ করে কিন্তু গৌরসুন্দরের চরিতামৃত শুধু শ্রবণপথে প্রবেশ করিলেই হৃদয় সরোবর পূর্ণ হইয়া যায়। কেবল তাহাই নহে। সরোবর ছাপিয়া উঠিয়া সে প্রেমবারি নয়ন পথে হঠাৎ বাহির হয় এবং মরুভূমি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট শুষ্ক, কঠিন পাষাণবৎ যে হৃদয়, সে হৃদয়ে পুলকরূপ অঙ্কুর সঞ্চার করে। মেঘের কি সাধ্য যে সে মরুভূমিতে অঙ্কুর জন্মাইতে পারে?

বলিতে পার যে তুমিও ত গৌরাঙ্গকে চাঁদের সহিত তুলনা করিয়াছ ('গৌরচন্দ্র' অনুপাম)। কিন্তু না, আমি চাঁদের সহিত তাঁহার তুলনা করি নাই, শুনিতে ভাল শোনায় এই জন্য শুধু গৌর বা গৌরাঙ্গ না বলিয়া গৌরচন্দ্র বলিয়াছি। কেননা যাঁহার নামমাত্রে সবতাপ (দেহের, মনের, আত্মার জ্বালা)—বিদূরিত হয়, তাঁহার সহিত কি চন্দ্রের তুলনা? পদকর্তা ঘনশ্যামদাস বলিতেছেন যে কোটী কোটী চাঁদ একত্র (একুঠাম) হইলেও মহাপ্রভুর তুলনা হয় না।

কীর্তনের রস

'রস', বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি 'আনন্দ'। জড়জগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের মধ্যে দ্বিতীয়টি আমরা জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করিতে পারি। এইজন্য জিহ্বার এক নাম রসনা। কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর এই ছয়টি রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রস। আবার যাহা মনের আস্বাদ্য তাহাও রস নামে পরিচিত। [কোনও বস্তু দর্শন করিলে বা কোনও চিন্তা চিত্তে উদিত হইলে যে অনির্বচনীয় আনন্দ অন্তঃকরণে অনুভূত হয়, তাহাকেও রস বলা হয়। কাব্যপাঠে বা অভিনয়দর্শনেও এইরূপ আনন্দ মনোমধ্যে উদিত হয়। সেইজন্য [অলঙ্কার-শাস্ত্রে নয় প্রকার রসের উল্লেখ আছে: আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। বাৎসল্যরস গণনা করিলে রসের সংখ্যা হয় দশ। বৈষ্ণবদের মতে সাহিত্যের নয়টি রস গৌণ। মুখ্যরস পাঁচটি যথা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।] এখানেও রসের অর্থ—যাহা আস্বাদ্য, কিন্তু এ আস্বাদন প্রাকৃত বস্তুর নহে, ইহা পারমার্থিক আস্বাদন। কারণ এই অনিত্য সংসারে একমাত্র আস্বাদ্য বা উপভোগের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ।

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।

—চৈতন্যচরিতামৃত।

কীর্তনে এই রসের বিন্যাসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপভোগকেই বাস্তব রূপ দান করা হইয়াছে। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর প্রভৃতি রসের মধ্য দিয়াই ভগবান আস্বাদ্য ইহাই বৈষ্ণব সাধকদিগের অভিপ্রায়। এই রসবিভাগ অনুসারে ভক্তও ভিন্ন ভিন্ন রসের অধিকারীরূপে বিভক্ত; কেহ শান্ত, কেহ সখ্য, কেহ বা মধুর রসের অধিকারী। [শান্তরস ভগবদ্‌ভক্তজনের মনের সাধারণ স্থায়িভাব। সংসারের অনিত্যতা এবং ইহার

চিরচঞ্চল সুখদুঃখরূপ ছায়াবাজির স্বরূপ যতই অন্তঃকরণে উপলব্ধি হইবে, ততই চিত্ত প্রশান্ত স্থির অপ্রমত্ত হইয়া উঠিবে। সুতরাং এই বৈরাগ্যমিশ্রিত মনোভাব সমস্ত ভক্তচিত্তের স্বাভাবিক ভিত্তি, এইজন্য বৈষ্ণবেরা শান্তরসকে রসগণনায় শ্রেষ্ঠ স্থান দেন না। ইঁহাদের মতে চারিটি রস প্রধান—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥

... ...

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবে চতুর্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাবে সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ-আস্বাদনে।

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি।

এইসকল রসের মধ্যে আবার আদি বা শৃঙ্গার অর্থাৎ মধুর রসই অধিক আস্বাদ্য। সেজন্য মধুর রসের গানই কীর্তনে অধিক।

ভগবানকে ভজনা করিবার যে চারি প্রকার রীতি (রস) কথিত হইল, তাহার মধ্যে মধুর রসের ভক্তই সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে সকলেই মধুর রসের ভক্ত, তাহা হইলে ভুল হইবে। এমন বহু লোক দেখিয়াছি যাঁহারা মধুর রসের পদাবলী শ্রবণ করেন না। অর্থাৎ অভিসার কলহান্তরিতা, মাথুর প্রভৃতি পালার গান হইলে তাঁহারা সে-স্থান ত্যাগ করেন। এমন অনেক ভক্ত আছেন যাঁহারা কেবল দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা তাঁহারা শুনেন না। দাস্য ও সখ্য রসের ভজন অন্যান্য ধর্মেও দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবানকে প্রভু বা বন্ধু বলিয়া মনে করা সকল ধর্মেই চলে। কিন্তু বৈষ্ণবদের বাৎসল্য রসের তুলনা বোধ হয় বিরল। ভগবানকে সন্তান বলিয়া স্নেহ

করা, সেইভাবে তাঁহার সেবা করা অন্যত্র প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বাৎসল্য রসের সেবক যাঁহারা, তাঁহারা নন্দ-যশোমতীর অভিমানে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণকে প্রতিপাল্য জ্ঞানে আদর করেন। এই বাৎসল্য রসের গান গোষ্ঠলীলা, উত্তরগোষ্ঠ প্রভৃতি পালায় শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবানের প্রতি অপত্যবুদ্ধির দৃষ্টান্ত অন্যত্র একান্ত বিরল। ভগবানকে পিতা বা মাতা বা বন্ধু-ভাবে ভজনা করিবার দৃষ্টান্ত অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পতিভাবে ভজনা করিবার পদ্ধতিও অজ্ঞাত নহে St. Catherine of Theresa এবং Carmelite Nunsদের মধ্য যীশু খ্রীস্টকে পতিভাবে উপাসনা করিবার প্রণালী দেখা যায়। ইহাঁরা Brides of Christ বা খ্রীস্টের পাত্রী বলিয়া পরিচিত। কার্মেলাইট সন্ন্যাসিনীরা এতদূর মধুর ভাবাবিষ্ট যে তাঁহারা অন্য পুরুষের মুখাবলোকন পর্যন্ত করেন না। তাঁহারা যে-মঠে থাকেন সে-মঠে কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। যদি কখনও রাজমিস্ত্রী বা অন্য মজুরদের প্রবেশ আবশ্যক হয়, তখন তাহাদের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হয় অথবা মঠাধিকারিণীদের পূর্বে সংবাদ দেওয়া হয় যাহাতে তাঁহারা নির্জন স্থানে অপেক্ষা করিতে পারেন। দূর হইতে মাত্র এই মঠ দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছে।

কিন্তু বৈষ্ণবদের বাৎসল্য রসটি অতি অপূর্ব। এই রসের এবং অন্যান্য রসের বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বার্থের কোনও সন্ধান ইহার মধ্যে নাই। সাংসারিক হিসাবে পুত্রের প্রতি মাতৃস্নেহের মধ্যে যতই আত্মবিস্মৃতি থাকুক, ইহা একেবারে বিশুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানের প্রতি নন্দ-যশোদার যে অপত্যস্নেহ, উহা একান্তভাবে বিশুদ্ধ অর্থাৎ কিছুমাত্র স্বার্থের সন্ধান উহাতে ছিল না। আমার যাহা হয় হউক, পুত্র আমার যেন কিছুমাত্র কষ্ট না পায়—এইরূপভাবে ভগবৎসেবা বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসের উপজীব্য।

রসের আভাসমাত্র বর্তমান অথচ যেখানে প্রকৃত রসের অভাব তাহাকে রসাভাস বলে। রসাভাস বা রসদুষ্ট বা অনুচিত রস কীর্তনে অত্যন্ত

দোষাবহ। কীর্তনিয়াকে অতি সন্তর্পনের সহিত এই রসাভাস-দোষ পরিহার করিতে হয়। মনে করুন, কীর্তনিয়া মধুর বা আদিরসের গান করিতেছেন, এমন সময়ে যদি তিনি পরকালের কথা উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে সে গান অত্যন্ত শ্রুতিকটু হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন রূপ-গুণ-যৌবনশালিনী গোপবালারা যমুনাতীরে পারে যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তখন যদি গায়ক নাবিকরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া বলান যে তিনি ভবপারের কর্ণধার, জীবকে ভবপারে লইয়া যাইবার জন্য অনাদি কাল হইতে তিনি খেয়া দিতেছেন, তাহা হইলে সেখানে রসাভাস-দোষ বা রসভঙ্গ হইল বলিতে হইবে। মনে করুন, বাসরঘরে বরকে ঘেরিয়া কুটুম্বিনীর দল আনন্দোল্লাসে মগ্ন, বরকে গান গায়িবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে, তখন বর যদি গান ধরেন,

বাঁশের দোলাতে চড়ে কে হে বটে
যাচ্ছ তুমি শ্মশানঘাটে।

তাহা হইলে তাহা যেমন শ্রুতিকটু হয়, কীর্তনে রসাভাস অনেক সময়ে তেমনি রসপুষ্টির বিরোধী হইয়া পড়ে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে রস এক অপূর্ব সৃষ্টি। উহার বিভাব, অনুভাব সঞ্চারিভাব আদি ৺ম অনুশীলন না করিলে কীর্তন সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। মহাজন-পদাবলী সুরলয় সংযোগ শ্রুতিমধুররূপে পরিবেশন করিলে, তাহাকেই উচ্চাঙ্গের কীর্তন বলে। মহাজনপদাবলী মধ্যে প্রধান রস শৃঙ্গাররস। সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্য রসের বহু পদ থাকিলেও গানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতেছে পদাবলীর আদিরস। অর্থাৎ অধিকাংশ পদাবলী প্রেমকবিতা। এই প্রেমকবিতা রাধাকৃষ্ণ ও তাঁহাদের সখীবৃন্দকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। সুতরাং প্রত্যেকটি পদের ভিতরে একটি আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত আছে—অর্থাৎ প্রত্যেক পদের রসের প্রবাহ চলিয়াছে সেই অনন্ত সাগর-পানে যেখানে সকল হৃদয়বৃত্তি বাঞ্ছিতকে পাইয়া চরমচরিতার্থতা লাভ করে। কিন্তু কীর্তনের

সর্বপ্রধান সতর্কতা আবশ্যক হয় এইখানে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনায় যথাসম্ভব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বর্জন করিয়া গান করিতে না পারিলে কাব্যের মাধুর্য এবং গীতের সার্থকতা উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। এখানেই বৈষ্ণব-কবি এবং বৈষ্ণব-গায়কের চরম পরীক্ষা। বৈষ্ণব-কবি পরমার্থতত্ত্ব বলিবেন প্রেমের মধ্য দিয়া, স্নেহের মধ্য দিয়া, আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া। কিন্তু তিনি কাব্যের রসমাধুর্য নষ্ট করিতে চাহেন না। কাব্যহিসাবে, রসপরিবেশন হিসাবে তাঁহার কাব্য উপভোগ্য হইবে, অথচ তাহার মধ্যে থাকিবে প্রিয়তমের সান্নিধ্যলাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। এই যে সর্বপ্রকার বাধাহীন সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রেম, শ্রীজীব-গোস্বামী ইহাকে মুক্তি অপেক্ষাও সুদুর্লভ বলিয়াছেন। এই অপ্রাকৃত প্রেমের গীত কীর্তন, অথচ কীর্তন-গায়ক যদি সে কথা স্পষ্টভাষার প্রকাশ করেন, তবেই তাঁহার কীর্তন ব্যর্থ হইল। সহজ প্রেমকেই আখরের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; কবি যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন, তাহারই সৌন্দর্য ও মাধুর্য কীর্তনিয়া পরিবেশন করিবেন তাঁহার শিল্পশৈলীর দ্বারা। তত্ত্ব ও লীলার সঙ্গে যে নিগূঢ় রহস্যময় সম্বন্ধ আছে, কথকতায় বা ভাগবত-ব্যাখ্যায় বক্তা তাহা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কীর্তনিয়া লীলার চমৎকারিত্ব বর্ণনা করিবেন, তত্ত্বকথার দ্বারা তাহাকে রূপকমাত্র পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন না। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে—

সই কেবা শুনাইলে শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

এই গানে নামের মাহাত্ম্য বা প্রতাপ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই মধুর পদটি গান করিতে গিয়া যদি কেহ শ্যামনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করিবার উপদেশ দেন, তবে তাঁহার গান অশ্রাব্য হইবে তাহার কারণ ঐ গানটির কবিত্বই সর্বাগ্রে উপভোগ্য, উহার মধ্যে যে

কবিত্বপূর্ণ প্রেমতন্ময়তা আছে তাহাই পরম আস্বাদ্য, তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিবার অধিকার কীর্তনিয়ার নাই।

রসাভাস-দোষ অতি অন্তর্পণে পরিহার করিতে হয় বলিয়াছি। তাহার কারণ এই যে কীর্তনগানটি যেমন রচিত হইয়াছে, তেমনি গান করিলেই হয় না। অন্য সংগীতের সঙ্গে কীর্তনের একটি মুখ্য বৈলক্ষণ্য এই যে, এই গানে গায়ক ইচ্ছামত অলঙ্কার বা আখর (অক্ষর) যোজনা করিতে পারেন। গানের অর্থ বিশদ করিবার জন্য, অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য, রচয়িতার গূঢ় মনোভাবকে সুরের বেদনায় প্রকাশ করিবার জন্য আখর দেওয়া হয়। গায়ক নিজে যাহা যোজনা করেন, তাহাই আখর। কোনও কোনও সময় সুরের পোষকতায় আখরের স্থলে পদের অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তিও করা হয়—অর্থাৎ গায়ক নিজের কথা না জুড়িয়া পদকর্তার ভাষাই হুবহু ব্যবহার করেন—তাহাকেও 'আখর' বলা হয়। কিন্তু আখর অর্থে প্রধানতঃ গায়কের স্বকীয় যোজনা। অনেক সময়ে এইসকল আখর পূর্ববর্তী গায়কেরা যাহা রচনা করিয়া গিয়াছেন, বর্তমান গায়ক তাহারই আবৃত্তি করেন। আবার অনেক সময়ে গায়ক নিজ উদ্‌ভাবনী শক্তির সাহায্যে ভাব-পোষক কথা সংযোজিত করেন। গায়কের কবিত্বশক্তি ও সুরতালের নৈপুণ্য থাকিলে এই সকল আখর অনেক সময়ে তত্তৎ পদাবলী অপেক্ষাও শ্রুতিমধুর হয়। কিন্তু এইখানেই বিপদ! অনেক অল্পশক্তিসম্পন্ন লোক আখর-যোজনার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া এমন কথা হয়তো বলিয়া ফেলেন, যাহা রসপরিপোষক তো নয়ই, বরং তাহার বিরোধী। সে সকল স্থলে রসিকসমাজ অত্যন্ত মর্মাহত হন। এই জন্যই আখর দিবার প্রলোভন সংযত না করিলে কীর্তনগান পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতে পারে। কারণ রসিক ভক্তগণ এরূপ রসাভাসদোষ সহ্য করেন না।

কীর্তনের এক-একটি পালা একটি খণ্ডকাব্য। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কোনও একটি লীলা কয়েকটি মহাজনপদাবলীর সাহায্যে জীবন্তভাবে চিত্রিত করাই

কীর্তনের উদ্দেশ্য। পূর্বেই এইসকল পালার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কি ভাবে এই পালাগান নিষ্পন্ন হয়, তাহা বলা হয় নাই বলিতেছি। সাধারণতঃ কীর্তনগায়ক বিভিন্ন পদকর্তার ভিন্ন ভিন্ন পদ বাছিয়া তাহাই পালার আকারে সাজাইয়া লন। বস্তুতঃ যাত্রার পালা যেমন নির্দিষ্ট গান ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া নির্বাহিত হয়, কীর্তনের পালা সেরূপ নহে। মনে করুন অনুরাগের এক পালা গান হইবে ; গায়ক ইচ্ছামত একটি 'তদুচিত' গৌরচন্দ্রিকা বাছিয়া লইলেন—

কি খণে দেখিলাম গোরা নবীন কামেরি কোঁড়া
সেই হইতে রইতে নারি ঘরে। ইত্যাদি।
লক্ষ্মীকান্ত দাস।

তার পরে তিনি গায়িতে পারেন—

বেলি অবসানকালে একা গিয়াছিলাম জলে। ইত্যাদি।
—বসু রামানন্দ।

অথবা—

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লেগেছে গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া। —জ্ঞানদাস।

অথবা—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ। —গোবিন্দ দাস।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, গায়ক মহাজনপদাবলী হইতে বিভিন্ন পদ-কর্তার পদ লইয়া নিজের ইচ্ছামত পালা সাজাইয়া থাকেন। এইরূপ সাজাইতে গিয়া কিন্তু পৌর্বাপর্য রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন পদকর্তার পদ এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে রসটি ক্রমেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়।

এই লীলাকীর্তন রসকীর্তন নামে অভিহিত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, রস

অর্থে যাহা আস্বাদন করা যায় অর্থাৎ যাহা চিন্তা করিলে বা শুনিলে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়, তাহার নাম রস। আনন্দময় ভগবানের লীলাও আনন্দের সৃষ্টি করে, এই জন্যই লীলাকীর্তনের অপর নাম রসকীর্তন। বলা বাহুল্য এ দিক দিয়াও রসকীর্তনে শৃঙ্গার রসই প্রধান স্থান অধিকার করে। কারণ প্রেম বা শৃঙ্গার রসেই আনন্দ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

কীর্তনে ৬৪ রস আছে। প্রথমতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রে শৃঙ্গাররস দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যথা বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। অতিশয় অনুরক্ত যুবক-যুবতীর অসমাগম-নিমিত্ত রতি যখন উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারে না, তখন সেই ভাবকে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পর মিলনে যে উল্লাসময় ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হয় তাহার নাম 'সম্ভোগ'। বিপ্রলম্ভ আবার চারি প্রকার, যথা—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। ইহাদের প্রত্যেকটি আবার আট ভাগে বিভক্ত। যথা—পূর্বরাগের অন্তর্গত আটটি রস—সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, বন্দী বা ভাটমুখে গুণশ্রবণ, দূতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখে শ্রবণ, গুণিজনের গানে শ্রবণ, বংশীধ্বনি শ্রবণ।

মানের অন্তর্গত আটটি রস—সখীমুখে শ্রবণ, শুকমুখে শ্রবণ, মুরলীধ্বনি শ্রবণ, প্রতিপক্ষের দেহে ভোগচিহ্ন দর্শন, প্রিয়তমের অঙ্গে ভোগচিহ্ন দর্শন, গোত্রস্খলন, স্বপ্নে দর্শন, অন্য নায়িকার সঙ্গ দর্শন।

প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত আটটি রস, যথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজপ্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি, দূতীর প্রতি, মুরলীর প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি এবং গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

প্রবাসের অন্তর্গত আটটি রস, যথা—ভাবী (বিরহ), মথুরাগমন, দ্বারকা-গমন, কালীয়দমন (অদর্শনে বিরহ), গোচারণজনিত বিরহ, নন্দমোক্ষণ, কার্যানুরোধে প্রবাস, রাসে অন্তর্ধান।

বিপ্রলম্ভের ন্যায় সম্ভোগেরও চারিটি বিভাগ আছে, যথা—সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সংকীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ এবং সমৃদ্ধি মান সম্ভোগ। সংক্ষিপ্ত

সম্ভোগের অন্তর্গত আটটি রসের নাম—বাল্যাবস্থায় মিলন, গোষ্ঠে গমন, গোদোহন, অকস্মাৎ চুম্বন, হস্তাকর্ষণ, বস্ত্রাকর্ষণ, পথরোধ, রতিভোগ।

সংকীর্ণ সম্ভোগে মহারাস, জলক্রীড়া, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশীচুরি, নৌকাবিলাস, মধুপান, সূর্যপূজা এই আটটি বিভাগ আছে।

সম্পন্ন সম্ভোগের বিভাগ যথা—সুদূর দর্শন, ঝুলন, হোলি, প্রহেলিকা, পাশাখেলা, নর্তকরাস, রসালস, কপটনিদ্রা।

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে—স্বপ্নে বিলাস, কুরুক্ষেত্র মিলন, ভাবোল্লাস, ব্রজাগমন, বিপরীত সম্ভোগ, ভোজনকৌতুক, একত্র নিদ্রা, স্বাধীনভর্তৃকা।

পূর্বে যে সকল লীলার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই চতুঃষষ্টি রসের অল্লাধিক বিস্তার আছে। কীর্তনগায়ককে সেইজন্য সাবধানতার সহিত গান করিতে হয়। কীর্তনিয়া শুধু সংগীতজ্ঞ হইলেই হয় না, তাঁহাকে পণ্ডিতও হইতে হয়। সকল কীর্তনিয়াই যে পণ্ডিত একথা বলিতেছি না। তবে পণ্ডিত হইলে ভাল হয়। পূর্বে এরূপ বহু কীর্তনগায়কের নাম শুনা যায় যাঁহারা পণ্ডিত ছিলেন। এই সেদিনও অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজি, রায় বাহাদুর রসময় মিত্র এম. এ কীর্তনগানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। রস-জ্ঞান না থকিলে অভিজ্ঞ শ্রোতার নিকটে গায়ককে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হয়। রস-জ্ঞানের অভাব থাকিলে রসাভাস হয় এবং রসাভাসবিশিষ্ট গানে রসিক শ্রোতার মনস্তুষ্টি হয় না। যেখানে যে রসের পরিবেশন করিতে হইবে তাহা না করিয়া অন্য রস বা বিরুদ্ধ রস পরিবেশন করিলে তাহা শ্রুতিকটু হয়। সূক্ষ্ম রসবিচারে নিপুণতার সহিত সুরলয়ের সঙ্গতি থাকিলে তবেই কীর্তন শ্রুতিসুখকর হয়। আনন্দ সকল সংগীতের উপদান হইলেও, কীর্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে, গায়ক এবং শ্রোতা উভয়কেই রসজ্ঞ হইতে হয় অর্থাৎ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল সূত্রের সহিত সুপরিচয় থাকা আবশ্যক।।

— তৃতীয় শাখা —

বৈষ্ণব কবিতা

বৈষ্ণব কবিতা বুঝবার চেষ্টা এযুগে সব সময়ে সফল হতে পারে না। আমিও যে ঠিক বোঝাতে পারবো এবিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আজকালকার দিনে প্রকৃত বৈষ্ণব কবিতার সৃষ্টি হয় না। যে যুগে বৈষ্ণব কবিতার সৃষ্টি হয়েছিল সে ছিল অন্য একটা যুগ। বৈষ্ণব কবিতা বুঝতে হলে সে যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন ছিল তা বুঝতে হবে। যেমন বর্ত্তমানযুগে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে তাঁর আবেষ্টনী বুঝতে হবে। নবীন সেনকে বুঝতে হলে মহাভারতকে বুঝতে হবে। Back-ground বোঝা আগে দরকার ; তা না হলে কোন জিনিষই ভাল করে বোঝা যায় না। মাইকেলকে বুঝতে হলে আমাদের বোঝা দরকার ভার্জ্জিল, দান্তে, মিলটনকে। বিশেষ কোন কাব্য বুঝতে গেলেই তার পটভূমি (Back-ground) বোঝা একান্ত প্রয়োজন। এযুগে বৈষ্ণব কবিতা বুঝবার পক্ষে অনেক বাধা আছে। কারণ আমরা সেযুগ ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি। বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় বৈষ্ণব কবিগণ কেবল একই বিষয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁরা কেন এ লিখলেন? আর কি কোন বিষয় লিখবার ছিল না? বিদ্যাপতি পুরুষ-পরীক্ষা প্রভৃতি অনেক বই লিখেছিলেন। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিগণ ক্রমাগত রাধাকৃষ্ণ নিয়ে নয়ত গৌরাঙ্গলীলা নিয়ে ছোট ছোট কবিতা লিখেছেন—কেন তাঁরা এই খণ্ড কবিতা লিখলেন—আরও বড় কিছু কি তাঁরা করতে পারতেন না? ভাববার বিষয় বটে।

যাঁরা বৈষ্ণব কবিতাকে কিছু-না বলে মনে করেন, তাঁদের জন্য আমার বক্তব্য নয়। যাঁরা বৈষ্ণব কবিতাকে ভাল ও সুপাঠ্য বলে বিবেচনা করেন তাঁদের উদ্দেশ্যেই আমি দুচারটা কথা বলবো।

[অনেকে রাধাকৃষ্ণলীলাকে রূপক বলে মনে করেন।] উপনিষদে যেমন আছে দুটি পক্ষী একবৃক্ষে বসে, একটি ফল আস্বাদন করে আর একটি নিরীক্ষণ করে—সেইরূপ রাধাকৃষ্ণলীলা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন বই আর কিছু নয়। [বৈষ্ণব কবিতা সত্যি কি রূপক?] যদি রূপক হ'তো তা-হলে রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে এত কবিতা রচিত হতে পারতো না। কী পরিমাণ দরদ, কী পরিমাণ আগ্রহ দিয়ে এই সব কবিতা দিনের পর দিন লিখে কবিরা কৃতকৃতার্থ হয়েছেন! বৈষ্ণব কবিতা বুঝবার পক্ষে এই যে বাধা এটা সত্যিকার বাধা। [যদি বৈষ্ণব কবিতাকে রূপক বলেই মনে করি তা হলেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতা বলতে কি বুঝেছেন, তা আমরা বুঝতে পারি। তিনি বলেছেন :—

"এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই,
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।]

এরকমভাবে বৈষ্ণব কবিতার উপরের ভাবটি গ্রহণ করা যেতে পারে। কি ভিতরে যেতে পারা যায় না। ভিতরের নিগূঢ় বিষয় বুঝতে গেলে বৈষ্ণব কবিতার মানস সরোবরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ব্যতীত উপায় নেই।

বালিগঞ্জ লেক্ এর উদাহরণে কথাটা হয়ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে এখানে গিয়ে থাকেন—কেহ যান দৃশ্য দেখবার জন্য—কেহ যান স্বাস্থ্যের জন্য—আর তরুণেরা কেহ কেহ সন্তরণ—আত্মহত্যা—ইত্যাদি অনেক কারণে গিয়ে থাকেন। বৈষ্ণব কবিতার বিষয়েও ঠিক এই ভাব। ভক্ত রসিক একভাবে একে গ্রহণ করেন

-সাধারণ পাঠক গ্রহণ করেন অন্যভাবে। ভক্তগণ কেমন ভাবে বৈষ্ণব ;বিতা গ্রহণ করেন তা বুঝবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সাধারণ াাঠকেরা মনে করেন বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে যখন রস রয়েছে, শৃঙ্গার ায়েছে, তখন মন্দই বা কি ? এ সময় একজনের কথা আমার মনে পড়ছে -চ্যাপম্যান সাহেব সুরেন্দ্র নাথ কুমারের সাহায্যে Vaisnav Lyrics ংগ্রহ করেছিলেন : তার ভূমিকায় লিখেছেন—

"Oh Radha! I.wish to have you as my wife."

কবি কি উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেছেন তা না বুঝলে বৈষ্ণব কবিতা বোঝা ায় না।

[তুলসীদাসের রামায়ণ পড়লে বোঝা যায় তাঁর রামচরিত্র বাল্মীকির রামের চয়ে সুন্দর। বাল্মীকির রামায়ণের কঠোর রামচরিত্র তুলসীদাসের হাতে মারও সরস ও সুন্দর হয়ে উঠেছে।] তুলসীদাসের রামচরিতমানস বাস্তবিকই কবিতার মানসসরোবর। রসিক মরালগণ এই সরোবরে সুখে ভ্রমণ করতে পারেন। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা প্রাণ গলিয়ে লেখা। তুলসীদাসের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে উহা সৌখীন পাঠকের জন্য নয়। তুলসীদাসের এই রামচরিত মানসের দ্বারা অন্ততঃ নয়কোটি লোকের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তৃপ্ত হচ্ছে। শুধু কবিতার সৌন্দর্য্য দেখে নয়—আনন্দের খোরাক তারা পায় সেখান থেকে।

বৈষ্ণব কবিতা ঠিক এই ভাবে গ্রহণ করতে হবে। বৈষ্ণব কবিতাকে লীলার দিক থেকে দেখতে হবে—রূপকের দিক্ থেকে দেখলে চলবে না।] রূপকের দিক দিয়ে দেখলে interpretation হবে সত্যি, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠ্তে পারা যাবে না।

লীলা সম্পর্কে দু' একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। দার্শনিক ভাবে লীলার আলোচনার প্রয়োজন নেই। বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্য্যে তর্ক আপনি নিরস্ত হয়ে যায়—ধার-করা বিদ্যা দিয়ে তা বুঝতে হয় না। কোন লিলিকে রঙ্

ফলাতে হয় না। কোন্ রঙে রঞ্জিত করে যদি বৈষ্ণব কবিতা বুঝতে হয় তবে তার কোন মূল্যই থাকে না। There is no need to paint the lily. বৈষ্ণব কবিতা নিজের দ্বারাই ব্যক্ত। এ বুঝতে শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। এ বুঝতে গিয়ে অনেকে বেদান্তের মায়াবাদ টেনে আনেন। বৈষ্ণবেরা মায়াবাদকে উপেক্ষা করেছেন। লীলার অর্থ লীলা, যা আপনি মধুর।

লীলা বুঝতে হলে বৈষ্ণবদের সহজ সরল তত্ত্বটি মনে রাখতে হয়। তাঁহাদের মত :—

"শ্যামমেব বরং রূপম্
পুরী মাধুপুরী বরা
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং।
আদ্য এব পরোরসঃ।"

বৈষ্ণব কবিতায় বেদান্তের তত্ত্বও নিহিত রয়েছে—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা"।

কিন্তু তাঁরা কবির ভাষায় মাধুর্য্যের সঙ্গে সে কথাটি ব্যক্ত করেছেন—

"যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি,
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যামে।"

কিন্তু এমনতর ভাববার প্রয়োজন নাই যে, বেদান্ত উপনিষদের দুরূহ তত্ত্বেরই উপর বৈষ্ণব কবিতা প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব কবিতায় কবি সরস সহজ সুকোমল ভাষায় এ সব ভাব প্রকাশ করেছেন।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্ বিভাতি।"

এই কথাটি বৈষ্ণব কবিতায় আছে :

"তোমারই গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমারি রূপে।"—জ্ঞান দাস

বৈষ্ণব কবিতায় যে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে—তাতে সবিশেষ ভগবানের কথাই বলা হয়েছে—

বদন্তি যৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

বৈষ্ণব কবিতায় ব্রহ্মও নয় পরমাত্মাও নয় ভগবানকেই গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁকে আমরা কি ভাবে ভাবি?—অনেকে ভাবেন তাঁর রূপ-গুণের অন্ত নেই। লীলায় প্রবেশ করতে হলে এই ধারণা দরকার।

"শ্যামমেব বরং রূপম্‌"—শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ। বিবাদ বাধে এই শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ নিয়ে। শ্যামরূপ শ্রেষ্ঠ কেন?—অন্য রূপেরও তো ধ্যান করতে পারি?

কিন্তু বৈষ্ণব বলেন—শ্যামরূপের মত রূপ নাই—যদি ধামের কথা ভাবতে হয় তবে বৃন্দাবনই সেই ধাম। যে বৃন্দাবনে প্রতি ধেনু কামধেনু—প্রতি লতা কল্পলতা—প্রতি বৃক্ষ কল্পবৃক্ষ—সেই চিন্তামণি-ধাম বৃন্দাবনই ভগবানের ধাম। কিশোর বয়সই সুন্দর, এ বয়স বড় চমৎকার। এতে কেবল তরুণিমার লাবণ্যময় আভাস—এতে কোন রকম পাপ বা কলুষ নেই।

রসের মধ্যে আদিরসই প্রধান। শৃঙ্গার রস মধুর ও উজ্জ্বল। অন্য অনেক রস আছে তার মধ্যে আদি রস শ্রেষ্ঠ। আদিরস (রতি বা প্রেম) ইংরাজীতে Love। পিরীতি বা পিরীত কথাটা আমাদের মধ্যে আজকাল আর চলে না। ভালবাসার পুরাণো নাম রতি, প্রেম, প্রীতি, ভাব। ভালবাসা কথাটি আমাদের ভাষায় নূতন আমদানী। "ভালবাসা" দুটো কথা থেকে হয়েছে: ভাল ও বাসা; পূর্ব্ববঙ্গে এখনও বাসা কথাটি প্রচলিত; যেমন—তিনি কেমন বাসেন?

প্রেমটাও আজকাল জোড়াতাড়া দেওয়া জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালবাসার মধ্যে খাঁটি প্রেম বা প্রীতি নেই। জোড়াতাড়া দেওয়া জিনিষ সহজেই ভেঙ্গে যেতে পারে। তাই এই ভালবাসা দিয়ে বৈষ্ণব-প্রেম বুঝতে

পারা যায় না। ভালবাসার নিখুঁত রূপটি মহাপ্রভুর পূর্ব্বে ধরা পড়েনি কিন্তু মহাপ্রভুই প্রেমের মন্ত্র প্রচার করেছেন সেইজন্য তিনি

করুণা সিন্ধু অবতার।
নিজগুণে গাঁথি নাম চিন্তামণি
জগতে পরাওল হার।

গোবিন্দদাস এই ভাবে মহাপ্রভুর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই হচ্ছে মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি ছিলেন প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি; এযুগে মহাপ্রভুর চরিত্র আমরা বুঝতে পারবো না। তখন এমন যুগ ছিল যে যুগে দেশ মেতে উঠেছে—পাষণ্ড, নাস্তিক, ভণ্ড, পণ্ডিত রসে মেতে উঠেছেন —সমস্ত দেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সকলেই চৈতন্যকে দেখবার জন্য পাগল। এই প্রেমের কথা চারিদিকে প্রচারিত হতে লাগল। লোক সমাজকে জাগিয়ে দিল—মহাপ্রভুর জন্যই প্রেমের প্রচার সম্ভব হলো। তিনি এই প্রেম-প্রচারের ভার গ্রহণ না করলে কেউ গ্রহণ করতো কিনা সন্দেহ। একবার যখন এই বার্ত্তা প্রচারিত হলো তখন সকলে উঠে পড়ে লাগলেন। রাধাকৃষ্ণ-লীলা ধ্যান করতে লাগলেন। মনের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা থাকে না। জানে না কি করছে—কোথায় যাচ্ছে নিজের দিকে নজর নাই। কেবল সব সময়ে কৃষ্ণ-কথা

স্মর্ত্তব্যো সততং বিষ্ণুরস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।

জন সমাজ সাগ্রহে এই প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পড়ল। তাই বৈষ্ণব কবিতাকে বুঝতে গেলে মহাপ্রভুকে বোঝা দরকার। কি অদ্ভুত প্রেরণায় এই বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তা জানতে হলে মহাপ্রভুর পরিচয় জানা একান্ত প্রয়োজন। পদাবলীর প্রসার ও আদর হয় এই মহাপ্রভুর পর থেকেই। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কবিতা যদি মহাপ্রভু প্রচার না করতেন তবে ঐ সকল কবিতা প্রচার হতো কিনা সন্দেহ। প্রেম এমন জিনিষ যে তা

সকলকে তাদের অজ্ঞাতসারে চালিত করে। এর জন্যই আমাদের মন বৈষ্ণব কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণব কবিতা কেবল কবিতা নয়—এগুলো গান করবার জন্য রচিত হয়েছিল। তা না হলে এত ছোট হবে কেন? তা ছাড়া সে সময়ে সুর তাল বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হলো; কোন সময়ে কি ভাবে গান করিতে হবে সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার! আমার ধারণা চারিদিক্ থেকে চেষ্টার ফলেই এমন ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। আপামর সাধারণকে বোঝাবার জন্য এসব হয়েছে। এতে তাদের সহানুভূতি সমবেদনা ছিল সন্দেহ নেই। তা-না হলে মুসলমান রাজত্বেও এই culture গড়ে উঠ্‌লো এবং টিকে থাকলো কি করে? মহাপ্রভুর যুগ বাংলার খুব উজ্জ্বল যুগ। এই সময়ে দেশে অনেক মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অসাধারণ পণ্ডিতের তখন আবির্ভাব হয়েছিল। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, নৈয়ায়িক রঘুনাথ, বাসুদেব সার্বভৌম তখন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বিরাজ করছেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এমন ভাবে হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম কানুন বেঁধে দিলেন যে আজ পর্য্যন্তও সেই ধারা মেনে চলতে হয়। যখন কাজকর্ম কিছু করতে হয় তখন তাঁর স্মৃতি ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক অন্ধকার যুগে যে বৈষ্ণবদের প্রেমধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছিল তা নয়। এঁদের একজনও যদি কোনও যুগে জন্মগ্রহণ করতেন তবে সেই যুগ ধন্য হয়ে যেতো। মহাপ্রভু পৃথিবীতে এমন একটি Dynamic force নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যার তুলনা হয় না। কেননা বাঙ্গলা দেশে সে সময় এমন একটি ভক্তির বন্যা বয়ে গিয়েছিল যে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত ভেসে গেল। আমরা এখন সে যুগের কল্পনাও করতে পারি না। বৈষ্ণব কাব্য বুঝতে গেলে মহাপ্রভুর জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। তিনি কেমন করে ভগবৎ প্রেমকে সাধারণের মধ্যে সহজবোধ্য করেছিলেন তাই বুঝতে হয়। প্রেম কাকে বলে? প্রেম অর্থে প্রিয়ের জন্য পরম ব্যাকুলতা।

যদি ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করতে হয় তবে এই প্রেম ছাড়া

উপায় নাই। মহাপ্রভুর পূর্বে এই প্রেমের কথা কেউ এমন করে বলেন নি।

[বৈষ্ণব কবিগণ মহাপ্রভুকে কি ভাবে গ্রহণ করেছেন তাই দেখতে হবে—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু সুরধুনী তীর উজোর॥

এটা বোঝাতে গিয়ে ভাষার আলোচনা করবো না। এ এমন জিনিষ যে অনেক কথা না বোঝালে বোঝা যাবে। মহাপ্রভুর চক্ষু দুটি অবিরল বারি বর্ষণ করছে। অবিরল বারিপাত হলে বৃক্ষে বৃক্ষে মুকুলের উদ্‌গম হয়, তেমনি গৌরাঙ্গের কাঁচা সোণার মত দেহে মুকুলের (রোমাঞ্চ) উদ্‌গম হয়েছে।......

অঙ্গের স্বেদজল মকরন্দের মত বিন্দু বিন্দু ঝরছে; তাতে ভাবরূপ কদম্ব ফুল ফুটেছে। কদম্ব ফুল ফোটার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য ফুল এমন ডগমগভাবে ফোটে না। কদম্ব অর্থ এখানে সমূহ হতে পারে। ভাব বলতে কেহ কেহ অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব বলতে পারেন কিন্তু তা নয়—কেন না অষ্ট সাত্ত্বিকের মধ্যে অন্ততঃ তিনটির (অশ্রু, পুলক, ঘর্ম্ম,) উল্লেখ করে, আবার তার কথা বললে পুনরুক্তি দোষ হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌরবর্ণ বলে তাঁকে সোণার গাছ বলা হয়েছে। সুরধুনীর তীর উজ্জ্বল করে' একটি সোণার গাছ চলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সোণার গাছ কি কখনও চলে বেড়ায়? তাই বলেছেন অভিনব, নূতন, আর কখনও এরূপ দেখা যায় নি। ভক্ত সোণার গাছ বলে' তৃপ্ত হতে পারলেন না, তাই বলেছেন সোণার কল্পবৃক্ষ চলে বেড়াচ্ছে।]

'কল্পতরু' অর্থে যা অভীষ্ট দান করে। মহাপ্রভু কি আমাদের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করেন ? তা ত নয়, তিনি আমাদের পক্ষে যা পরম হিতকর তাই দান করেন যেচে যেচে, সেধে সেধে, চোখের জলে ভেসে ভেসে। ঈশ্বরের কাছে আমরা সবই চাই—সবই বলি। তিনি কি দেন ?—ভগবান সে সকল দেন না তিনি বলেন—

'সেহ মূর্খ, আমি বিজ্ঞ বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়ে বিষয় ভুলাইব ॥"—চৈঃ চঃ
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে।

কৃষ্ণের নাম করতে করতে নামের প্রভাবে যেমনি একটু রসের সঞ্চার হয়, তখন সে আর কিছু চায় না; শুধু সে ভাবে আমাকে তোমার দাস করে নাও। তাই কবি বলেছেন 'অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু সুরধুনী তীরে উজোর।'

এমন অনেক পদ আছে। নবদ্বীপের সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের একটি ছেলের সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিরা যে দরদ ও মমতা দিয়ে কবিতা লিখেছেন, গান বেঁধেছেন, আজও যে গান শুনে অনেক দরদী, মরমী ভক্ত ভাবুক রসিক অশ্রু বিসর্জন করেন, তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যের কোথাও পাই না।

জয়দেব

কবিশিরোমণি শ্রীজয়দেবের কথা পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হইলেও জয়দেব চিরনূতন। জয়দেবের বহু আলোচনা হইয়াছে, হইবেও বহু। তাহার কারণ জয়দের বাংলা কবিতাধারার মূল প্রস্রবণ। বাংলার এক ক্ষুদ্র পল্লী কেন্দুবিল্ব, সেই পল্লীর কবি নিভৃতে যে গীত গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা এই অষ্ট শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীর প্রাণ মাতাইয়া রাখিয়াছে। [জয়দেব হইতেই বাঙালীর গীতি কবিতা। সেই কোমলকান্ত পদাবলী সুরতানলয়ে কীর্ত্তনেরও জন্মদান করিয়াছিল।] বৈষ্ণব গীতি-কবিতার তুলনাও সারা বিশ্বে মিলে না, কীর্ত্তনের মত এমন ললিত কোমল, মদিরা-তরল গানও জগতে দুর্লভ। [এই জন্য সমস্ত সভ্য জগতে জয়দেবের সমাদর। ইংলণ্ডে Sir Edwin Arnold জয়দেবের কবিতার ঝঙ্কারে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার ইংরেজি কবিতার সঙ্গে 'মা কুরু মানিনি মানময়ে' বুনিয়া দিয়াছেন। জার্মাণ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ হইয়াছিল।]

কেহ কেহ অনেক সময় গীতগোবিন্দকে অনুপ্রাস-বহুল শব্দালঙ্কারপ্রধান কাব্য বলিয়া একটু উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমরা অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহার এমন সহজ প্রয়োগের সুযোগ কি পরিত্যাগ করিতে পারি? কিন্তু এরূপ নিশ্চিন্ত মনে আমরা যে সিদ্ধান্ত করি, তাহার মূলে যে কত বড় অবিচার আছে তাহা ভুলিয়া যাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ একখানি গতানুগতিক ধরণের কাব্য নহে। [কালিদাসের সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মধ্যে মেঘদূত যেমন মৌলিকতায় এখনও বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করে, জয়দেবের' এই গীতি কবিতা তেমনি একখানি মৌলিক কাব্য। ইহার তুলনা প্রাচীন সাহিত্যে বিরল]—গীতিকবিতা

হিসাবেও বটে, সুরলয়যুক্ত গান হিসাবেও বটে। কালিদাসের প্রসিদ্ধ কাব্য বিক্রমোর্বশীতে কয়েকটি অন্ত্যমিল যুক্ত গান আছে; গানগুলি প্রাকৃতে রচিত, প্রায়ই চর্চরী জাতীয়। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে ছন্দ ঝঙ্কার-ময়ী যে অনবদ্য গীতিকবিতা আমরা পাই, তাহার তুলনা কোনও দেশের সাহিত্যে মিলে না। আধুনিক সমালোচকের বিচারে যদি এই অতুলনীয় মাধুর্য প্রথম শ্রেণীর কাব্যোৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলেও স্রষ্টা হিসাবে জয়দেবের স্থান অনতিক্রম্য বলিয়া নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবে। জয়দেব বাংলা কবিতার আদি গুরু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা কবিতার ছন্দ, প্রকাশভঙ্গী, অনুপ্রাস, কোমলতা ও মাধুর্য সবই জয়দেবের বরহস্তের অমূল্য দান। জয়দেব তাঁহার সংস্কৃত পদাবলীতে যে সুরে সুর বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন, বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর বীণায় তাহা আজ পর্যন্ত অনুরণিত হইতেছে।

জয়দেবকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা কি ভাবে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁহার স্থান কত উচ্চে।

জয় জয় জয়- দেব দয়াময়
পিরিতি রতন খনি।
পরম পণ্ডিত পূজ্যগুণগণ
মণ্ডিত চতুর মণি॥

* * *

পদ্মাবতী সহ গানে বিচক্ষণ
আনে কি উপমা সাজে।
পঞ্চ পক্ষ সুরে শুনিয়া গন্ধর্ব
কিন্নর মরয়ে লাজে॥ —নরহরি দাস

এই কবি দম্পতী যে গানে অদ্ভুত প্রতিভাশালী ছিলেন, তাহা সেক-শুভোদয়া হইতেও জানা যায়। সেক শুভোদয়া সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে

লিখিত। সেকশুভোদয়ায় একটি গল্প আছে যে বুঢ়নমিশ্র নামে এক দিগ্বিজয়ী গায়ক লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় আসিয়া জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু পদ্মাবতী ও জয়দেব এই দিগ্বিজয়ীকে গানে পরাস্ত করিলেন। গীত-গোবিন্দের 'পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী' দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে জয়দেবের মনোহর গীতের সঙ্গে পদ্মাবতী নৃত্য করিতেন। অথবা উভয়েই নৃত্যগীতের দ্বারা কৃষ্ণের উপাসনা করিতেন।

ভক্তমাল এবং বনমালী দাসের জয়দেব চরিত্রে জয়দেব সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তীও অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তাহার মধ্যে একটি প্রবাদ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত: জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটি পদ ভগবান নিজে পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। জয়দেব 'স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' পর্যন্ত লিখিয়া অবশিষ্টাংশ লিখিতে কুণ্ঠিত হইলেন।

কৃষ্ণচাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে।
কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় বড় চিতে॥

কিন্তু ভগবান সে সংশয়ের অবসান করিয়া দিলেন; নিজ পদ্মহস্তে লিখিয়া দিলেন—

দেহি পদ পল্লবমুদারম্।

উপরে নরহরি দাসের যে পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও আছে।

যার বিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ
গ্রন্থ সুকৌশল তাতে।
গোবিন্দ আনন্দে 'দেহি পদপল্লব'
আদি বর্ণিলেন যাতে॥

এই সকল কিম্বদন্তী ও প্রবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কবির হৃদয় ভক্তিভাবের উৎস ছিল এবং তাঁহার সমকালে এবং পরবর্তীকালেও জয়দেবের ন্যায় ভক্ত কবি বেশী জন্মগ্রহণ করেন নাই। [বাঙালীর স্বাভাবিক ভাবালুতা ও রসপ্রবণতা জয়দেবের কবিতার স্বচ্ছ মুকুরে প্রথম আপনার

রূপ দেখিল। বাস্তবিক এমন রূপ ও রসের পসরা লইয়া ইহার পূর্বে বাংলা দেশে কোনও কাব্য আবির্ভূত হয় নাই। বাঙালীর প্রতিভা সাধারণতঃ গীতিকবিতা-ধর্মী। যে lyric মাধুর্য গ্রীক সাহিত্যে পাওয়া যায়, জার্মাণ কবি হায়েনের মধ্যে যে রসটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ কবি শেলির মধ্যে যে রসের আভাস মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, তাহারই মধ্যে বাঙালীর কাব্য প্রতিভার বিলাস দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেবই সেই যাদুকর শিল্পী যিনি রূপেরসে মজাইয়া তাঁর অনুপম চিত্র আঁকিয়াছিলেন।

কাব্যে যত প্রকার রস আছে, তাহার মধ্যে শৃঙ্গার রসই মুখ্য। বিশ্বের সমস্ত কাব্যকবিতার মধ্যে এই শৃঙ্গাররস ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। সার্বজনীন প্রীতির আস্পদ বলিয়াই শৃঙ্গার রসের নাম মধুর রস। কিন্তু জয়দেব এই মধুররসকে যে ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে অন্য কেহই সেরূপ পারেন নাই। বস্তুতঃ ভগবান্‌কে মূর্তিমান্ শৃঙ্গার রস রূপে কল্পিত করিয়া তিনি যে ভক্তিভাব ও সাহিত্যরসের মধ্যে এক স্বর্ণশৃঙ্খল নির্মাণ করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। মনে রাখিতে হইবে যে, জয়দেবের কাব্য ধর্মগ্রন্থ নহে, অর্থাৎ মনুসংহিতাও নয়, ভগবদ্‌গীতাও নয়। গীতগোবিন্দ কাব্য; কাব্যরসই ইহার প্রধান সম্পদ্। অথচ তাহার মধ্য দিয়া একটি স্বচ্ছন্দ অন্তঃসলিলপ্রবাহরূপে ভক্তিভাবের ফল্গু ধারা তিনি কেমন করিয়া বহাইলেন, তাহা চিরদিন ভাবুকমনের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া থাকিবে। তিনি যে "মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতি" গাহিয়া গিয়াছেন, সেই উজ্জ্বল রসই বৈষ্ণব কাব্য, বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব ধর্মের সার কথা হইয়া রহিয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে জয়দেবের কাব্যে এই আদিরসাধিক্য শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমালোচনা নিছক রুচির উপর নির্ভর করিতেছে! কাব্যের নিয়ামক পরিবর্তন শীল রুচি নহে, খেয়াল নহে, অলঙ্কার শাস্ত্রের ধরাবাঁধা নিয়ম। কাজেই কাব্যের রসসৃষ্টির

প্রয়োজনে, অলঙ্কারশাস্ত্রের শাসনে জয়দেব যে চিত্রকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা সাময়িক রুচির দ্বারা বিচার্য নহে। হিন্দু সাম্রাজ্যের অস্তগমন কালে শেষ অক্ষম নরপতির রাজসভার রুচি যদি বর্তমান বিংশ শতাব্দীর রুচির দ্বারা সমর্থিত না-ও হয় তাহা হইলেও জয়দেবের অনন্য সাধারণ সৃজনী প্রতিভার বিলাস ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

[গীতগোবিন্দ আদিরস প্রধান হইলেও জয়দেব যে সহজিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন না, তাহা বুঝা যায় তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই। তিনি বলিতেছেন যে,

যদি হরি-স্মরণে সরসং মনো
বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥ —গীতগোবিন্দ ১ম সর্গ

সুতরাং জয়দেব যে আদিরসের জন্যই আদিরস সৃষ্টি করেন নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি গ্রন্থশেষেও এই কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছেন :

যদ্‌গান্ধর্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎকাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎসর্বং জয়দেবপণ্ডিত কবে : কৃষ্ণৈকতানাত্মন:
সানন্দা : পরিশোধয়ন্তু সুধিয়: শ্রীগীতগোবিন্দত: ॥

হে সুধী সজ্জনগণ! যদি সঙ্গীত শাস্ত্রোক্তগীতরাগতালাদিতে কৌশল, সর্বব্যাপী বিষ্ণুর অনুধ্যান, কাব্যকথায় লীলায়িত শৃঙ্গার তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের বাসনা থাকে, তবে কবি জয়দেব পণ্ডিতের এই শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে আনন্দ সহকারে তাহা লাভ করিয়া আশঙ্কাপঙ্ক হইতে বিমুক্ত হউন (পরিশোধয়ন্তু) কারণ জয়দেবের আত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একতান, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।]

সহজিয়া সম্প্রদায় অনেকটা বৈষ্ণব ভাবধারা অনুসরণ করেন বটে, তাঁহাদের ভজন প্রণালী কিছু ভিন্ন প্রকার। [বৈষ্ণবেরা যেমন রাধাকৃষ্ণ লীলাকে সর্বপ্রকার কামগন্ধ বিবর্জিত ভাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াসী, সহজিয়ারা তাহা নহেন। তাঁহাদের সহজ সিদ্ধি বা সহজানন্দ যৌন-প্রবৃত্তির একান্তবর্জন-নিষ্ঠ নহে।] জয়দেবের মত যে ইঁহাদের অনুকূল ছিল না, তাহা বুঝা যায় শ্রীচৈতন্যের অনুরাগ হইতে। শ্রীচৈতন্য যে জয়দেবের কাব্যের অনুরাগী ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ আজীবন ব্রহ্মচারী, সুপণ্ডিত, রসজ্ঞ ও ভক্ত স্বরূপদামোদর জয়দেবের পদাবলী গান করিয়া চৈতন্যদেবকে তাঁহার দিব্যোন্মাদ দশায় আনন্দ দান করিতেন। এই জন্য অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন-গণের অগ্রণী রূপে জয়দেব এখনও বঙ্গদেশে পূজিত হইয়া থাকেন।

চণ্ডীদাস

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস কে ছিলেন, কোথায় তাঁর জন্ম, কবে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন—এ সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কিম্বদন্তীর অভাব নেই, কিন্তু তার উপর নির্ভর করে কোনোও কথা বলা নিরাপদ নয়। [বীরভূমে কিম্বদন্তী আছে চণ্ডীদাস কীর্ণাহারের নিকটে নান্নুর গ্রামে বাস করতেন, এখন সে স্থান ভগ্নস্তূপে চিহ্নিত হচ্ছে। তার কাছে পুরাণো বাশুলী মন্দিরও ভগ্নস্তূপে পরিণত। চণ্ডীদাস এই বাশুলী বা বিশালাক্ষীর সেবক ছিলেন। আবার বাঁকুড়ায় এক কিম্বদন্তী আছে যে, চণ্ডীদাস ছাতনার নিকটে যে নান্নুর আছে, তারই অধিবাসী ছিলেন। সেখানেও বাশুলীর মন্দির আছে।] পুরাণো যে মন্দিরটি ছিল,

সেটি ভেঙে যাওয়াতে তারই কাছে একটি নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। রামী রজকিনীর বাড়ী নান্নূরেও আছে, ছাতনায়ও আছে। ছাতনায় এখনও রামী ধুবনীর পাট আছে যেখানে সে কাপড় কাচতো। কয়েক বছর আগে বাঁকুড়া থেকে চণ্ডীদাসচরিত বেরিয়েছে, তাতে বাঁকুড়ার দাবীই সমর্থন করে। কাজেই ব্যাপারটি শক্ত হয়ে উঠেছে। আমি ছাতনায় গিয়েছি; নান্নূরেও গিয়েছি। ছাতনা বাঁকুড়ার সহর থেকে বারো মাইল দূরে। এখনও সেখানে ধোবা পাড়া আছে—অনেক ধোবা সেখানে বাস করে। চণ্ডীদাসের বংশধরেরাও এখানে বর্ত্তমান। চণ্ডীদাস অবশ্য বিবাহ করেন নি। কিন্তু তাঁর নাকি এক ভাই ছিলেন, তাঁরই বংশের ধারা এখনও চল্‌ছে। এই বংশধরগণের মধ্যে একজন আমাকে বললেন যে, চণ্ডীদাস প্রথমে ছিলেন বীরভূমে, তারপর আসেন বাঁকুড়ায়। অবশ্য এটা অসম্ভব নয়—দূরত্ব ৫০ মাইল মাত্র। এমন হতে পারে যে, চণ্ডীদাস প্রথম জীবনে বীরভূমে নান্নূর বাস করে' শেষজীবন কাটিয়েছিলেন বাঁকুড়ায় এবং সেখানে বাশুলীর মন্দির, শাঁখা পুকুর প্রভৃতি বীরভূমে যেমন ছিলো, সে সব ছাতনায় হুবহু এনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু আমার মনে হয় চণ্ডীদাস দুইজন ছিলেন—একজন ছাতনার, আর একজন বীরভূম নান্নূরের। এঁদের মধ্যে শেষোক্তই প্রাচীনতর এবং ইনিই সম্ভবতঃ আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস। কিন্তু এ শুধু অনুমান, তার চেয়ে বেশী কিছু বলা যায় না।

চণ্ডীদাসের কবিতার প্রধান গুণ তার সরলতা, যাকে আলঙ্কারিকেরা বলেন প্রসাদ গুণ। একজন কবি যেমন চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে বলেছেন, "সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা।" তাঁর ভাষায় আড়ম্বর নেই, অলঙ্কারের বালাই নেই। সহজ সরল ভাষায় তিনি প্রাণের কথা বলেছেন। সেই প্রাচীন যুগে যখন বাংলা কবিতার কোনো আদর্শ ছিল না বললেই হয় তখন তিনি এমন স্বচ্ছ, সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় কেমন করে কবিতা লিখ্‌তে পারলেন এ ভাবলে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি

না কিন্তু তার কারণ এই যে, সে সময়ে কবিতার জন্য ততো কবিতা লেখা হ'ত না, যত না হ'ত গানের জন্য। গীতের ভাষা সরল না হলে লোকের কাছে আদরণীয় হয় না। চণ্ডীদাসের কবিতা একে গীতি-ধর্ম্মী, তাতে আবার তার বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেম! প্রেমগীতি সরল না হলে তা মর্ম্মে প্রবেশ করে না। এই জন্যই চণ্ডীদাসের কবিতার ভাষা সরল, ভাব তরল এবং ছন্দ মিষ্ট। এই দেখাদেখি অনেক কবি সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের নিরাভরণা ভাষায় যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বিকশিত হয়েছে, অন্য কেউ তা আন্‌তে পারেন নি। চণ্ডীদাস অল্পকথায় যে চিত্র ফুটিয়েছেন, তা সত্যই মর্ম্ম স্পর্শ করে—এখানেই চণ্ডীদাসের অনন্য সাধারণ প্রতিভা স্বীকার করতে হবে।

এ ঘোর যামিনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে,
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।

এই বলবা মাত্রই একখানি করুণ কোমল চিত্র চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। কিন্তু এই যে জলে ভেজা, অশ্রুসজল চিত্র এটা আকস্মিক নয়। পাছে কেউ আকস্মিক বলে উপেক্ষা করে, এই জন্য চণ্ডীদাস তাঁর নায়িকার মুখ দিয়ে বলালেন,

আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখেতে দুখী,
চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি
শুনিতে জগত সুখী।

অর্থাৎ প্রেমের সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বকালীন অনুভূতি দিয়ে রচিত এই চিত্র। সকল প্রেমিক প্রেমিকার পক্ষেই কথাগুলি খাটে।

আমি যাই যাই বলি বলে তিন বোল
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল।
করে কর ধরি পিয়া শপতি দেই মোরে,
পুন দরশন লাগি কত চেষ্টা করে।

হৃদয়ের কাকুতি এর চেয়ে সহজ কথায় প্রকাশ করা যায় কিনা সন্দেহ। চণ্ডীদাস যখন বলেন,

পরাণ বঁধুরে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে,
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষত মধুর হাসে।
পিয়ল বরণ বসন খানিতে
মু'খানি আমার মুছে,
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে।

প্রেমিকার এই স্বপ্ন-দর্শন চিত্রটি এত মধুর যে বৈষ্ণব কাব্যেও এর তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। জ্ঞানদাসের প্রসিদ্ধ পদটি চণ্ডীদাসের অনুকরণে রচিত বটে, কিন্তু তিনিও এতখানি দরদ দিয়ে লিখ্‌তে পারেন নি।

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে,
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।

এ চিত্রও অতুলনীয় কিন্তু এ ধনীর দুলালীর চিত্র। চণ্ডীদাসের সেই পল্লীবালার সুখ-দুঃখ বেদনার চিত্র এ নয়। "শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে রাখিয়া শুতল কাছে।" এমন আন্তরিকতা জ্ঞানদাসের কবিতায় ফোটে নি।

চণ্ডীদাসের চিত্রটি বড় সরস, বড় কোমল অনুভূতির স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

তারপরে স্বপ্ন যখন ভেঙে গেল, তখন রাধার অবস্থার যে চিত্র চণ্ডীদাস দিয়েছেন, সে অতি অপূর্ব্ব!

কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়,
চণ্ডীদাস কহে এমন হইলে
আর কি পরাণ রয়।

নিবিড় মিলনে বিভোর কপোত-দম্পতির একটিকে হঠাৎ বাঁটুল মারলে সে যেমন যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করে, স্বপ্ন-ভঙ্গে রাধার দশাও তেমনি হয়েছিল। বাঁটুল অর্থে ধনুক হতে যে গোলাকার সীসা বা লৌহখণ্ড সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়। পল্লীসুলভ এই উপমাটিতে চিত্র অপূর্ব্ব সজীবতা লাভ করেছে।

চণ্ডীদাসের রাধার চিত্রে প্রেমের এই যে ঐকান্তিকতা ফুটে উঠেছে, তা-ই পরবর্ত্তী কবিদের মনে প্রেমের উচ্চ আদর্শ মুদ্রিত করে দিয়েছে। চণ্ডীদাস বলেছেন, এমন প্রেমে বিচ্ছেদ হইলে আর কি পরাণ রয়?' তাই আমরা দেখি তাঁর অনেক পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়,
যদি তার হয় যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়।

(চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২ পরি)

অর্থাৎ এ প্রেম স্বর্গীয়, এমন প্রেম যদি ভাগ্যগুণে কারও হয়, তবে সে প্রেম বিচ্ছেদ সহে না। চণ্ডীদাস স্পষ্টই বলেছেন,

পিরীতি লাগিয়ে পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা।

চণ্ডীদাস সারা জীবন এই পিরীতির মহিমাই গান করেছেন। প্রেমকে এমন বড় করে আর কোনও দেশের কোনও কবি দেখান নি। তাই বাংলার নরনারী যুগ যুগ ধরে' চণ্ডীদাসের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছে।

'না জানে পিরীতি যারা নহি পায় তাপ'—যারা পিরীতির মর্ম্ম জানে না, তাদের কোনও দুঃখ পেতেও হয় না। দুঃখ নহিলে প্রেমে সুখ কি?

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥

নিখিল মধুরতারখনি এই প্রেমের সঙ্গে সন্দেহ, শঙ্কা, বিরহের পরম ব্যথা গাঁথা রয়েছে। এই কথাই চণ্ডীদাস সবখানে বলতে চেয়েছেন। এই অফুরন্ত ব্যথাবেদনা প্রেমকে এক পরম রহস্য জড়িত করে তুলেছে। সাধারণতঃ প্রেমকে Sex instinct বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা কখনও চিন্তা করেন না যে নিখিল মানব মনের এই সুকুমার বৃত্তিটির মধ্যে দুঃখই সবচেয়ে বড় স্থান অধিকার করে' রয়েছে। প্রেমের সার্থক বিকাশ সেইখানে, যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ করে' নেয় জীবনের চিরসাথীরূপে। কামনা বাসনা স্বার্থ-চিন্তা যে প্রেমকে বিচলিত করে তোলে, সে প্রেমাভাস মাত্র, প্রেম নয়। বৈষ্ণবেরা তাকে বলেছেন কাম। চণ্ডীদাসের প্রেম আদর্শ সৃষ্টি করেছে। তাই চণ্ডীদাস শুধু বাংলার কবি নন, তিনি বিশ্বের কবি। সমস্ত দেশে সর্ব্বকালে তাঁর এই আদর্শ মহনীয় হ'য়ে রয়েছে। একবার একজন ফরাসী মহিলা এদেশে বেড়াতে এসে চণ্ডীদাসের কাব্যের পরিচয় পান। তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে কতকগুলি কবিতা সংগ্রহ করে' ফরাসী ভাষায় তার অনুবাদ করে বই ছাপিয়েছিলেন। সে বইয়ের নাম Amours de Radha et Krishna.

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। যাঁরা মনে করেন যে এ ভাষা

পাঁচশ বছরের পুরাতন হইতেই পারে না, তাঁরা সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষার Chaucer এর সঙ্গে Tennyson এর ভাষার তুলনা করে, একথা বলেন। ইংরেজী ভাষার যে পার্থক্য দেখা যায়, তাঁরা মনে করেন যে এদেশের ভাষায়ও ঠিক সেই রকম পার্থক্য নিশ্চয়ই থাক্‌বে! কিন্তু আমাদের দেশের কাব্য সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে থাক্‌লেও মোটামুটি কবিতার ভাষা সেই প্রাচীন যুগ থেকে অনেকটা একই রকম চলে আস্‌ছে। কৃত্তিবাসের কথা ছেড়ে দি, মালাধর বসুর ভাষা, বাসু ঘোষের ভাষা, লোচন দাসের ভাষা এসব আলোচনা করলে দেখা যাবে যে আমাদের ভাষার কাঠামো বেশী বদলায়নি। আমি কেবল সংশয়টির আভাস মাত্র দিয়ে আমার মত ব্যক্ত করলাম; যাঁরা এ বিষয় আরো ভালো করে জান্‌তে চান, তাঁরা প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করে দেখবেন।

ভাষার কথা ছেড়ে দিলেও চণ্ডীদাসের আরোও যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা চণ্ডীদাসকে আমাদের নিকট চিনিয়ে দেয়। [চণ্ডীদাসের রাধার চিত্রটি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রাধা প্রিয়তমের নাম শুনেই পাগল। একবার মাত্র নাম শুনেই তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে উঠলো। শ্যামের বাঁশী যখন বাজে, তখন তিনি সকল কাজ ভুলে যান, আত্মহারা হয়ে পড়েন। সেই বাঁশীর সুরের আশায় তাঁর নয়ন পুনঃ পুনঃ কদম্ব কাননের দিকে ধাবিত হয়।

মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।

এ কদম্ব কানন হতেই ত বাঁশীর স্বর লহরী ভেসে আসে।

এই হলো রাধার পূর্ব্বরাগ! মিলনের পূর্ব্বেই তাঁর মন প্রাণ তিনি নিঃশেষে প্রিয়তমের চরণে ডালি দিয়েছেন।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।

সুতরাং সংসারের আকর্ষণ তাঁর মনকে বেঁধে রাখতে পারে না। কদম্বতলা

দেখ্‌লে যার প্রাণ কেঁদে ওঠে, মেঘ দেখলে, যমুনার জল দেখলে যার বন্ধুকে মনে পড়ে, সংসারে তার কোনও আসক্তি থাকৃতে পারে কি ?

রাধা প্রেমের জন্য যৌবনে যোগিনী সাজলেন !

পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী সাজিনু,
তবু-তো দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পানু।

তিনি যে শুধু মনে মনে বৈরাগ্য অবলম্বন করলেন, তা নয়। যোগিনীর যে বেশ—গেরুয়া কাপড়—তাই ধারণ করলেন !

বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা !

প্রেমে যে মনে বৈরাগ্য এনে দেয়, একথা নূতন নয়। কিন্তু পূর্ব্বরাগে প্রেমিকাকে যোগিনী সাজাতে একমাত্র চণ্ডীদাসই পেরেছিলেন। আমরা কালিদাসের কুমার-সম্ভবে উমার তপস্যার কথা পড়েছি, কিন্তু সেখানে প্রেমের ব্যাকুলতা অপেক্ষা অটল সংকল্পও সাধনার দৃঢ়তা আমাদের মনে পড়ে বেশী। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন," এই ভাবটাই সেখানে বেশী ফুটেছে। কিন্তু কিশোরী রাধা যোগিনী সাজে প্রেমের অতি কমনীয় মূর্তিটি লাভ করেছেন।

চণ্ডীদাস কোথা হতে এই চিত্রের উপাদান পেয়েছিলেন তা আমরা ঠিক জানি না, তবে এই কথা আমরা বলতে পারি যে, চণ্ডীদাসের রাধা বাংলা কাব্য সাহিত্যে যে মূর্ত্তিতে প্রথম প্রবেশ করলেন তাতে এমন একটি পটভূমি তৈরী হলো যা চিরদিনের জন্য বাংলা কাব্যকে এক অফুরন্ত গম্ভীর মাধুর্য্যে মণ্ডিত করে রেখেছে। চণ্ডীদাস প্রথম থেকে যে উচ্চগ্রামে তাঁর প্রেমগীতির সুর বাঁধলেন, তা শুধু যে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে ধন্য করেছে, তা নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও প্রেরণা যুগিয়েছে।

অনেকে বলেছেন যে, চণ্ডীদাস বিরহের কবি, দুঃখের কবি, কিন্তু আমার মনে হয় কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। চণ্ডীদাস প্রেমের কবি। প্রেমে সুখও আছে,

দুঃখও আছে। প্রধানতঃ প্রেমের চারিদিকে ঘিরে থাকে দুঃখের অশ্রুজল। বিরহের মেদুর মেঘের মধ্য দিয়েই প্রেমের চাঁদিনী ফুটে ওঠে।

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে॥

সদাই এই ভয় হয়, এত প্রেম এত আনন্দ, পাছে এই সুখের স্বপ্ন ভেঙে যায়। প্রেম বড় ভঙ্গপ্রবণ, কোথাও একটু সন্দেহের আঘাত লাগ্‌লে বিম্বের ফানুষের মত মিলিয়ে যায়। তাই মিলনেও সুখ নেই। অশ্রুধারায় প্রেমের জন্ম—এই হলো চণ্ডীদাসের কাব্যের মূল সুর; বিরহের বাদল ধারায় প্রেম রামধনুর রং ফলায়, তাইত প্রেম এত মধুর। নরনারীর মিলন মেলায় প্রেমের যে মালা গাঁথা হয়, তাই চণ্ডীদাস দেবতার গলায় দেবার যোগ্য করে তুলেছেন। এই খানেই চণ্ডীদাসের আইডিয়ালিজম্। এই আইড়িয়ালিজম্ বা আদর্শের উচ্চভাবের জন্য চণ্ডীদাসের প্রেম সর্বকালের মানবের আস্বাদ্য হয়েছে। দেহের সম্বন্ধের বহু উর্ধ্বে প্রেমকে স্থাপন করে চণ্ডীদাস এই যে প্রেমের এক সুমহান্ আদর্শ দেখিয়ে দিলেন, তাতে এর মানবিকতার উপাদান বা human element এর অভাব নেই। চণ্ডীদাসের প্রেম স্বর্গীয়, কিন্তু মানবিক সহানুভূতির প্রাচুর্যের ফলে তাঁর চিত্র প্রাণবন্ত হয়েছে। কাজেই চণ্ডীদাসের সঙ্গে সকলেই অশ্রু মিশাতে পারেন। তাঁর পীরিতি সহজ সাধ্য নয়, কিন্তু মানুষের নাগালের বাইরেও নয়।

পিরীতি পিরীতি সবজন কহে
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহেত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥

এ প্রেম মানুষের সহজাত সংস্কার বলে লব্ধ নয়, এর জন্য চাই রসের নিবিড় অনুভূতি। বিরহ থাকে থাক, জীবন যায় যাক্, তবু প্রেমের সুখের মত সুখ নেই। প্রেম নহিলে জীবনে কি লাভ!

[চণ্ডীদাস কহে শুনহে নাগরি
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবনে তার।]

চণ্ডীদাসের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার কত কবি কত কবিতা কত গান লিখে গেছেন। কবিরা দলে দলে এই প্রেমের সঙ্গীত গান করেছেন। কোনও কোনও কবি চণ্ডীদাসের অনুকরণে কবিতা লিখে' ভনিতায় নিজের নাম দিতে ভুলে গেছেন, চণ্ডীদাসের নামই জুড়ে দিয়েছেন। এই সকল অনুকরণের মধ্যে যে ভাল কবিতা দুচারটি নেই, এ কথা বলা চলে না। ফলে হয়েচে এই যে, [কোন কবিতা আসল, কোন কবিতা জাল—তা আর ঠিক করবার উপায় নেই।] আমি এখানে সে জটিল সমস্যার বিচারে প্রবৃত্ত হতে চাইনে। তবে আমি শুধু বল্‌তে চেয়েছি যে চণ্ডীদাসের কাব্যে এমন একটি রসের ধারা আছে যা কষ্টিপাথর রূপে আমাদের চণ্ডীদাসকে চিনিয়ে দিতে পারে।

সে রসধারার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্মের অপূর্ব মিল আছে। খাঁটি চণ্ডীদাসকে চিন্‌বার পক্ষে এতেও কিছু সহায়তা করবে—যে কবি পিরীতির জয়গান করে' ধন্য হয়েছিলেন, যে কবি গোবিন্দদাসের নমস্য, যিনি জ্ঞানদাসের উপাস্য, প্রেমিক সন্ন্যাসী গৌরসুন্দর বাংলার সেই মরমী কবির কাব্যসুধা পান করতেন, এই অনুমানই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই চণ্ডীদাসের পদাবলী মহাপ্রভু গান করতেন, শুন্‌তেন, আর চোখের জলে ভাসতেন একথা আমরা প্রাচীনদের মুখে শুনি। [একদিকে মহামানব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অন্যদিকে মানবিকতার ধ্যানমগ্ন কবি চণ্ডীদাস। কবি চৈতন্যদেবকে দেখেন নি, কিন্তু তা হলেও তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন :

শুনহে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ আছয়ে
তাহার উপরে নাই॥

অথবা

মানুষ মানুষ সবাই বলয়ে
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন মানুষ জীবন
মানুষ পরাণ ধন ॥

কবি এই যে নূতন কথা বলে গেলেন, তাই ফলেছিল এই বাংলা দেশেই এক শতাব্দী পরে।

কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল

কৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কৃত হইবার পরে ইহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, ইহার সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এই পুথির সাঙ্গীতিক অংশে যে নূতনত্ব আছে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমাদের পরিচিত অন্য কোনও প্রাচীন বা অর্বাচীন পুথিতে রাগ রাগিণী ও তালের এরূপ বিস্তৃত সমাবেশ নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ-সংবলিত সঙ্গীতের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। সঙ্গীতে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, আমি এই প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

প্রথম ইহার অভিনবত্ব। কৃষ্ণকীর্তনের সকল কবিতাই গীত; এই সকল কবিতার উপরিভাগে বিস্তারিত ভাবে সুর ও তাল দেওয়া আছে। কোনও কোন গীতে শুধু সুর দেওয়া হইয়াছে, তালের উল্লেখ নাই। কয়েকটি নমুনা দিলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে :—

পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥
গুজ্জরী রাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ অঢ়ুক্কঃ ॥
গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ জয়জয় ॥
মালব রাগঃ ॥ প্রকীর্ণকঃ ॥ চিত্রকঃ ॥ লগনী ॥ রূপকং ॥
দণ্ডকঃ ॥
মালব রাগঃ ॥ বিচিত্র লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥
রামগিরী রাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥ একতালী ॥
দণ্ডকঃ ॥
বিভাষ রাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকথা ॥ দণ্ডকঃ ॥
পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ ক্রীড়া ॥

অনুস্বার বিসর্গ দেখিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ হইতে এই সকল লওয়া হইয়াছে। কিন্তু যত দূর দেখা যায় তাহাতে প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে যে সকল রাগরাগিণী বা তালের উল্লেখ আছে, কৃষ্ণকীর্তনে তাহার অনেক ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। 'সঙ্গীত রত্নাকর' একখানি অতি প্রচীন গ্রন্থ। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থ নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব সংকলন করেন। শার্ঙ্গদেব দৌলতাবাদের যাদব বংশীয় নরপতি সিংঘনের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। সিংঘন নরপতি শকাব্দ ১১৩২ হইতে ১১৬৭ (১২১০—১২৪৫ খ্রীঃ অঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সঙ্গীতরত্নাকর সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার টীকাকারও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে চতুরকল্লিনাথ ইহার টীকা প্রণয়ন করেন। কল্লিনাথ বিজয় নগরের অভ্যুদয় কালে (১৪শ হইতে ১৬শ শতক) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সঙ্গীত রত্নাকর বৃহৎ সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীত পারিজাত, সঙ্গীত দামোদর, সঙ্গীত মুক্তাবলী সঙ্গীত সার, সঙ্গীত চন্দ্রিকা প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থে বহু রাগরাগিণীর

নাম আছে এবং তালাধ্যায়ে তালের নাম আছে। সঙ্গীত রত্নাকরে এক শত বিশটি তালের নাম আছে। মতান্তরে তালের সংখ্যা দুই শত চব্বিশ (সঙ্গীতরাগকল্প-দ্রুম)। রত্নাকরের টীকায় কল্লিনাথ 'দেশী' তালের কথাও বলিয়াছেন। তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞেরা দেশী তাল ও স্বরের সন্ধান রাখিতেন এবং সেগুলিকে তাঁহাদের গণনার মধ্যে আনিতেন। তাল সম্বন্ধে ভারতীয় সঙ্গীতের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য দেশের স্থর এবং প্রণালী সম্বন্ধে যতই উৎকর্ষ স্বীকার করা যাউক না কেন, তালের অশেষ প্রকার ভেদ ও তাহার লক্ষণ-নির্দেশ ভারতবর্ষের এক অনন্যসাধারণ বৈলক্ষণ্য। প্রাচীন কালেও বিভিন্ন তালের বোল সঙ্গীত শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। (সঙ্গীত রত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে মৃদঙ্গের বোল দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু সঙ্গীতের এইরূপ বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যেও কৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত সাঙ্গীতিক শব্দগুলির মধ্যে অনেকগুলির সন্ধান মিলে না। কতকগুলি হয়ত কিছু রূপান্তরিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা :—ককু, কহু = ককুভ ; আহের = আভীর, আভীরী বা আহীর ; রামগিরি = রামক্রী, রামকলি বা রামকেলি। ধান্নুষী = ধনাশ্রী। লগনী = লাউনী বা লগ্নী নামক গীত। দেশাগ = দেশাখ, দেশাখ্য।

'দণ্ডক' বলিতে একটি ছন্দ বুঝায়।* কিন্তু গীতের প্রসঙ্গে তাহার অবকাশ কোথায়, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। ক্রীডা, কুড়ুক্ক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ তালের উল্লেখ সঙ্গীত রত্নাকরের এক শত একবিংশতি তালের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকীর্ন্নক কি বস্তু? প্রকীর্ণক অর্থে

---

* পাদৈঃ স্বরৈর্দণ্ডকেন ছন্দসা দণ্ডকো মতঃ।—সঙ্গীত রত্নাকর

দণ্ডকাশাবরীবৃত্ত দণ্ডকাশাবরী যথা।

তথা দণ্ডক-কোড়ারে স রাগঃ কিল জায়তে ॥

রাগতরঙ্গিণী (৩১০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত)

'চামর' জানি। চৈতন্য মঙ্গল গানে চামরের ব্যবহার দেখা যায়। গায়ক মধ্যে মধ্যে চামর হস্তে লইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করেন। রামায়ণ-গানেও কোথাও কোথাও এই প্রথা আছে। *

কিন্তু অঢ়ুক্ক, জয়জয়, চিত্রক, রূপকথা, বিচিত্র বা চিত্রক লগনীর অর্থ কি? 'রূপকথা' শব্দটি বেশী প্রাচীন বলিয়া জানা ছিল না। 'রূপকড়া' নামে একটি অল্প পরিচিত তাল আছে বটে, কিন্তু ইহাও আধুনিক। বিশেষজ্ঞেরা এ সম্বন্ধে হয়ত বলিতে পারিবেন।

আমরা জানি, রাগরাগিণী ও তাল অসংখ্য। সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা সঙ্গীতকে অনন্ত সমুদ্র বলিয়াছেন,—

নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে গানের বিভিন্ন গতি, ইহাও সঙ্গীতকারেরা লক্ষ্য করিয়াছেন :—

দেশে দেশে ভিন্ন নাম তদ্দেশীগানমুচ্যতে।

আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গীত প্রণালী কোনও দেশীয় বা স্থানীয় রীতির পরিচয় দিতেছে। এই রীতির সম্বন্ধে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহা সম্ভবতঃ বেশী প্রাচীন নহে। যথা রাগ গবড়া, রাগঅরু ইত্যাদি। চর্যাপদে তালের উল্লেখ নাই, কিন্তু সুরের মধ্যে রামক্রী, বলাড্ডি, মালসী ভৈরবী, পটমঞ্জরী গুঞ্জরী (গুর্জরী) প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

---

* সঙ্গীত রত্নাকরে রাগরাগিণীর বর্ণনায় 'প্রকীর্ণক' নামে একটি অধ্যায় আছে। সেখানে এরূপ কতকগুলি সুরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যাহা বিষয়-বিভাগের মধ্যে ধরা পড়ে নাই।

প্রকীর্ণত্বং চ গ্রন্থস্য বিষয় বিভাগেন বিনা প্রবৃত্তত্বমুচ্যতে।

কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনে সুরের বিশেষ উল্লেখ থাকায় এ অর্থ প্রযোজ্য নহে বলিয়া মনে করি।

ইহার পরে জয়দেবে আমরা সঙ্গীতের যে ধারা পাইতেছি, তাহাও প্রাচীন রীতির অনুগামী। গীতগোবিন্দে যে সুর ও তালের উল্লেখ আছে, তাহা সরল। যথা—মালব রাগ রূপক তাল, গুজ্জরী রাগ নিঃসার তাল, বসন্ত রাগ যতি তাল, কর্ণাট রাগ, দেশাগ রাগ একতালী ইত্যাদি। এ সকল কোনও স্থানীয় বা দেশীয় রীতির অনুসরণ করে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কৃষ্ণকীর্তন অনেক স্থলে জয়দেবের একান্ত অনুকরণ করিলেও সুর তাল সম্বন্ধে অনুকরণ করেন নাই। ইহার কারণ কি? তাহাও ভাবিবার বিষয় বটে।

চৈতন্য-পূর্ব্ববর্তী মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দবিজয় গ্রন্থে সঙ্গীতের যে প্রণালী দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ নহে। এই পুস্তকের প্রাচীনতম পুথি দেখিয়া কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে যে পুস্তক ছাপিয়াছিলেন, তাহাতে রাগরাগিণীর যে ক্রম দেখা যায়, তাহা সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত বটে। তালের নির্দেশ নাই, কেবল সুর দেওয়া আছে; যথা:—শ্রীরাগ, সুইরাগ, রামক্রী, পটমঞ্জরী, বসন্ত, মল্লার, ধানশ্রী ইত্যাদি। এই পুস্তকের ভূমিকায় ভক্তিবিনোদ মহাশয় বলিতেছেন যে, আদর্শ পুথিখানি চৈতন্য-জন্মের দুই বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল (১৪০৫ শক)। কৃষ্ণকীর্তন যদি ইহার ১০০ কি ১৫০ বৎসর পূর্বে (রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়) রচিত বা লিখিত হইয়া থাকে, তবে সে পদ্ধতি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কেন অনুসৃত হইল না, তাহাও বিবেচ্য।

আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্য-পরবর্তী কালের কোন দেশীয় বা স্থানীয় সঙ্গীতরীতি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। এই পুথিখানি বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৩১৮ সালে ইহা আবিষ্কার করেন বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকটে। ঐ অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরে

দেশীয় রাজাদিগের প্রভাবে নানা বিষয়ে উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। * সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুর এই সময়ে সঙ্গীতর্চ্চার জন্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। বীরহাম্বির ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোগল-পাঠান কলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। বৈঠকী সঙ্গীতের চর্চা বঙ্গদেশের মধ্যে এই মল্লরাজগণের প্রভাবে বনবিষ্ণু-পুরেই বেশী পরিমাণে হইয়াছিল। সেই জন্য এখনও আমরা বিষ্ণুপুরী রীতি বলিয়া উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের একটি অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র প্রণালীর সন্ধান পাই। প্রচলিত হিন্দুস্তানী রীতি হইতে ইহা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, সে প্রশ্নের কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু জানিতে পারিতেছি যে, বিষ্ণুপুরই সঙ্গীতচর্চায় একদিন বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গীতেও যে সেই প্রভাবের ঢেউ পৌঁছিয়াছিল, এই অনুমানই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই সময়ে অর্থাৎ প্রায় তিন শত কিংবা সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের সর্বত্র সঙ্গীতচর্চার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কীর্তনেরও প্রসার ঘটে। এই সময়ে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর গরাণ হাটী বা গড়ের হাটী কীর্তনের প্রবর্তন করেন। রাঢ়ে জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি মনোহরসাহী সুরের সৃষ্টি করেন। সুতরাং এই যুগ হইতে সঙ্গীতের অনুশীলন বঙ্গদেশে প্রবল ভাবে হইয়াছিল ধরা যায় এবং কৃষ্ণকীর্তনও সেই যুগে লিখিত বলিয়া অনুমান করিলে তাহা অসঙ্গত হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু

---

* The Rajas of Mallabhum seem now (from the time of Raghunath Singh—seventeenth century) to have entered on their palmiest days, if we may judge by the exquisite memorials left by him and his descendants—O'Maley (District Gazetteer).

এম্, এ দুইখানি পুথি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার এই আবিষ্কার সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩৩৯ ও ৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুথি দুইখানিতে কৃষ্ণকীর্তনের কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। এই পুথির সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত এক প্রবন্ধ (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯) ব্যতীত বিশেষ কোন আলোচনা এ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। এ পুথি দুইখানি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঁকুড়া অঞ্চলে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে একটি বিশেষ সঙ্গীতরীতি প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, ঐ পুথি দুইখানিও বাঁকুড়া অঞ্চলে সংগৃহীত হইয়াছিল।

এই পুথিদ্বয়ের একখানি ১২৩৭ সালে লিখিত, অপর খানি তাহারও প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে লেখা। প্রথমতঃ এই পুথি দুইখানিই সঙ্গীত বিষয়ক। অর্থাৎ গীতবাদ্য ব্যতীত ইহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। কোন তালের কোন গান এবং তাহার কতগুলি কলা ইত্যাদি ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতর পুথিখানিতে আলোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের অদ্ভুত সাঙ্গীতিক নির্দেশ ইহাতে অনুসৃত না হইলেও, যে সকল তালের উল্লেখ হইয়াছে তাহার অভিনবত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যথা: হরগৌরী, অপূর্বকলা, কুন্দশেখর (কুন্দুশেখর), আলুটী, বিষমসন্ধি, জদ্দ (বা জজ্জ?) কাঠের (কাচের?) তাল, চুটখিলা তাল ইত্যাদি। দ্বিতীয় পুথিখানিতে আরও সব নূতন তালের সন্ধান আছে: দশকোসি, জক্ষতাল, অপূর্ব কলিকা, বগুতাল, জলদকান্তি ইত্যাদি। এই সকল তালের বোলে দ্বিতীয় পুথিখানির কলেবর পূর্ণ; সেগুলি মণীন্দ্র বাবু ছাপান নাই। এ পুথিতেও কোন তালের কত কলা, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আছে। এই কলার মধ্যে আবার লঘু, গুরু, সদ্গুরু, গুরুর গুরু পরম গুরু প্রভৃতি নানা বিধি বিধান আছে।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কৃষ্ণকীর্তনের প্রকীর্ণক লগনী চিত্রক

প্রভৃতির নামগন্ধ ইহাতে নাই। বরং পাহিড়া, গুজ্জরী প্রভৃতির সঙ্গে বহু পরিচিত সুরের উল্লেখ আছে, যথা: বাগেশ্রী, মঙ্গল, ভীমপলাশী (ডিম্পনাশী নহে—১৮৩ পৃ:) মাউর, শ্রী ইত্যাদি। এই পুথি দুইখানিতে সুরের সরলতা থাকিলেও তালের অভিনবত্ব লক্ষিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই পুথিদ্বয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য গীতবাদ্য। গীত অপেক্ষা বাদ্যই প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বাদ্য সম্বন্ধে ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের অনুকরণে বাদ্যের সংস্কৃত সংজ্ঞা দিবারও চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তাহা অতি দীন অনুকরণ; না আছে তাহাতে ব্যাকরণ, না আছে কোনও অর্থ-সঙ্গতি। যথা দ্রুতংদ্বয়ং লঘুদ্বয়ং [……] স তাল দশকুশীঞ্চ ভবেৎ। হয়ত ইহা অশিক্ষিত লোকের লেখা, সে জন্যও এরূপ বিকৃতি ঘটিতে পারে। যাহা হউক, তালগুলির উদাহরণ স্বরূপেই গানগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। যথাঃ হরগৌরী তালের পদাবলী, আলুটী আলের পদাবলী, জদ্দকাঠের তালের পদাবলী, ইত্যাদি। উদাহরণ ব্যতীত গীতের অন্য কোনও মূল্য এই দুই পুথিতে নাই।

সুতরাং তালের উদাহরণ হিসাবে নানা কবির গীত উদ্ধৃত হওয়া উচিত ছিল। ইহাই সাধারণতঃ প্রত্যাশা করা যায় যে, গায়ক বা বাদক বিভিন্ন তালের বিভিন্ন ছন্দ দেখাইবার জন্য চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি হইতে পদ বাছিয়া লইবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সে প্রণালী অনুসরণ করা হয় নাই। এক জন কবির পদই উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তিনি বড়ু (বোঁড়ু, বাঁড়ু বা বটু) চণ্ডীদাস। আর কোনও কবির পদের সঙ্গে যে সংগ্রহকার পরিচিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ একেবারেই পাওয়া যায় না। দুইখানি পুথিতে অনেকগুলি পদ প্রায় সমান এবং প্রায়শঃ দানখণ্ড হইতেই সেই সকল পদ সংগৃহীত হইয়াছে। পদগুলির কবিত্ব বিশেষ কিছু থাকুক বা না থাকুক, অশ্লীলতা অংশে কৃষ্ণকীর্তনের অনুসারী। যথা, ১ম পুথি (প্রাচীনতর)

মোরে শেহ [...] বড়াই করু কোন বুদ্ধি।
শুনিঞা বা কি বলিবে স্বামি গুননিধি ॥
অমূল্য রতন মানে (মাগে ?) ধরে মোর হাথে।
মাগএ ষুরতি দান ** দেই হাথে ॥
(সাঃ পাঃ পত্রিকা, ১৩৩৯ সাল ১৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

২য় পুথি

মোর সিশুমতি বড়াই করি কোন বুদ্ধি।
শুনিঞা বা কি বলিব স্বামি গুণনিধি।
য়মুল্য রতন মাগে ধরি মোর হাথে ॥
মাগএ শুরতি দান * * দেই হাতে ॥
(ঐ ১৩৪০ সাল ৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণকীর্তন :

মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী
শুনিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধি ॥
অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে।
মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে ॥ (৮৭ পৃঃ)

‘সান দেই মাথে’ এই পাঠে কোন অর্থ হয় কি ? বসন্তবাবু জোর করিয়া অবশ্য একটি অর্থ করিয়াছেনঃ মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া, কিন্তু ঐ সময় মস্তক-সঞ্চালনরূপ সঙ্কেতের কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। পদাবলীতে ‘সান দেও শিঙ্গায়’ এরূপ প্রয়োগ পাই।*

এই নবাবিষ্কৃত পুথি দুইখানির অনেকগুলি পদ কৃষ্ণকীর্তনে আছে। রুচি, গ্রাম্যতাদোষ ও অভিনবত্ব হিসাবেও প্রাপ্ত পুথি এবং কৃষ্ণকীর্তনের

* সান—অবগুণ্ঠন ; সান কাড়া বা দেওয়া—ঘোমটা দেওয়া। বীরভূম অঞ্চলে এই অর্থে ‘সান’ শব্দ প্রচলিত।

মধ্যে অসাধারণ সাম্য দেখা যায়। ভাষার বিচার করিলেও কৃষ্ণকীর্তন ও এই পুথি দুইখানির মধ্যে বড় বেশী কালের ব্যবধান অনুমিত হয় না। অশিক্ষিত লিপিকরের খামখেয়ালী বানান দেখিয়া প্রাচীনত্ব অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। এই খামখেয়ালীপনা কৃষ্ণকীর্তন ও এই পুথি দুইখানি তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যথাঃ—অমূল [কৃঃ কীঃ] য়মুল (আধুনিক পুথি); আঙ্গুল (কৃঃ কীঃ), য়ঙ্গুলি [আঃ পুঃ], বেশ্যাক [কৃঃ কীঃ] বেউশ্যাক [আঃ পুঃ]।

এই দুইখানি পুথি দেখিলে এইরূপ অনুমান হয় যে, বাঁকুড়া জেলায় কৃষ্ণকীর্তন-লেখকের সম্প্রদায়ে তাঁহার পদগুলি গীত হইত এবং নূতন নূতন তাল সহযোগে সেগুলির প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এই গী যে বহুদূর বিস্তৃত হয় নাই, তাহার প্রমাণ—

১। কৃষ্ণকীর্তনের অন্য পুথি পাওয়া যায় না।

২। আধুনিক পুথিরও অন্য প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই।

এই গীতগুলির মধ্যে যে একটি সাম্প্রদায়িক ভাব আছে, তাহা এই নবাবিষ্কৃত পুথি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনতর পুথিখানির অনেকগুলি পদ দ্বিতীয় পুথিখানিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত অপর একটি পদও বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইবার চেষ্টা দেখা যায়। পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের একটি উৎকৃষ্ট পদ ; ইহা পদকল্পতরুতে এবং নীলরতন বাবুর সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে। মণীন্দ্র বাবু এই পদটি তুলিতে ভুলিয়াছেন :

বষু তালের পদাবলি ॥ রাগিনি পটমঞ্জরি ॥
এক কাল হইল মোর জমুনার জল।
আর কাল হইল মোর কদম্বের তল ॥
আর কাল হইল মোর পাসে বৃন্দাবন।
আর কাল হইল মোর নহলি জৌবন ॥

লঘু দুবারে ১৪ চৌদ্ধ কলা ॥ পরে গুরু ॥
আর কাল হইল মোরে ভ্রমরার বোল।
আর কাল হইল মোরে কানু মাগে কোল ॥
আর কাল হইল মোরে তরলিয়া বাঁসি।
আর কাল হইল মোরে কানু মুখের হাসি ॥
আর কাল হইল মোরে নয়ানের নির।
আর কাল হইল মোর চিত নহে স্থির ॥
আর কাল হইল মোরে কোকিল্যার স্বর।
আর কাল হইল মোর নিজ পাপ ঘর ॥
আর কাল হইল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হইল দানি করে কত রঙ্গ ॥
আর কাল হইল মোরে মোহনিঞা বাঁসি।
আর কাল হইল মোরে কালা মুখের হাসি ॥
আর কাল হইল মোরে নাহিক উপায়ে।
আর কাল হইল বটু চণ্ডিদাসে গায়ে ॥

এবং লঘু গুরু সকলে ৬৪ চৌসট্টি কলা।

এই পদটি কৃষ্ণকীর্তনে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মণীন্দ্রবাবু এই সুন্দর পদটি তাঁহার বিবরণ হইতে বাদ দিয়াছেন। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের পদবলী ১৫৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পাঠ ধৃত হইয়াছে :

পটমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল ॥

আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন॥

পদকল্পতরু (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) ২য় খণ্ড ১৪৫ পদ ইহারই প্রায় অনুরূপ, ভণিতাও প্রায় এক :—

দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কারু কোন দোষ নাই সবে একজন॥

এই পদটির ভাষা, ভাব, ব্যঞ্জনা কৃষ্ণকীর্তন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাপ্ত পুথির পদটিতে দ্বিরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে, ভণিতার কলিটি টানিয়া বুনিয়া মিলিত, এইরূপ মনে হয়। পদটিকে দানের পদের মধ্যে ফেলিবার চেষ্টাও দেখা যায় ; কারণ ঐ পুথিতে উদ্ধৃত সবগুলি পদই দানখণ্ডের।

আর কাল হৈল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হৈল দানি করে কত রঙ্গ॥

এই কলিটি যেন গানের অপরাংশ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে।

এই সকল কারণে আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্তন এই দুইখানি পুথির সহিত মিলাইয়া পড়া উচিত। তাহা করিলে, যে ভাবধারার জন্য কৃষ্ণকীর্তন পুথিখানিকে চতুর্দশ শতকের বলিয়া গণ্য করা হইতেছে, তাহার জের উনবিংশ শতকেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। সে যাহা হউক, সঙ্গীতের দিক্ দিয়া এই অপূর্ব পুথিত্রয়ের সম্যক্ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দীন চণ্ডীদাস

স্বয়ং দৌত্য

প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে আমি বাঁকুড়া হইতে একখানি পুথি পাইয়াছি। তাহাতে দীন চণ্ডীদাসের অনেকগুলি পদ আছে। পুথিখানি তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র পুরুলিয়ার উকিল শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত। ইহার কতকগুলি পদ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৪৫ সন ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষৎ পত্রিকায় যে পালাটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম কপালী মিলন। অর্থাৎ কপালী বেশে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কৃষ্ণ কখনও বাজিকর বেশে, কখনও মালিনী, কখনও দোকানী বেশে রাধিকার সহিত সাক্ষাতের প্রয়াসী। এই জন্য এই পালাগুলির সাধারণ নাম স্বয়ং দৌত্য। ইহার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে ভগবান স্বয়ং সময়ে সময়ে ভক্তের নিকট নানা ছদ্মবেশে উপস্থিত হন। যাহা হউক, এই কপালী মিলন পালাটি সম্পূর্ণ নূতন; অন্য কোথায়ও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। কিন্তু নাপিতানী মিলন একটি পুরাতন পালা। বিষয় বস্তু আর কিছুই নহে; কৃষ্ণ রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নাপিতানী সাজিয়াছেন। বিষয় বস্তু পুরাতন হইলেও, এইপালাটি সম্পূর্ণ নূতন। নাপিতানী মিলন স্বয়ং দৌত্যের পদ হিসাবে চণ্ডীদাসের ভনিতায় পদ কল্পতরুতে পাওয়া যায় (৩য় শাখা ১ম পল্লব)। এই পদগুলি নীল-রতন বাবুর সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস' গ্রন্থেও আছে। কিন্তু নিম্নধৃত পদগুলির সহিত তাহার একটি পদেরও মিল নাই।

পদকল্পতরু ও চণ্ডীদাস গ্রন্থের নাপিতানী মিলনের ব্যাপার সংক্ষেপে এই: একদিন রসিক চূড়ামণি নাপিতানীর বেশ ধরিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ

করিলেন এবং নাপিতানী পরিচয় দিয়া শ্রীমতীকে অলক্তক পরাইলেন। নায়ক কর্তৃক নায়িকার চরণে অলক্তক পরানো ব্যাপার পুরাতন কাব্য রসে অপরিজ্ঞাত নহে।

বিবুধৈরসি যস্য দারুণৈরসমাপ্তে
পরিকর্মণি স্মৃতঃ।
তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং চরণং
নির্মিত রাগমেহি মে॥—কুমার সম্ভব ৪র্থ সর্গ

যথারীতি যাবক পরাইয়া ধারে ধারে শ্যাম চন্দ্র নিজের নাম লিখিয়া দিতে ভুলিলেন না। কিন্তু নাপিতানী তাহার পারিশ্রমিক চাহিয়া বড় গোল করিয়া বসিল। সখী আসিয়া বলিলেন যে, নাপিতানী অপেক্ষা করিতেছে সে বেতন না পাইলে যাইবে না। শ্রীমতী তখন তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সে কত চাহে? তাহার উত্তরে চতুর নায়ক জানাইয়া দিলেন যে, তিনি রাধিকার স্পর্শ-সুখের প্রার্থী। ইহাই নাপিতানী মিলনের কাব্যরস। দুইটি পদে এই চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের অপরটি চণ্ডীদাসের ভনিতায় পাওয়া যাইতেছে। অথচ এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের বলিয়া দাবী করা হইতেছে।

নিম্নের দশটি পদের মধ্যে আটটি চণ্ডীদাসের ও একটি দীন চণ্ডীদাসের ভনিতায়। এই পালার মর্ম নায়ক নাপিতানীর বেশে মহলে প্রবেশ করিয়া শ্রীমতীকে যাবক পরাইতেছেন। (ঠিক কি ভাবে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। গোড়ার পদগুলি পাওয়া যাইতেছে না।) নিপুণ শিল্পীর মত তিনি আলতা পরাইতে পদে নানা লতাপাতা হংস মীন প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়া দিতেছেন। শ্রীমতী অলসের ভরে অনঙ্গমঞ্জরী নামা সখীর অঙ্কে হেলন দিয়া ঘুমাইলেন। সখীরা তাঁহাকে শীতল চামর দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। নিদ্রাভঙ্গে রাধিকা পদে বিচিত্র চিত্রাঙ্কন

দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি নিজের গলার মণিময় হার উন্মোচন করিয়া নাপিতানীর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।

নবিন কিসোরি রাজার কুমারি
হার লঞা নিজকরে।
নাপিতানী গলে দিয়া কুতূহলে
মনের আনন্দ সরে॥

(মন সরে, মনের সরে, সুখের সরে, মনের আনন্দ সরে—এই কবির কবিতায় অনেক ব্যবহৃত দেখা যায়। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী ৩৮৫-৩৮৮ পৃ দ্রষ্টব্য।) নাপিতানী মালা উপহার পাইয়া খুসী হইল। তখন সে বলিল যে, যদি ও সে নীচ ও দরিদ্র, তথাপি তাহার মনে সাধ হইতেছে যে সে কিছু প্রতিদান দেয়। শ্রীমতীর সম্মতি পাইয়া ছদ্মবেশী নায়ক নিজের কণ্ঠের হেমময় হার তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। তখন শ্রীমতী বুঝিলেন এ আর কেহ নহে, কৃষ্ণই বটে।

পরশে জানিল কপট কান
কত ভেল তার অমিয় স্নান
জানল হৃদয় ভিতর আন
দোঁহে দোঁহা ভেল ভোরিতে (?)।

এই পদগুলিতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে।

১। পদগুলিতে ক্রমিক সংখ্যা—৩১১ হইতে ৩২২। মাঝের কয়েকটি পদ (৩১৫-৩১৭) নাই; দীন চণ্ডীদাসের ভনিতাযুক্ত পদটিতে ক্রমিক সংখ্যা নাই। তাহা হইলেও দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীই ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট। বর্তমান ক্ষুদ্র পুথিতেও ক্রমিক সংখ্যা ধরিয়া দেওয়া আছে। এই জন্যও পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সম্পাদিত দীন চণ্ডীদাসে এই ক্রমিক সংখ্যাগুলি নাই। তাঁহার গৌণরাসের (? স্বয়ং দৌত্য) পদগুলি আরম্ভ

হইয়াছে, ১০৪৫ হইতে। পুথিতে তিনি ১০৪৫ হইতে ১০৫১ পদ পাইয়াছেন কিন্তু তাহার পরে ২০টি পদ তিনি অন্যত্র হইতে সংকলন করিয়া নষ্ট পদগুলির স্থান পূরণ করিয়াছেন। কারণ তাঁহার প্রাপ্ত পুথিতে ১০৫১ পদের পরেই ১০৮০ পদ রহিয়াছে। কাজেই বুঝা যায় যে ২৮টি পদ পাওয়া যাইতেছে না। মণীন্দ্রবাবুর ১০৫১ পদে তৈল হরিদ্রা সহ নায়কের ছদ্মবেশ গ্রহণের সঙ্কেত আছে। কাজেই তিনি মনে করিয়াছেন যে, ইহার পরেই নাপিতানী বেশ হওয়া সঙ্গত। কিন্তু আমার এ পুথিতে ক্রমিক সংখ্যা ১১১ হইতে আরম্ভ। অথচ দীন চণ্ডীদাসের অন্য পালার পদ আমার এই পুথিতে ২৬৪০ পর্যন্ত পাইতেছি। (মণীন্দ্রবাবু ২০০১ পর্যন্ত সন্ধান পাইয়াছেন।) এ পুথিখানি মোটেই বিরাট নহে। পৃষ্ঠাঙ্ক ১২; এখনকার খাতার মত করিয়া মাঝে সেলাই করা। এখানে সমস্যা এই যে, মণীন্দ্রবাবুর পালা যদি দীন চণ্ডীদাসের হয় তবে এ আবার কোন চণ্ডীদাসের? একই চণ্ডীদাস দুইটি স্বতন্ত্র পালা একই বিষয়ে লিখিবেন ইহা অসম্ভব না হইলেও ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা বাধিত হইতেছে।

২। দীন চণ্ডীদাসের কাল অভ্রান্ত ভাবে নির্ণয় করা যায় নাই। মণীন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকে শুধু এইমাত্র বলিয়াছেন যে, দীন চণ্ডীদাস চৈতন্যের পরবর্তী কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধারণার হেতু এই যে দীন চণ্ডীদাসের পদে চৈতন্যপ্রভাব লক্ষিত হয় এবং উজ্জ্বল নীলমণি বিদগ্ধ মাধব প্রভৃতি গ্রন্থের প্রভাবও সুস্পষ্ট। আমার এই পুথিতে স্পষ্টভাবে ১০৯৪।৯৫ সন লিখিত আছে। অতএব দীনচণ্ডীদাস ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্তমান ছিলেন, ইহাই সিদ্ধ হয়। ঠিক কত পূর্বে তাহা অবশ্য বলা যায় না।

৩। ২৫০ বৎসরের পূর্বের বৈষ্ণব কবি গৌর চন্দ্রিকা সম্বন্ধে একটিও পদ লেখেন নাই, ইহারই বা কারণ কি; মণীন্দ্রবাবু বলেন, হয়ত লিখিয়াছিলেন কিন্তু সেগুলি সমস্তই হারাইয়া গিয়াছে। এ শুধু অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমার এই সংগ্রহে গৌর চন্দ্রিকা আছে কিন্তু চণ্ডীদাসের ভনিতায়

নহে। সংগ্রহকর্তা কি চণ্ডীদাসের একটিও গৌরচন্দ্রিকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না? ইহার কারণ কি? নীলরতন বাবুর সংগৃহীত চণ্ডীদাস গ্রন্থে দীন চণ্ডীদাসের অন্যূন ৩৪টি পদ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একটিও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ নাই। আমার এই সংগ্রহেও নাই। ইহা হইতে এ অনুমান অসঙ্গত হয় কি যে দীন চণ্ডীদাস গৌরচন্দ্রিকার ধার ধারেন নাই? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে চৈতন্যের প্রভাবযুক্ত চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদ দেখিলেই যে তাহা আমরা দীন চণ্ডীদাসের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিব এরূপ যুক্তি কথনও সমীচীন হইতে পারে না। যে কবি চৈতন্যের প্রভাবপুষ্ট, তাঁহার পক্ষে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় গীত রচনা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এমন হওয়া খুবই বিচিত্র যে, তাঁহার রচিত একটিও গৌরচন্দ্রিকা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই—অথচ তিনি চৈতন্যের ভাবধারায় সুস্নাত। বাঁকুড়ায় এক সময়ে যে চৈতন্যবর্জিত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল—তাহাদিগকে সহজিয়াই বলি বা যে নামেই অভিহিত করি—তাহাও অমূলক অনুমান মাত্র নহে।

৪। দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস যে অভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ অনুমানও যুক্তিসহ নহে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু যে পুথি হইতে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে একটি স্থলেও দ্বিজের উল্লেখ নাই। নীলরতন বাবুর গ্রন্থে দ্বিজ ও দীন উভয়েই বিদ্যমান। বাঁকুড়ার এই একখানি পুথিতেও (বিমলাবাবুর) দ্বিজের নাম পাইতেছি না। যদি দীনের পদের মধ্যে দ্বিজের এবং দ্বিজের পদের মধ্যে দীনের পদ থাকিত, তাহা হইলে লেখকের অনবধানতার দোহাই দিয়া ইহাদের একাত্মতা প্রমাণ করা যাইতেও পারিত। কিন্তু যতগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দীন চণ্ডীদাসকে দ্বিজ হইতে পৃথক ব্যক্তি মনে না করিয়া উপায় নাই।

বিদ্যাপতি

দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত বিসপী গ্রামে বিদ্যাপতির নিবাস ছিল। বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ সকলেই পণ্ডিত ও বিষয়-কর্মে পটু ছিলেন। পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল যে বিদ্যাপতি বাংলা দেশেরই লোক, কিন্তু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহাতেই প্রথম প্রচারিত হইল যে, বিদ্যাপতি ঠাকুর বাংলার লোক নহেন, মিথিলার লোক।

বিদ্যাপতির সময় লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। বিদ্যাপতির সময় সম্বন্ধে প্রথম প্রমাণ বিসপীর দানপত্র। এই দানপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতির কবিত্বে তুষ্ট হইয়া বিসপী গ্রামখানি তাঁহাকে দান করেন। এই দানপত্রের তারিখ ২৯৩ লসং (অর্থাৎ লক্ষ্মণ সংবৎ)। মিথিলায় সে সময় লক্ষ্মণ সংবৎ প্রচলিত ছিল। তাহার কারণ এই যে, তৎকালে মিথিলা বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। দ্বারবঙ্গ কথাটিও এই অনুমান সমর্থন করে। যাহা হউক, পণ্ডিতগণের গণনা অনুসারে লক্ষ্মণ সেন ১১১৯ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং ২৯৩ লসং ১৪১২ খ্রীস্টাব্দ দাঁড়াইতেছে। কিন্তু মিথিলার রাজপঞ্জী অনুসারে শিবসিংহ ১৪৪৬ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দানপত্রে তিনি দিগ্বিজয়ী মহারাজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাহা হইলে দানপত্র অনুসারে শিবসিংহ রাজা হইবার অন্তত: ৩৪ বৎসর পূর্বে বিদ্যাপতিকে বিসপী দান করেন! সুতরাং রাজপঞ্জীর সময় সঙ্কেতে গোলযোগ আছে।

ইহা ব্যতীত দানপত্র যে জাল তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ এই দানপত্রে লসং ব্যতীত আরও তিনটি অব্দের উল্লেখ আছে। যথ—শকাব্দা, সংবৎ এবং হিজরি সন। এখন হিজরি সন আকবরের সময়ে এদেশে

প্রচলিত হয়। বিদ্যাপতির অনেক পরে। কাজেই দানপত্র জাল না বলিয়া উপায় নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এক প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দানপত্র জাল না হইতেও পারে; শুধু হিজরি সনটি পরবর্তী কালে যোজনা। আকবরের সময়ে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ রাজা টোডরমল্ল কর্তৃক জরিপ হয় তখন সম্ভবতঃ প্রমাণকে দৃঢ়তর করিবার জন্ম বিদ্যাপতির কোনও বংশধর হিজরি সনটি জুড়িয়া দিয়া থাকিবেন। এই রূপ যুক্তির মধ্যে সারবত্তা অপেক্ষা চাতুর্যই বেশী প্রশংসার্হ। সে যাহা হউক দানপত্রের প্রমাণিকতার উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথা বলা চলে না।

সনতারিখ সম্বন্ধে যাহাই হউক, মিথিলার রাজপঞ্জীতে শিবসিংহ এবং বিদ্যাপতি উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। রাজপঞ্জী প্রবর্তিত হয় ১২৪৮ শকে।

বিদ্যাপতি স্বহস্তে বঙ্গাক্ষরে শ্রীমদ্‌ভাগবত নকল করিয়াছিলেন। এই নকল ৩০৯ লসংয়ে সম্পূর্ণ হয়। এ সময়ে প্রাচীন মৈথিলগ্রন্থ সমূহ বঙ্গাক্ষরেই লিখিত হইত।

বিদ্যাপতির আদেশক্রমে একজন পণ্ডিত কাব্যপ্রকাশের টীকা নকল করিয়াছিলেন লসং ২০১ (১৪২০)।

বিদ্যাপতি রচিত লিখনাবলী সমাপ্ত হয় ১৪১৮ খৃঃ অব্দে। বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী রচনা করেন রাজা নরসিংহদেবের রাজত্ব-কালে। তিনি ১৩৯৫ শকে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৬ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়। *

* রায় বাহাদুর শ্যামনারায়ণ সিংহ বলেন যে, বিদ্যাপতি বৃদ্ধ বয়সে মিথিলার রাজা ধীরসিংহের সময় দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী রচনা করিয়াছিলেন। History of Tirhoot.

দুর্গাভক্তির প্রারম্ভে যে শ্লোক আছে, তাহা হইতে মনে হয় নরসিংহ দেবের রাজত্ব কালে রাজকুমার রূপনারায়ণের আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হয়। নরসিংহদেবের তিন পুত্র। ধীরসিহ, ভৈরবসিংহ, ও রূপনারায়ণ।

নবদ্বীপের স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁহার দুর্গোৎসব-তত্ত্বে দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী বিদ্যাপতির শেষ গ্রন্থ; ইহার রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৪৭৫ খৃস্টাব্দে বা তাহার নিকটবর্তী কোন সময়। বিদ্যাপতির জন্ম যদি ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে ধরা যায় (নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত), বা ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ হয় (দীনেশচন্দ্র সেন), তাহা হইলে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী-রচনার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম একশত বৎসরের অধিক হইয়া পড়ে। এইরূপ বৃদ্ধ বয়সে দুর্গাভক্তির ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লেখা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু বিদ্যাপতির জন্ম যদি ১৩৯০ খৃস্টাব্দ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে তাঁহার তরুণ বয়সে বিসপী প্রাপ্তি (২৯৩ লসং = ১৪১২ খৃঃঅঃ), ভাগবতের নকল ও পরিণত বয়সে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী লেখা—এই সকলের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজ হয়।

বিদ্যাপতি অধিক বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং অদ্বৈত আচার্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এরূপও প্রবাদ আছে। ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত প্রকাশে ইহার বর্ণনা আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থ কতদূর প্রামাণিক তাহা বলা যায় না।

বিদ্যাপতি যে চণ্ডীদাসের সমকালে জীবিত ছিলেন, এইরূপ ধারণার পরিপোষক কতকগুলি পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুর সংকলয়িতা বৈষ্ণবদাস প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন; কাজেই তাঁহার সংগৃহীত পদাবলী কেহ কেহ প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঐ পদাবলীগুলি বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না ঐ গুলি কোনও পরবর্তী কবি কল্পনার সাহায্যে গ্রথিত করিয়াছেন। *

বিদ্যাপতির পদাবলী যে শ্রীচৈতন্য আস্বাদন করিতেন এবং তাঁহার অল্প পরবর্তী মহাকবি গোবিন্দ দাস যে প্রশস্তির মালা গাঁথিয়া বিদ্যাপতির উদ্দেশে

* প্রবাসীতে আমার লিখিত প্রবন্ধ 'দীন চণ্ডীদাস' দ্রষ্টব্য।

অর্ঘ্য দিয়াছিলেন, ইহাও বিদ্যাপতির প্রাচীনত্বের প্রমাণ বটে। [গোবিন্দ দাসের বন্দনা :—

বিদ্যাপতি পদ যুগলসরোরুহ
নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে॥]
ইত্যাদি

বিদ্যাপতির ভাষা—বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার লোক ; কাজেই তিনি তাঁহার মাতৃভাষা মৈথিলেই পদাবলী রচনা করিয়াছেন, এইরূপ ধারণাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মৈথিল কোকিলের ভাষা অনেক সময়ে মৈথিল ভাষার ব্যাকরণ ও রীতি রক্ষা করে নাই দেখা যায়। হিন্দী, বাংলা ও মৈথিলীর সংমিশ্রণে তাঁহার ভাষা এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিদ্যাপতির সুবিখ্যাত সমালোচক ও সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার কৃত সংস্করণে বিদ্যাপতির পদের মৈথিল রূপ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়া অনেকস্থলে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। যথা

জাইতে পেখলুঁ নাহলি গোরী।

পদটিতে বিদ্যাপতি সদ্যস্নাতা গমনশীলা রাধার বর্ণনা করিতেছেন। ইহার ছন্দও কৃতস্নানা রমণীর গমনের ঝঙ্কার তুলিয়াছে। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু ইহাকে মৈথিল রূপ দিতে গিয়া যাহা করিয়াছেন তাহা ছন্দের দিক্ দিয়া আদৌ শ্রুতিমধুর হয় নাই।

জাইত পেখল নহাএলি গোরী।

এরূপ বিভ্রাটের বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নগেন্দ্র বাবু কতকগুলি বাংলা পদকেও মৈথিলে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ সে পদগুলি যে আদৌ বিদ্যাপতির নহে ইহা একরূপ সর্ববাদিসম্মত।

বিদ্যাপতির মৈথিল পদ যে লিপিকার ও গায়কের হস্তে পড়িয়া দুর্গতি

প্রাপ্ত হইয়াছে—ইহা কেবল নগেন্দ্র বাবুর মত নহে; আরও অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত এইরূপ মত পোষণ করেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে সেই যুগে বাংলা দেশ হইতে ছাত্রেরা ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য মিথিলায় যাইত; সেই সকল বাঙালী ছাত্র বিদ্যাপতির পদ শিখিয়া আসিত। তাহারা মৈথিল ভাষা ভালরূপে আয়ত্ত করিতে না পারার ফলে নানা ভুল ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। তাহাদের ভ্রমের গতিকে বাংলা দেশে বিদ্যাপতির পদ অশুদ্ধ আকারে প্রচারিত হইতে থাকে। তাহারই জন্য বিদ্যাপতির ভাষায় গোলযোগ ঘটিয়াছে। অর্থাৎ অনেক পদে খাঁটি মৈথিলরূপ পাওয়া যায় না।

এস্থলে বিচার্য এই যে, ন্যায়শাস্ত্রের মেধাবী ছাত্রেরা অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে যাহারা সঙ্গীতানুরাগী ছিল তাহারা যে ভুল করিয়াই গান শিখিবে, এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে? তারপর সে সময়ে বাঙলা ও মিথিলা একই প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। দ্বারবঙ্গ কথাটি তাহার প্রমাণ। সুতরাং একজন ভুল করিয়া একটি ভাষা শিক্ষা করিলে অপরের দ্বারা তাহা সংশোধিত হইবার বাধা ছিল না। কিন্তু তাহা না হইয়া কতকগুলি অর্বাচীন ছাত্র যেমন বিদ্যাপতির গান ভুল করিয়া প্রচার করিল, অমনি সারা বাংলা দেশ সেই ভুল চিরস্থায়ী করিয়া লইল? শুধু তাহাই নহে, বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবিগণ সেই ভুল ভাষার অনুকরণ করিয়া অনবদ্য কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন এরূপ মত যুক্তিসহ বলিয়া বোধ হয় না।

বাঙালীরাই যে বিদ্যাপতির ভাষা-বিভ্রাটের জন্য দায়ী, ইহাও একশ্রেণীর সমালোচকের অভিমত। মৈথিল কবিকে আমরা বাঙালীর সাজ-পোষাক পরাইয়াছি, একথা দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার অভ্যস্ত পরিহাস-প্রিয়তার ভঙ্গীতে বলিয়াছেন—"আমরা (অর্থাৎ বাঙালীরা) বিদ্যাপতির কুর্তাপাগড়ী খুলিয়া ধুতী চাদর পরাইয়াছি।" অবশ্য সব প্রাচীন কবির বেলা যাহা ঘটিয়াছে, বিদ্যাপতির বেলাও তাহার অন্যথা হয় নাই, হয়ত কিছু অধিক মাত্রায় ঘটিয়াছে—অর্থাৎ গায়ক এবং লিপিকার অনেক সময়ে

অর্থ না বুঝিতে পারিয়া বিকৃত পাঠ ঘটাইয়াছে। কিন্তু সমস্ত গায়ক এবং লিপিকার যে ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্যাপতির ভাষাকে বিকৃত করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। মনে রাখিতে হইবে যে বাঙলা দেশই বিদ্যাপতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। একথা নগেন্দ্র বাবুও স্বীকার করিয়াছেন। বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির শত শত পদ পাওয়া যায় কিন্তু গ্রীয়ার্সন সাহেব ✓ অক্লান্ত অধ্যবসায় সত্ত্বেও ৮২টি মাত্র পদ মিথিলা হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবুই বলিয়াছেন যে মিথিলার লোক বিদ্যাপতির কোনও সংবাদই রাখিতেন না। অবশ্য পরে দরভাঙ্গার মহারাজার অর্থব্যয়ে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সে পদাবলীও নগেন্দ্র বাবুর সংগ্রহের ছায়া মাত্র বলিলেই চলে। অথচ বাঙলা দেশ বিদ্যাপতির গানে মুখরিত। সেই নগেন্দ্র বাবুই পাঠ বিকৃতির জন্য বাঙালীকে দায়ী করিয়াছেন : এদেশের 'বৈষ্ণবেরা ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া, গড়িয়া পিটিয়া এক রকম করিয়া লইয়াছেন।' কিন্তু কথা এই যে পদকল্পতরু, পদামৃত সমুদ্র, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে বিদ্যাপতির বহুপদ সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই এক রকমের ভুল করিলেন কেন? ইঁহাদের সংগৃহীত পদের ভাষায় অবশ্য কিছু পাঠভেদ আছে বটে, কিন্তু মোটের উপর বলা যায় যে অজ্ঞতা বশতঃ ইঁহারা বিদ্যাপতির পদকে এমন বিকৃত করেন নাই যাহাতে ঐ পদ বিদ্যাপতির বলিয়া চিনিতে পারা কঠিন হয়।

পদাবলীই বিদ্যাপতির একমাত্র রচনা নহে। বিদ্যাপতি একাধিক ভাষা অত্যন্ত নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকায় তিনি এক মিশ্র ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত এই ভাষাকে তিনি 'অবহট্ট' নাম দিয়াছেন। অবহট্ট বোধ হয় অপভ্রষ্ট শব্দ হইতে আসিয়াছে। বিদ্যাপতি পুরুষ পরীক্ষা লিখনাবলী, গঙ্গা-বাক্যাবলী, দান-বাক্যাবলী, শৈবসর্বস্বহার, দুর্গাভক্তি-

তরঙ্গিণী প্রভৃতি পুস্তক সংস্কৃতে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ভূ-পরিক্রমা বোধ হয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনার প্রথম চেষ্টা। বলরাম শাপগ্রস্ত হইয়া কাশী কোশল প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিতেছেন এই ভঙ্গীতে লেখা। দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী তাঁহার শেষ গ্রন্থ। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার দুর্গোৎসবতত্ত্বে দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়াছেন এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কিন্তু এই সকল গ্রন্থ গ্রন্থকারকে অমরত্ব প্রদান করিতে পারে নাই। বিদ্যাপতি অমর হইয়াছেন তাঁহার পদাবলীতে। এ পর্যন্ত বিদ্যাপতির যত পদাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে, বোধ হয় আর কোনও বৈষ্ণব কবি তত পদ লেখেন নাই। তাঁহার এই পদাবলী গীতচ্ছন্দে রচিত। বস্তুতঃ জয়দেবের পরে মিথিলায় তিনিই এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক। চণ্ডীদাস বাংলাদেশে বসিয়া যাহা করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি মিথিলায় অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই একই কাজ করিয়াছেন অর্থাৎ অসংখ্য গীতরচনা। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সাক্ষাতের যে প্রবাদটি আছে, তাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে বলিয়া অনেকেরই মত। সুতরাং আমরা সময়ের পারম্পর্য সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়াও এখানে বলিতে পারি যে, এই উভয় কবি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ প্রতিভা-বলে একই শ্রেণীর গীত রচনা করিতে প্রাণোদিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের পূর্বে এই গীতের কোনও ধারা আমরা দেখিতে পাই না—হয়ত বিস্মৃতির বালুকায় সে ধারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ইঁহাদের সম্মুখে কোনও আদর্শ ছিল না। বিদ্যাপতি এই পদাবলী রচনা করিতে গিয়া নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে দেশের হৃদয়ের উপর দিয়া কি ভাবের ঢেউ বহিতেছে! দেশ-অর্থে মিথিলার চতুঃসীমা মাত্র বুঝাইত না। বর্ত্তমান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম সর্বত্রই বৈষ্ণবধর্ম প্রভাব বিস্তার করিতেছিল এবং ইহা আদৌ অসম্ভব নহে যে তৎকালীন বৃহত্তর মিথিলার জন্যই বিদ্যাপতির গীত রচিত হইয়াছিল। সে বৃহত্তর মিথিলায় প্রতিবাসী বাংলাদেশের

কতকাংশ এবং হিন্দীভাষী বিহারের কতকাংশ অন্তর্ভূত ছিল, ইহা খুবই সম্ভবপর। উত্তর কালে এই ভাব বন্যার ফলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। উত্তর ভারতের উপর দিয়া এই যে ভাব প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে উত্তর পশ্চিমে বল্লভাচার্য, সুরদাস, উড়িষ্যায় রায় রামানন্দ, আসামে শঙ্কর দেব প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব। এই সকল স্থানের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলনের সূত্র কিরূপ ছিল তাহার ইতিহাস আমরা সম্যক না জানিলেও ইহা নিঃসন্দেহ বলিতে পারা যায় যে, ইংরেজ আমলে প্রদেশ হইতে প্রদেশের যে কৃষ্টিগত ব্যবধান, তাহা সে সময়ে ছিল না।

সেইজন্য বিদ্যাপতি যখন গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি 'দেশী' ভাষাই প্রকাশের বাহনস্বরূপে ব্যবহার করিলেন। দেশী ভাষার মত মিষ্ট ভাষা আর নাই।

দেসিল ভাষা সবজন মিঠ্‌ঠা।
তে তৈসন জম্পও অবহট্‌ঠা। (জম্প-ও-জল্পনা করি)

আমাদের কবিও বলিয়াছেন:

নানান্ দেশের নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

গানের ভাষা শুধু যে দেশী হইবে তাহা নহে; ইহা সরল ও সুখবোধ্য হওয়া আবশ্যক। পাণ্ডিত্যপূর্ণ কট-মট ভাষায় কবিতা রচিত হইতেও পারে, কিন্তু গানে এরূপ ভাষা অচল। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি বৈষ্ণব কবিতার অন্যতম পথপ্রদর্শক, নিপুণ স্রষ্টা বিদ্যাপতি কেন এমন সুমধুর সহজ সরল ভাষায় পদরচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি পদে খাঁটি মৈথিল ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া এমন মনে করা যায় না যে তিনি কেবল তাঁহার মাতৃভাষার শব্দকোষ হইতেই কেবল তাঁহার গীতের শব্দ-সম্পদ্ আহরণ করিয়াছিলেন। এখনও মিথিলার কোনও কোনও অংশে বাংলা মিশ্রিত মৈথিল ভাষা ব্যবহৃত হয়, একথা বহুভাষাবিৎ গ্রীয়ার্সনই বলিয়াছেন।

বিদ্যাপতির শ্রোতৃমণ্ডল অল্পপরিসর ভূমিতে নিবদ্ধ ছিল না। বৈষ্ণবভাব-বিভাবিত বাংলা ও উত্তর-পশ্চিমও তাঁহার দৃষ্টি-পরিধির বাহিরে ছিল না, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

ইহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রমাণ বাংলার বৈষ্ণব কবিগণই যোগাইয়াছেন। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ঘনশ্যাম, বলরাম দাস প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির সুমিষ্ট ভাষা আয়ত্ত করিয়া তাহাতেই গীতরচনা করিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রগুপ্ত মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অন্য কোনও কবির এত অনুকরণ হয় নাই যত অনুকরণ হইয়াছিল বিদ্যাপতির। আমাদের বাঙ্গালী কবির ভাষাকে সাধারণতঃ ব্রজবুলি নামে আখ্যাত করা হয়। ইহা যে বিদ্যাপতির অনুকৃতি, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এক ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মনে করিয়া বসিয়া আছি যে, এই ব্রজবুলি বাঙ্গালীরই সৃষ্ট এক কেতাবী ভাষা এবং ইহা বিদ্যাপতির মৈথিলীর ভ্রান্ত অনুকরণ।

বস্তুতঃ আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিগণের প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিকতর অবিচার কল্পনা করা যায় না। এই সকল কবি একাধারে অপূর্ব কবি-প্রতিভাসম্পন্ন ও পাণ্ডিত্য-মণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা বিদ্যাপতির অনুকরণ করিতে যাইয়া ভুলের বোঝা বহিয়া আনিবেন, এরূপ কল্পনা অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। এই সকল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-মণ্ডিত ব্যক্তি মৈথিলের ভ্রান্ত অনুকরণ করিয়া তাহাতে এমন সুন্দর কবিতা রচনা করিবেন, ইহা কোনও মতে বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষতঃ এই অনুকরণ বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উড়িষ্যায় রায় রামানন্দ গোবিন্দ দাস প্রভৃতির পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

বিদ্যাপতির ভাষায় যে উদারতা দেখিতে পাই, তাহা দেশকাল পাত্রের বিবেচনা ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা যাইবে না। স্কট্‌ল্যাণ্ডের কবি বার্ণস্ (Burns) যেমন তাঁহার প্রাদেশিক ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির

ন্যায় সৃষ্টিকুশল প্রথম শ্রেণীর কবি যে তাহাই করিবেন, এরূপ অনুমান সমর্থনযোগ্য নহে।

বিদ্যাপতির যে কয়েকটি পদ গ্রীয়ার্সনের মারফতে আমরা পাইয়াছি, তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি পদ আছে যাহা ব্রজবুলি হইতে বহুদূরে নহে। ইহা বিদ্যাপতির 'মুখবন্ধে' আমি বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। তার পর নগেন্দ্র বাবু যে দুইখানি পুথি দেখিয়া তাঁহার পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একখানি পুথি নেপালে পাওয়া যায়, অপরখানি (তালপত্রের পুথি) মিথিলার অন্তর্গত তরৌনী গ্রামে তিনি প্রাপ্ত হন। প্রবাদ এই যে, এই পুথিখানি বিদ্যাপতির পৌত্রের লেখা। সে যাহাই হউক, এই দুইখানি পুথিতে বহু পদ পাওয়া যায় যাহা গোবিন্দদাস বা বলরাম দাসের ব্রজবুলি পদ হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত নহে।

বিদ্যাপতির প্রায় দুইশত কি আড়াই শত বৎসর পরে মিথিলার লোচন কবি 'রাগতরঙ্গিণী' নামে একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ সংকলন করেন। ঐ পুস্তকের মুখবন্ধে লোচন লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি মিথিলার অপভ্রংশ ভাষায় প্রথমে গীত রচনা করেন। সুমতি নামে একজন কায়স্থ উত্তম কথক ও গায়ক ছিল। তাহার পুত্র জয়তঃ বিদ্যাপতির নিকট তাঁহার পদাবলী গান করিতে শিক্ষা করে। লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে বিদ্যাপতির অনেকগুলি গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল গীতের কয়েকটিতে যে সহজ সরল ভাষার প্রয়োগ দেখিতে পাই, তাহাকে ব্রজবুলিই বলিতে ইচ্ছা হয়।

বস্তুতঃ বিখ্যাত ব্রজবুলির ন্যায় ভাষা বিদ্যাপতি স্বয়ং সৃষ্টি না করিলে, ইহা কখনই পরবর্তী কবিগণ কর্তৃক অনুসৃত হইত না। বাংলায় যশোরাজ খান, উড়িষ্যার রায় রামানন্দ, আসামে শঙ্কর দেব যে সুমধুর ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা বিদ্যাপতির দ্বারাই উদ্‌ভাবিত ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

বিদ্যাপতির নামে কতকগুলি খাঁটি বাংলা পদ এদেশে প্রচলিত আছে।

যথা 'মরিব মরিব সখি', 'শুনলো রাজার ঝি', ইত্যাদি। এই পদগুলি অবশ্য বিদ্যাপতির রচিত নহে। কিছু দিন পূর্বে শ্রীযুক্ত ডাঃ সুকুমার সেন সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় বিদ্যাপতির কতকগুলি অপ্রকাশিত রাগাত্মিক বাংলা পদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল পদের প্রকৃত রচয়িতা কে? যদি বিদ্যাপতির মৈথিল পদকে আমরা বাঙ্গালী সাজ পরাইতাম, তাহা হইলে সবগুলি পদই বাংলা হইত। কাজেই মনে হয়, কোনও বাঙ্গালী কবি বিদ্যাপতির নাম দিয়া নিজের পদ চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ প্রথা সব দেশেই প্রচলিত আছে—বাইবেলে পর্যন্ত মোজেজের নামে অপরের রচনা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের নামেও অজ্ঞাতনামা কবিরা কবিতা লিখিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন আবিষ্কার করিয়াছেন যে, শ্রীখণ্ডের একজন কবি 'ছোট বিদ্যাপতি' আখ্যা পাইয়াছিলেন এবং বাংলা পদগুলি তাঁহারই রচিত। তিনি কবিরঞ্জন ও রঞ্জন এই নামে পরিচিত ছিলেন এবং বিদ্যাপতি ছিল ইঁহার উপাধি।

ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতাগানে ঘুচয়ে দুর্গতি॥

এই কবি কোনও সময়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় 'শ্রীরঞ্জনঃ সর্বকলানিধানঃ।' কিন্তু তিনি যে বিদ্যাপতির নাম দিয়া পদ লিখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কোথায়? পদকল্পতরুতে এবং রসমঞ্জরীতে যে 'কবিরঞ্জন' ভণিতা যুক্ত পদ আছে, তাহা যদি এই রঞ্জন কবির হয়, তবে ত ইনি কবিরঞ্জন নামেই পদ লিখিয়াছেন। বিদ্যাপতি নামে পদ লিখিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হয় কিরূপে? বাংলা পদগুলির বিদ্যাপতি-ভণিতা দেখিয়া অনুমান করিতে হয় যে, এই রঞ্জন কবি যিনি কবিরঞ্জন ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন এবং যাঁহার 'ছোট বিদ্যাপতি' বলিয়া

খেয়াতি' ছিল, তিনিই নিশ্চয় এই বাংলা পদের রচয়িতা বিদ্যাপতি। এরূপ অনুমানের মূল্য কতখানি, তাহা বলা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে শেখর রায় শেখর রচিত অনেক পদ স্থান পাইয়াছে। (নগেন্দ্র গুপ্তের সংস্করণ) :গেন্দ্র বাবু বলেন যে বিদ্যাপতির উপাধি ছিল কবি শেখর। সুতরাং ়খর ভণিতা যুক্ত পদগুলিকে বিদ্যাপতির পদ বলিয়া তিনি ধরিয়া লইয়াছেন। ন্দ্র শেখর বা রায় শেখর নামে একজন কবি শ্রীচৈতন্যের পরে আবির্ভূত ইয়াছিলেন। তাঁহার দণ্ডাত্মিকা পদাবলীতে শেখর ভণিতার অনেক পদ দ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলিতে চৈতন্যের প্রভাব ও তাঁহার প্রচারিত প্রম-ভজনের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। কাজেই সেগুলি ব্রজবলির পদ হইলেও ়দ্যাপতির রচিত কখনও হইতে পারে না।

চম্পতি নামে আর একজন বৈষ্ণব কবির পদ বিদ্যাপতির বলিয়া দাবী রা হইতেছে। চম্পতি নাকি বিদ্যাপতির আর একটি নাম ছিল! (নগেন্দ্র ়প্ত) দুই একটি পদে চম্পতি বিদ্যাপতি এই যুগ্ম নামও দেখা যায়। ম্পতির ব্রজবুলি পদগুলি অতি সুন্দর। সেগুলিকে বিদ্যাপতির পদের ন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত মুদ্রের টীকায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, চম্পতি রায় একজন গৌরভক্ত, ও ্রতাপরুদ্র নরপতির পরম ভাগবত মহাপাত্র ছিলেন। অনুমান হয় যে ায় চম্পতি, বিদ্যাপতি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি কি বৈষ্ণব ছিলেন?

নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, 'বিদ্যাপতি পরম শৈব ছিলেন, বৈষ্ণব ছলেন না। মিথিলার সর্ব্বত্র তাঁহার রচিত শিব ও গৌরীর গান শুনিতে াওয়া যায়, লোকমুখে রাধা-কৃষ্ণের গীত অল্প।' ইহার উত্তরে বলা াইতে পারে যে, গ্রীয়ার্সন কর্তৃক মিথিলা হইতে যে ৮২টি বিদ্যাপতির ়দ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৭৬টি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক; একথা

নগেন্দ্র বাবুও স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এ পর্যন্ত বিদ্যাপতির ে সকল পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে হরগৌরী সম্বন্ধীয় পদ ৫০ী বেশী নহে, অথচ রাধা-কৃষ্ণ পদের সংখ্যা এক হাজারের কম নহে। ইহা কি বিদ্যাপতির বৈষ্ণবধর্ম-প্রীতির ফল নহে? বিদ্যাপতি তরুণ বয়ে কবিত্বের জন্য যে বিসপী গ্রাম দান স্বরূপ পাইয়াছিলেন এবং তাহার সে নবজয়দেব উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহা কি হরগৌরী পদাবলীর জন্য বিদ্যাপতি জয়দেবকে অনুসরণ করিয়া পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন এব তাঁহার চিত্ত সেই রসে ভরপূর ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই তবে ইহাও ঠিক যে ঐ সময়ে শৈবও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে কোনও দ্ব ছিল না। বিদ্যাপতির পদ হইতেও তাহা বুঝা যায়—

ভণই বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী।
ও নারায়ণ ও শূলপাণি॥

আপাততঃ বিপরীত শুনাইলেও ইহা নিশ্চয়, যিনি নারায়ণ তিনি শূলপাণি। সুতরাং ইহা কোনও ক্রমেই বলা চলে না যে বিদ্যাপ বৈষ্ণব ছিলেন না। বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিে এই ভ্রম বিদূরিত হইতে বিলম্ব হইবে না।

মাধব, বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল এদেহ সমর্পিল
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

অথবা
হে হরি বন্দো তুয়া পদ-নায়।
তুয়াপদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হোয়ব কওন উপায়॥

এরূপ আকুতিভরা প্রার্থনা ও দৈন্য আর কোনও কবির পদে পাও যায় না।*

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীর ভূমিকায় দ্রষ্টব্য (২য় সংস্ক মুখবন্ধ পৃঃ ১০)।

বিদ্যাপতির প্রেম

সাধারণতঃ চণ্ডীদাসকেই আমরা প্রেমের কবি বলিয়া জানি। প্রেমের এমন পূজারী বুঝি আর হয় নাই! বিদ্যাপতিকে আমরা রূপের কবি বলিয়াই জানি। চণ্ডীদাসের প্রেম আধ্যাত্মিক, বিদ্যাপতির প্রেম রূপজ, এমনই ভাবে আমরা এই দুই প্রেমিক কবির মধ্যে তুলনায় সমালোচনা করিয়া থাকি। [চণ্ডীদাসের প্রেম সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রেমের তিনি ছিলেন প্রধান সাধক, পিরীতির চারণ কবি। প্রেমের মহিমা তাঁহার মত আর কোনও কবিই প্রচার করিতে পারেন নাই।

আঁখির নিমিষে যদি নাহি হেরি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

প্রেম অমূল্য নিধি—স্পর্শমণি, মণিমাণিক্য হইতেও অমূল্য। প্রেমাস্পদকে চোখের আড় করিতে ইচ্ছা হয় না, পাছে হারাইয়া যায়। তাহাকে স্পর্শমণির মত হার গাঁথিয়া গলায় পরিতে সাধ হয়। মিলনেও শঙ্কা যায় না। তাই,

দুহুঁ কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

এ প্রেমের তুলনা নাই। কবি নিজেই বলিতেছেন—

জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥

সত্যই মানুষে এমন প্রেম কি হয়? কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেন ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
হেন প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥

ভাগ্যগুণে যদি এই প্রেম হয়, তাহা হইলে বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না।

বিদ্যাপতিও বলিতেছেন:

এ সখি অপুরুব রীতি।
কহাহুঁ ন দেখিঅ অইসনি পিরীতি ॥

হে সখি, এ এক অপূর্ব ব্যাপার, কোথাও এমন পিরীতি দেখি নাই বিদ্যাপতির রাধিকা বলিতেছেন প্রিয়তম গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ থাকিয়াও চমকিয়া উঠেন। আমি একটু পাশ ফিরিলেই অমনি মান করিয়াছি আশঙ্কায় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠেন।

ঘুমক আলসে জদি পলটি হোউ পাস।
মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস ॥

বিদ্যাপতি প্রেমের যে উপমা দিয়াছেন, তাহাও প্রেমকে বহু উর্ধ্বস্তরে স্থাপন করিয়াছে। প্রেম অতল স্পর্শ রহস্য—অথচ মধুরিমার অফুরন্ত নির্ঝর! কবিরা নানাভাবে যেমন ইহার মাধুর্য বিকশিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, তেমনি ইহার রহস্য উপমা উৎপ্রেক্ষার দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে প্রেম ইন্দ্রিয়জ সুখের সমতল হইতে উর্ধ্বে উঠিতে পারে না, তাহাকে বৈষ্ণবেরা 'কাম' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাম ও প্রেমের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার প্রসিদ্ধ পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন:

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

এই সংজ্ঞা সর্ববাদিসম্মত হউক বা না হউক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রেমের বিভিন্ন স্তরভেদ বৈষ্ণব কবিরা যেমন বুঝাইতে চাহিয়াছেন এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

কবিরাজ গোস্বামী যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার মূল অনুসন্ধানে আমরা আমাদের জাতীয় কবি চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কাব্যে উপনীত হই। চণ্ডীদাস যাহা তাঁহার সরল তরল ভাষার তুলিকায় ধরিতে পারেন নাই, তাহাও উপমার দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

ভানু কমল বলি সেও হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে ॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি সে নহে তুল।
না আইসে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥

প্রেমের দুরবগাহ রহস্য এখানে আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে উপমাও তাহার নাগাল পাইল না।

বিদ্যাপতি চাতক ও জলদের উপমায় সুন্দর মাধুর্য পরিবেশন করিয়াছেন:

সহজে চাতক না ছাড়য় বরত
না বৈসে নদি তীরে।
নব জলধর বরিখন বিন্দু
না পিয়ে তাহারি নীরে ॥

চাতক নবীন জলদের জল ব্যতীত অন্য জল পান করে না—তাহার ব্রত ত্যাগ করে না। পিপাসায় নদীতীরে গিয়া বাস করে না। যদি দৈবাৎ তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়, তবে হয়ত একটু জল পান করিতে পারে, কিন্তু চাহিয়া

থাকে সেই মেঘেরই পানে। সেইরূপ তোমার প্রেমাস্পদ অতি দুঃখে তোমার নাম স্মরণ করিয়া শতধারে অশ্রু বিসর্জন করেন।

যদি দৈব বশে অধিক পিয়াস
পিবয় হেরয়ে থোর !
তবহুঁ তোহার নাম সুমরি
গলয় শতগুণ লোর ॥

প্রেম যে শুধু ক্ষুধিত প্রাণের বুভুক্ষা মাত্র নহে, ইহা যে জীবনের ব্রত, অচল, অপ্রকম্প তাহাই বিদ্যাপতি সুন্দর উপমার দ্বারা বুঝাইয়াছেন। উপমাটি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহাতে যে ভাবের পরিবেশ আছে, তাহাই বিদ্যাপতির কাব্যের বিশিষ্টতা সম্পাদন করিয়াছে।

বিদ্যাপতির আরও একটি প্রচলিত উপমার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। প্রেমের রহস্যটি উপমানের রহস্যে যে গাম্ভীর্য্য লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। সখী বলিতেছেন, যে প্রেমের উপমার জন্য সারা বিশ্ব খুঁজিলাম কিন্তু ক্ষীর ও নীরের সম্বন্ধের ন্যায় আর একটিও দেখিলাম না।

খোঁজল সকল মহীতল গেহ।
খীর নীর সম না হেরল নেহ।

প্রেমের এমন উপমাস্থল আর নাই। কারণ যদি কেহ ক্ষীর অগ্নিমুখে স্থাপন করে এবং কাঠি দিয়া নাড়িয়া জল 'মারে,' তাহা হইলে (জলের সঙ্গে দুগ্ধের বিয়োগ ঘটিলে) ক্ষীর উথলিয়া আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ-ত্যাগ করিতে চাহে।

যব কোই বেরি অনল মুখ আনি।
খীর দণ্ড দেই নিরসত পানি ॥
তবহুঁ খীর উমড়ি পড় তাপে।
বিরহ বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে ॥

এমন প্রেম কোথায় আছে? দুগ্ধ যখন উথলিয়া আগুনে পড়ে, তখন

যদি কেহ একটু জল সেই দুগ্ধে দেয়, অমনি বিরহবিয়োগ দূরে যায় এবং ক্ষীর শান্তভাব ধারণ করে।

যব কোই পানি আনি তহি দেল।
বিরহ বিয়োগ তবহি দূরে গেল॥
ভনই বিদ্যাপতি এহেন সুনেহ।
রাধা মাধব ঐসন নেহ॥

রাধামাধবের প্রেমের এমন উপমা চণ্ডীদাসও দিতে পারেন নাই। বিরহের পরে মিলনেরও যে চিত্র বিদ্যাপতি আঁকিয়াছেন, তাহা অন্য কোনও কবির কাব্যে পাই না।

রাধা বদন নিরখি রহু কান।
ভাবে ভরল অঙ্গ ধরল ধিয়ান॥

কৃষ্ণ অনিমিষে প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবে (রোমাঞ্চ, স্বেদ, অশ্রু ইত্যাদি) তাঁহার অঙ্গ পূর্ণ হইল, তিনি ধ্যানে আত্মহারা হইলেন। যাহাকে পাইবার জন্য প্রাণে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে দেখিয়া বক্ষে ধারণ করিবার কথা কৃষ্ণ ভুলিয়া গেলেন। তখন রাই কিন্তু তাঁহার মনের কথা বুঝিলেন, অমনি বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

রাহী বুঝল তনু মরমক বোল।
বাহু পসারি কাহ্নু কর কোর॥

কীর্ত্তনানন্দের এই পদটিতে বিদ্যাপতির ভণিতা নাই। কিন্তু পদটি যে বিদ্যাপতির সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আর একটি ভণিতাযুক্ত পদে ইহা অপেক্ষাও গভীরতর ভাব রহিয়াছে। বিরহের পর মিলনে দুজনেই চিত্রপুত্তলীর মত স্থির হইয়া রহিলেন, সম্ভাষণ নাই, আলিঙ্গন নাই—এ প্রেমের ধারা কেমন কে বলিতে পারে!

চীত পুতলি জনু রহু দুহু দেহ।
ন জানিয় প্রেম কেহন অছু নেহ॥

এ প্রেমের গতি বুঝা ভার, নিকটে থাকিয়াও কেহ কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না।

এ সখি দেখ দুহুক বিচার।
ঠামহি কোই লখই নাহি পার॥

শ্রীমতী সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সখি আমার শ্যাম কই? যাঁহার প্রেমে পাগল হইয়া আমি বনে আসিলাম, তিনি কই? আমি যে সমস্ত বৃন্দাবনময় শ্যাম দেখিতেছি—সকল কানন ভরিয়া যে শ্যামরূপ, তাঁহার নিকট আমি কেমন করিয়া যাইব? তিনি কি আমার সুখদুঃখের কথা বুঝিবেন?

ধনি কহ কাননময় দেখিয় শ্যাম।
সে কিয়ে শুনব মঝু পরিণাম॥

কৃষ্ণের অবস্থাও তদ্রূপ। তিনি রাইকে দেখিয়াও দেখিতেছেন না। প্রতি তরুতলে রাধিকার মূর্তি দেখিতেছেন—আর যেদিকে নয়ন ফিরাইতেছেন সেই দিকেই রাইরূপ দেখিয়া চমকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন:

চউকি চউকি দেখি নাগর কান।
প্রতি তরুতল দেখ রাই সমান॥

যে প্রেমে বিশ্বময় প্রেমাস্পদকে নিরীক্ষণ করে, তাহা যে ইন্দ্রিয়-গ্রামের অনেক উর্ধ্বে, একথা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্তি॥

ইহা পাঠ করিবার সময় বিদ্যাপতির 'কাননময় দেখিয় শ্যাম' মনে পড়িবেই।

বিদ্যাপতির অভিসার

পদাবলী সাহিত্যে বহু অভিসারের পদ আছে। অলঙ্কার শাস্ত্রে নায়িকা-প্রকরণে যে অষ্ট প্রকার নায়িকার কথা আছে, অভিসারিকা তাহাদের মধ্যে অন্যতমা। বিশ্বনাথ বলেন:

অভিসারয়তে কান্তং যা মন্মথ-বশংবদা।
স্বয়ং বাভিসরত্যেষা ধীরৈরুক্তাভিসারিকা ॥

—সাহিত্য দর্পণ।

অর্থাৎ অভিসারিকা দুই প্রকার: যে নায়িকা মন্মথবশীভূতা হইয়া কান্তকে নিজের নিকট আনয়ন করে এবং যে নায়িকা নিজেই কান্তের নিকট গমন করে। শ্রীরূপ গোস্বামীও ঐ দুইপ্রকার অভিসারিকার কথাই বলিয়াছেন।

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি

—উজ্জ্বল নীলমণি।

কিন্তু পদাবলীতে দ্বিতীয় প্রকার অভিসারিকার বর্ণনাই বেশীর ভাগে পাওয়া যায়। অমরকোষেও এই প্রকার অভিসারিকার কথাই বলা হইয়াছে:

কান্তার্থিনী তু যা যাতি সংকেতং সাঽভিসারিকা।

সংস্কৃত কাব্যে স্বয়ং অভিসারকারিণীর উদাহরণটি উপভোগ্য:

উৎক্ষিপ্তং করকঙ্কণদ্বয়মিদং বদ্ধা দৃঢ়ং মেখলা
যত্নেন প্রতিপাদিতা মুখরয়োর্মঞ্জীরয়োর্মূকতা।
আরব্ধে রভসাম্ময়া প্রিয়সখি! ক্রীড়াভিসারোৎসবে
চণ্ডালস্তিমিরাবগুণ্ঠনপটক্ষেপং বিধত্তে বিধুঃ ॥

—সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত।

করকঙ্কণ উর্ধ্বে তুলিয়া (মণিবন্ধের উপরে উঠাইয়া) তাহাকে নিঃশব্দ করিয়াছি। মেখলা (কিঙ্কিণী) দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়াছি (যাহাতে শব্দ না হয়) ; নূপুরদ্বয়ের নিঃশব্দতা যত্নে সম্পাদন করিয়াছি ; কিন্তু প্রিয় সখি ! আমার এই অভিসারোৎসবে চন্দ্র চণ্ডালের ন্যায় আচরণ করিয়া তিমিরাবগুণ্ঠন অপসারিত করিল ! (এখন আমি কি করিয়া যাই ?)

এই শ্লোক জয়দেবের প্রসিদ্ধ পংক্তি 'মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং' স্মরণ করাইয়া দিবে। চাঁদ যে অভিসারে বাধা জন্মায়, তাহা বিদ্যাপতির রাধা অন্তরে অন্তরে বুঝিতেছেন।

চন্দা জনু উগ আজু কি রাতী।
পিয়াকে লিখিঅ পঠাওব পাতি ॥
অথবা রাহু বুঝাএব হঁসী।
পিবি জনি উগিলহ সীতল সসী ॥
কোটি রতন জলধর তোহেঁ লেহ।
আজুক রয়নি ঘন তম কএ দেহ ॥

চাঁদ, আজ রাত্রিতে তুমি উদিত হইও না। প্রিয়কে আজ (অভিসারের কথা) লিখিয়া চিঠি পাঠাইব।...অথবা রাহুকে হাসিয়া বুঝাইব যে শীতল চন্দ্রকে পান করিয়া তুমি আর উদ্গীরণ করিও না (চন্দ্র যেন আর না উঠে)। হে মেঘ, তুমি কোটি রত্ন গ্রহণ কর, আজিকার রজনী ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া দাও।

চন্দা ভলি নাহি তুঅ রীতি !
এহি মতি তোহে কলঙ্ক লাগল
কুছ ন গুনহ ভীতি ॥

... ...

এক মাস বিহি তোহি সিরিজএ
দএ সকলও বল।

দোসর দিন পুনু পূর ন রহসি
এহী পাপক ফল ॥

চাঁদ তোর ব্যবহার ভাল নহে, এই জন্যই তোর কলঙ্ক লাগিল, তোর নে কিছুমাত্র ভয় নাই।…বিধাতা তোকে এক মাস বসিয়া সৃষ্টি করেন, মস্ত শক্তি দিয়া (পূর্ণ করেন), কিন্তু দ্বিতীয় দিন আর তুই পূর্ণ থাকিস্ না, ৃই তোর পাপের ফল।

দূতী কৃষ্ণকে বলিতেছেন, হে মাধব, রাধা কত কষ্ট করিয়া তোমার নিকট াসিল,

প্রেম হেম পরখাওল কসোটি
ভাদব কুহু-তিথি রাতি ॥

ভাদ্রের কুহু (অমাবস্যা) রজনীরূপ কষ্টিপাথরে প্রেমরূপ স্বর্ণের পরীক্ষা হইল। রাত্রি কজ্জল বমন করিতেছে (চারিদিক মসীলিপ্ত হইয়াছে) (পথে) ভীম সর্প, দুর্বার বজ্রপাত হইতেছে, সে গর্জনে মনে ত্রাস হইল। মেঘ কুপিত হইয়া জলধারা বর্ষণ করিতেছে ; অভিসারে সংশয় পড়িয়া গেল। …সর্প চরণে বেষ্টন করিল, (ভালই হইল) নূপুরের শব্দ আর হয় না।

ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরস চিহ্নিঅ ভূমি
দিগমগ উপজু সন্দেহ।
হরি হরি সিব সিব তাবে জাইহ জিব
জাবে ন উপজু সিনেহ।

(যাইতে যাইতে) ঘুরিয়া ঘুরিয়া একই স্থানে আসি, (অন্ধকারে) হাতড়াইয়া স্থান চিনি, দোলায়মান চিত্তে সংশয় হয় (ঠিক পথে যাইতেছি ত ?) ; হরি হরি ! যতদিন প্রেম উৎপন্ন না হয়, ততদিন বাঁচিয়া থাকা ভাল (তারপর নয়)।

নলিনী দল নিয় চিত ন রহএ থির
তত ঘর তত হো বহার।

বিহি মোর বড় মন্দা উগি জনু জাএ চন্দা

সুতি উঠি গগন নিহার ॥

পথহু পথিক সঙ্কা পয় পয় ধএ পঙ্কা

কি করতি ও নব তরুণী।

চলএ চাহ ধসি পুমু পড় খসি খসি

জালক ছেকলি হরিণী ॥

মাধব, রাধার চিত্ত নলিনীদলগত জলের মত অস্থির; যত না ঘরে যায়, তত বাহিরে আসে (তুলনীয়: ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়—চণ্ডীদাস)। বিধাতা বড়ই মূর্খ, পাছে (বিধাতার চক্রে) চন্দ্র উদিত হয়, এই জন্য শুইতে যাইয়াও (পুনঃ পুনঃ) উঠিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখে। পথে যাইতে কোনও পথিকের সঙ্গে হয় ত দেখা হইবে, এই আশঙ্কা হয়, পদে পদে পঙ্ক ধরে (তাহাতেও গ্রাহ্য করে না), নব যুবতী (রাধা) কি যে করে (ভাবিয়া পায় না)! দ্রুত চলিতে চায়, কিন্তু আবার আছাড় খাইয়া পড়ে (পিছল পথে) জালে বাঁধা হরিণীর মত।

বিদ্যাপতি এইভাবে যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন, তাহা রূপে, রসে অতুলনীয়। অভিসারের পদে বিদ্যাপতিরই প্রিয় শিষ্য গোবিন্দ দাস দুই শতাব্দী পরে তাঁহাকেই অনুকরণ করিয়া অমর পদাবলী রচনা করিয়াছেন। অনেক সময়ে পংক্তিতে পংক্তিতে এই শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয়ের পদের তুলনা চলে। অভিসার-পদে প্রধান আস্বাদ্য—অনুরাগ। বিঘ্নসমাকুল রজনীতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তরুণী নায়িকা প্রিয়তমের সহিত মিলনের জন্য কি অসাধ্য সাধন করিতেছেন, তাহাই অভিসারে পদাবলীর মুখ্যরস। অভিসারিকা নায়িকা অবলম্বনে বিদ্যাপতির বহু পদ রহিয়াছে। রাধামোহন ঠাকুর ও পদামৃত সমুদ্রের টীকায় বলিয়াছেন—"শ্রীবিদ্যাপতি ঠক্কুর কৃত গীতপ্রাচুর্যবশাৎ।"

এই অনুরাগ সম্বন্ধে বিদ্যাপতির একটি পদ আছে, যাহার তুলনা কোথাও পাই না। শ্রীমতী যমুনায় স্নান করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কেলিকদম্বে

ইলন দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছা যে, একবার সেই অনুপম রূপমাধুরীসমন্বিত নটবর-শেখরকে দর্শন করেন।

নহাই উঠল তীর রাই কমল মুখি
সমুখে হেরল বরকান।
গুরুজন সঙ্গ লাজে ধনি নতমুখি
কৈসন হেরব বয়ান॥
সখি হে, অপরুব চাতুরি গোরি।
সব জন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি॥
তঁহি পুন মোতি হার তোড়ি ফেঁকল
কহইত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম-দরস ধনি লেল॥

সঙ্গে গুরুজন, লজ্জায় তাঁহাকে নতমুখী হইয়া থাকিতে হইল; (ভাবিতেছেন) কেমন করিয়া প্রিয়তমের বদন দেখিবেন। কিন্তু সুন্দরীর অপরূপ চাতুরী। তিনি (ছল করিয়া) সকলের আগে গমন করিলেন এবং নিজের গলার মুক্তা হার ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। (সকলকে ডাকিয়া) বলিলেন—আমার হার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। (এই কথা শুনিয়া) সকলে (যমুনাতটের বালুর মধ্যে) একটি একটি করিয়া সেই মুক্তা খুটিয়া তুলিতে লাগিল। (সেই অবসরে) শ্রীমতী শ্যামদর্শন করিয়া লইলেন।

এই অপূর্ব পদটির পরেও যদি কেহ বলেন যে, বিদ্যাপতির পদ কেবল প্রেমের কবিতা, রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ তাহাতে অল্প, তাহা হইলে আমাদের আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে?

এই বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হইবে, বিদ্যাপতির একটি মিলনের পদ

হইতে। অভিসারের পরেই মিলন। মিলনের প্রকৃতি দেখিয়া 'অভিসার সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণায় উপনীত হওয়া যাইতে পারে .

দুহু মুখ হেরইত দুহু ভেল ধন্দ।
রাহী কহ তমাল মাধব কহ চন্দ॥
চিতপুতলী জমু রহু দুহু দেহ।
ন জানিঅ প্রেম কেহন অছু নেহ॥
এ সখি দেখ দেখ দুহুক বিচার।
ঠামহি কোই লখই নাহি পার॥
ধনি কহ কাননময় দেখিঅ শ্যাম।
সে কিএ শুণব মঝু পরিণাম॥
চউকি চউকি দেখি নাগর কান।
প্রতি তরুতর দেখ রাহী সমান॥

দুইজন দুইজনকে দেখিয়া সন্দেহে পড়িলেন। রাই বলিলেন—এ কি তরুণ তমাল! মাধব বলিলেন—এ কি চাঁদ (উঠিল)। দুইজনেই চিত্রপুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। (এক সখী অপরকে বলিতেছেন) —সখি দেখ দেখ দু'জনের কি বিচার! নিজের নিকটই, অথচ কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। ধনি বলিল 'এ কি। আমি যে কাননময় শ্যাম দেখিতেছি, আমার দশা সে কি ভাবিবে? (আমি যে অনুরাগে আত্মহারা হইয়া জাতি-কুল-মান বিসর্জন দিয়া আসিলাম, কিন্তু আমার সেই প্রেমাস্পদ কই? এ যে বহু শ্যাম)। নাগর চমকিয়া চমকিয়া দেখিতেছেন—প্রতি তরুতলে রাই দাঁড়াইয়া (যাহার জন্য সঙ্কেত-কুঞ্জে আসিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছি, আমার সে প্রিয়তমা কোন্‌টি?)!

এই পদটির ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম না-পাওয়া গেলেও, সন্দেহের বেশী অবকাশ, বোধ হয়, নাই। কেননা, বিদ্যাপতির বহু পদে শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ছলনা

নবঅনুরাগিণী নানা ছলে প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু সংসারে প্রতিকূলতা এবং বাধাও বহু। কাজেই প্রেমিকাকে অনেক-ক্ষেত্রে চতুরতার আশ্রয় লইয়া পরিত্রাণ পাইতে হয়। এই চতুরতা লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়াছে; মিথিলায় তাহার নাম 'লাথ'। লাথ অর্থে ছলনা। বিদ্যাপতির একটি কবিতা এইরূপ লাথের সুন্দর নিদর্শন :

জাহি লাগি গেলি হে তাহি কহাঁ লইলি হে
তা পতি বৈরি পিতু কাহাঁ।
অছলি হে দুখ সুখ কহহ অপন মুখ
ভুসন গম ভেলহ জাহাঁ॥
সুন্দরি, কি কএ বুঝাওব কন্তে।
জহিকা জনম হোইত তোহে গেলিহু
অইলি হে তহিকা অন্তে॥
জাহি লাগি গেলহু সে চলি আএল
তেঁ মোয় ধাএল লুকাঈ।
সে চলি গেল তাহি লএ চলিলিহু
তেঁ পথ ভেল অনেআঈ॥
সঙ্কর-বাহন খেড়ি খেলাইত
মেদিনি-বাহন আগে।
জে সব অছলি সঙ্গ সে সব চললি ভঙ্গ
উবরি আএলহুঁ অতি ভাগে॥
জাহি দুই খোজ করইছথি সাসুহি
সে মিলু আপনা সঙ্গে।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
গুপুত নেহ রতি-রঙ্গে॥

ননদিনী বধূকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন : তুই যার জন্যে গিয়াছিলি, তা আনিলি কই ? (অর্থাৎ ঘাটে জল আনতে গিয়াছিলি, জল না নিয়া আসিলি কেন ?) আর সেই জলের পতির শত্রুর পিতা কোথায় ? (জলের পতি= সমুদ্র ; সমুদ্রের বৈরি=অগস্ত্য ; তাহার পিতা=ঘট) অর্থাৎ ঘট কোথায় ফেলিয়া আসিলি ? যেখানে ভূষণ (বা অঙ্গরাগ) খোয়াইয়া আসিলি, সেখানে কি রকম সুখে দুঃখে ছিলি, নিজমুখে বল। সুন্দরি, কি বলে' কান্তকে বুঝাবি ? যাহার জন্ম হতে তুই গেলি, তার শেষে তুই আসিলি (অর্থাৎ সেই কোন্ সকালে গিয়াছিস্, আর ফিরিয়া আসিলি দিনান্তে।)

তখন বধূ উত্তর করিতেছেন : যা আনতে গিয়েছিলাম, সে এসে পড়িল (জল অর্থাৎ বৃষ্টি এলো) ; সেজন্য ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সে চলে গেল), তখন পথে আসতে অন্যায় (বিলম্ব) হলো। (বিলম্বের কারণ আর কিছু নয়) দেখি, পথে ষাঁড়ের (শঙ্করবাহন) লড়াই বেধে গেছে—আর একদিকে এক সাপ (মেদিনী-বাহন)। যারা সব সঙ্গে ছিল তারা পলায়ন করলো। আমি অতিভাগ্যে বেঁচে এসেছি। শাশুড়ী যে দুইয়ের খোঁজ করছেন, তারা আপনার সঙ্গে মিলিল (অর্থাৎ মাটীতে পড়িয়া ঘট চূর্ণ হইয়া মাটীর সঙ্গে এবং ঘাটের জল বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশিল)।

ছেলে বেলায় একটি সারি গানে এইরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক ছলনার দৃষ্টান্ত পাইয়াছিলাম। গানটি আমাদের অঞ্চলে (যশোহর) পল্লীবাসীর মুখে সেকালে খুব শোনা যাইত। গানটি আমার যত দূর মনে পড়ে তাহাই বলি :

ওলো ছোট বউ, সাঁঝের বেলা।
জল আনতি ঘাটে গেলি ফুল পালি কনে ?
ছান করতে গিয়েছিলাম শান বাঁধা ঘাটে ;
ভাসে যাতি চাঁপা ফুল তুলে দিলাম কানে।
ওলো ননদী, সাঁঝের বেলা।

ওলো ছোট বউ, সাঁঝের বেলা।

তোর চুল কেন আ'লো-থালো গাল কেন ফুলো।

ফুলের সঙ্গে ভ্রমর ছিল অধরে দংশিল।

ওলো ননদী, সাঁঝের বেলা।

*   *   *   *   *

আমাদের দেশের ভাষা হইলেও বুঝিতে বোধ হয় কষ্ট হইবে না। অত ছেলে বেলায় গানের কথা এবং তাহার ইঙ্গিত যত বুঝি আর না বুঝি, সুরটি মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল; সারি গানের সহজ মিষ্টত্ব থাকায় সুরটি অতি মধুর।

ছলনা কিন্তু নাগরীগণের একচেটিয়া নহে। নাগরদেরও অনেক সময়ে ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। বৈষ্ণব পদাবলীতে এইরূপ বিপদাপন্ন নায়কের এক সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। পদটি শশিশেখরের এবং অনেকেরই সুপরিজ্ঞাত। তাহা হইলেও ঐ পদটি এখানে উদ্ধৃত করি:

নীলোৎপল শ্রীমুখ মণ্ডল

ঝামর কাহে ভেল।

মদন জরে তনু ভাতল

জাগরে নিশি গেল॥

'খণ্ডিতা'য় শ্রীকৃষ্ণ যখন সারা নিশি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কাটাইয়া প্রভাতে শ্রীরাধার কুঞ্জে দর্শন দিলেন, তখন শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিতেছেন: তোমার নীলকমল সদৃশ মুখখানি আজ এত ঝামর বা বিরস হইল কি জন্ত? 'শ্রীকৃষ্ণের উত্তর—তোমার বিরহে জর্জর হইয়া সারা নিশি জাগরণে কাটাইয়াছি।

শ্রীরাধা: নখ নির্ঘাত- ক্ষত বক্ষসি

দেয়ল কোন নারী।

শ্রীকৃষ্ণ : কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত ‘
তোহে ঢুড়ইতে গোরি ॥
শ্রীরাধা : সিন্দুর কাহে অলকা পরি
চন্দন কাঁহা গেল।
শ্রীকৃষ্ণ : গিরি গোবর্দ্ধন গোরিক সেবি
সিন্দুর শিরে নেল ॥

গিরি গোবর্দ্ধনে গিয়া (তোমার জন্য) গৌরীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদী সিন্দুর কপালে পরিয়াছি।

শ্রীরাধা : নীলাম্বর তুহু পহিরলি
পীতাম্বর ছোড়ি।
শ্রীকৃষ্ণ : অগ্রজ সঞে পরিবর্তিত
নন্দালয়ে ভোরি ॥

তুমি আজ নীলাম্বর পরিয়াছ, এ কি ব্যাপার? তুমি ত চিরদিন পীতাম্বরধারী! শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, নন্দালয়ে (বাড়ীতে) আমি আর বলাইদাদা এক সঙ্গে শুইয়াছিলাম। ভোরে উঠিয়া আসিয়াছি, ভুল করিয়া দাদার নীলাম্বরখানি পরিয়া আসিয়াছি!

শ্রীরাধা : অঞ্জন কাঁহে গণ্ডস্থলে
হৃদি খণ্ডন অধরে।
উত্তর প্রতি- উত্তর দিতে
পরাজয় শশিশেখরে।

শশিশেখর উত্তর দিতে পারেন নাই; কিন্তু গোবিন্দদাসের একটি পদে ইহারও সমাধান আছে; ধৃষ্ট নাগর বলিতেছেন:

কাজর ভরমে মরম কিয়ে গঞ্জসি
মৃগমদ-পদ পুন এহ।

সুন্দরি, তুমি কাজল বলিয়া ভুল করিতেছ, কিন্তু ইহা কাজল নহে, মৃগমদকস্তুরি। শোভার জন্য পরিয়াছি। আর হৃদয়ে যে রক্তিমচিহ্ন দেখিতেছ, উহা গৈরিক চিহ্ন। তোমারই বিরহে আমার হৃদয় সংসার বিবাগী হইয়া উঠিয়াছে :

গৈরিক হেরি বৈরি সম মানসি
উরপর যাবক ভানে।

রায় রামানন্দ

সংস্কৃত নাটকের মধ্যে রায় রামানন্দ-কৃত জগন্নাথবল্লভ নাটক সুপরিচিত। শ্রীচৈতন্যদেব যে সকল গ্রন্থ আস্বাদন করিতেন, জগন্নাথ-বল্লভ তাহাদের অন্যতম—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২য়

এই পংক্তি দুইটির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাপ্রভুর আস্বাদ্য কাব্য বা গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি সংস্কৃতে রচিত ; বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দ এবং রামানন্দ-প্রণীত জগন্নাথবল্লভ নাটক। সমস্তই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রসিদ্ধ, সে জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই দুই কবির কোনও গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া শুধু কবির নাম উল্লেখ করিলেন। রামানন্দের

জগন্নাথবল্লভ নাটকের নাম করা হয় নাই বটে; কিন্তু তাহার কারণ এই যে, জগন্নাথ-বল্লভের আর একটি নাম রামানন্দ-সঙ্গীত নাটক।

শ্রীরামানন্দ রায়েণ কবিনা তত্তৎগুণালঙ্কৃতং শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-
নাম গজপতি প্রতাপরুদ্রপ্রিয়ং রামানন্দসঙ্গীতনাটকং নির্মায়…

—জগঃ-বঃ ১ম অঙ্ক।

আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাঁহার নাটক, তাঁহাকে লইয়াই মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন। এখানে 'রামানন্দ' বলিতে অবশ্য রায় রামান্দকেই বুঝিতে হইবে। নীলাচল-লীলায় স্বরূপদামোদরের ন্যায় রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী ছিলেন।

এই নাটকখানি মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের সাক্ষাতের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, ইহাতে নান্দী বা মঙ্গলাচরণে নূপুরশোভিত চরণ, নৃত্যপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি আছে, শ্রীচৈতন্যের বন্দনা নাই। গোদাবরীতটে উভয়ের মিলনে যে প্রেমের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, তাহাতে রামানন্দ গৌরাঙ্গময় হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ঐ ঘটনার পর রামানন্দ রায়ের পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা না করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

রামানন্দ রায় ছিলেন, গজপতি প্রতাপরুদ্রের অধীনে এক জন প্রধান রাজপুরুষ, তাঁহার রাজধানী ছিল বিদ্যানগর—বর্ত্তমান রাজমাহেন্দ্রী। ইঁহার পিতা ভবানন্দ রায় এক জন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তবে তিনি বিদ্যানগরের অধীশ্বর ছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। সতীশচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে, ভবানন্দ রায় বিদ্যানগরের অধীশ্বর ছিলেন। মৃণালকান্তি ঘোষ তাঁহার গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, রায় ভবানন্দ যে রাজা ছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। মৃণাল বাবু সম্ভবতঃ জগন্নাথবল্লভের "পৃথ্বীশ্বরস্য শ্রীভবানন্দ রায়স্য" লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু ভবানন্দ যে বিদ্যানগরের রাজা ছিলেন, তাহাও প্রমাণিত হয় না।

রামানন্দ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক নরপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, রায় রামানন্দের স্তায় তিনিও লীলারসিক বিদগ্ধজন ছিলেন। কবি তাঁহাকে "নিরুপম-কান্তি-লক্ষ্মী-লুব্ধ-লক্ষ্মী-রমণাবস্থানোচিত চিত্তভৃঙ্গাঙ্গিনা বিভাবাদি পরিণত রস-রসালমুকুল-রসাস্বাদ-কোবিদপুংস্কোকিলেন শ্রীকণ্ঠহার সহচরগুণ মুক্তা-ফলমণ্ডিতহৃদয়েন" বলিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠহার অর্থাৎ (শ্রীরাধাকণ্ঠহারের যিনি সহচর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার গুণরূপ মুক্তাফলে ভূষিত হইয়াছে হৃদয় যাঁহার)।

তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, শ্রীচৈতন্ত নীলাচলে গমন করিবার পূর্বে প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। যে কারণে লক্ষ্মণ-সেনের রাজ-সভায় জয়দেব গীতগোবিন্দ গান করিয়া তাঁহার আশ্রয়দাতার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই নীলাচলের বিখ্যাত স্বাধীন ভূপতি প্রতাপরুদ্রের রাজ-সভায় রায় রামানন্দ জগন্নাথ-বল্লভ নাটক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকের মতে গজপতি প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্তের প্রভাবে পতিত হইয়া রাজধর্মপালনে উদাসীন হইয়াছিলেন, এবং বৈষ্ণবধর্মই তাঁহার পরাজয়ের কারণ। কিন্তু রায় রামানন্দ তাঁহার আশ্রয়দাতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঐ ধারণার অনুকূল নহে।

গজপতি প্রতাপরুদ্র মহারাজ পুরুষোত্তম দেবের পর ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৫৪০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রামানন্দ তাঁহার প্রশস্তি উচ্ছ্বসিত ভাষায় গ্রথিত করিয়াছেন। যথা 'প্রতাপরুদ্রের পরাক্রমে সেকেন্দর (সেকন্দর লোদি ১৪৮৯-১৫১৭) ভীত হইয়া গিরিকন্দরে পলায়ন করিয়াছেন, কলবর্গ (গুলবর্গ) দেশের ভূপতি তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষার জন্ত আশঙ্কিত হইয়াছেন, গুর্জরের (গুজরাটের) রাজা তাঁহার রাজ্য অরণ্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করিতেছেন এবং গৌড়-ভূপতি বাত্যাতাড়িত অর্ণবপোতের আরোহীর স্তায় ব্যাকুল হইয়াছেন।' এরূপ পরিচয় হইতে মনে হয় যে, তখনও বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়ের হস্তে

প্রতাপরুদ্রের পরাজয় ঘটে নাই। কৃষ্ণদেব রায় শুধু যে উড়িষ্যাধিপকে পরাজিত করেন তাহা নহে, বিদ্যানগর দুর্গ ধ্বংস করেন। মাদলাপঞ্জী অনুসারে এই ঘটনা ১৫০৫ খৃস্টাব্দে ঘটে। তাহা হইলে ইহার পূর্বেই জগন্নাথবল্লভের রচনা হইয়াছিল বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। রায় রামানন্দ নিজে একজন রাজা ছিলেন,—কেহ কেহ বলেন, করদ রাজা ছিলেন,—কাজেই তাঁহার প্রশংসা গতানুগতিক প্রশস্তি-পাঠের ন্যায় না হওয়াই স্বাভাবিক।

এই সময়ে বঙ্গে হোসেন শাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৫১৫ খৃস্টাব্দে মুসলমানগণ উড়িষ্যা আক্রমণ করে। উড়িষ্যার ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা কটক (প্রতাপরুদ্রের রাজধানী) পর্যন্ত গিয়া শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভয়ে জগন্নাথের মূর্তি চটক পর্বতে লইয়া লুকানো হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপরুদ্র সসৈন্যে দাক্ষিণাত্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ত্বরান্বিত হইয়া ফিরিলেন এবং মুসলমানগণকে গড় মান্দারণ পর্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন। এই ঘটনার পরে জগন্নাথবল্লভ রচিত হইলে নিশ্চয়ই সে কথা নাট্যকার লিখিতে ভুলিতেন না। সেকন্দর লোদি একজন ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষের জন্য হিন্দু নরপতিগণ নিশ্চয়ই তাঁহাকে ভাল চোখে দেখিতেন না। কাজেই তাঁহার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে হিন্দু লেখকের কলমে যোগ্যই হইয়াছে বলিতে হইবে। গুলবর্গে বাহমণি রাজবংশের শেষ রাজা বিরাজ করিতেছিলেন। আত্মরক্ষায় তিনি তৎপর ছিলেন না বলিয়াই মনে হয়। কারণ, কৃষ্ণদেব রায় মহাশয় এই রাজাকে পরাজিত করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে এই জগন্নাথবল্লভ নাটক আস্বাদন করিতেন, তাহা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে এই নাটকখানির বৃত্তান্ত তিনি অবগত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। নীলাচলে আসিবার দুই মাস পরেই বৈশাখ মাসে

প্রভু যখন দক্ষিণ ভ্রমণে গমন করেন, তখন সার্বভৌম মহাশয় তাঁহাকে গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥
পাণ্ডিত্য ভক্তিরস দুয়ের তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৭ম

এতদিন তাঁহাকে বুঝি নাই, তিনি বৈষ্ণব, ভক্তিরসের অধিকারী রসিক; ইহা লইয়া তাঁহাকে কত পরিহাস করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে তোমার প্রসাদে বুঝিলাম যে তিনি কত বড়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই রায় রামানন্দ বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে বা শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী কালে বা সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিচার-প্রসঙ্গে কোনওখানে জগন্নাথবল্লভের নাম কেহ করেন নাই। ইহার কারণ কি? রায় রামানন্দের পক্ষে ইহা বৈষ্ণবোচিত বিনয় হইতে পারে। কিন্তু রূপগোস্বামী বা মহাপ্রভুও ত ইহার উল্লেখ করিতে পারিতেন। মহাপ্রভুর যে এই নাটক ভাল লাগিত সে প্রমাণ ত আমরা পাইয়াছি। আরও প্রমাণ পাইতেছি যে, রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া আদর করিতেন:

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্যরস।—ঐ, মধ্য, ২য় পরি

অর্থাৎ কবি, ভক্ত, রসিক ও দার্শনিক রামানন্দ তাঁহার রাজ্যবৈভব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সখ্যে বশীভূত

করিলেন। রায় রামানন্দের বৈরাগ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, সনাতনেরই ন্যায় তাঁহার ত্যাগের মহিমা।

তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ তৈছে তার রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য, ১ম

রূপগোস্বামীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠীর উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু একজনের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা এবং অপরের অপূর্ব রসানুভূতি প্রকাশ করিবার সুযোগ দিলেন। রস-প্রবীণ রামানন্দ প্রশ্ন-কর্তা, রূপ উত্তরদাতা, মহাপ্রভু স্বয়ং বিচারক এবং অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, স্বরূপগোস্বামী, সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতি পণ্ডিত ও রসজ্ঞগণ শ্রোতা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ইষ্টগোষ্ঠীর বর্ণনায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। প্রশ্ন ও তাহার উত্তর উভয়ই সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য; উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্টীকৃত না হইলে ইহার মধ্যে প্রবেশ করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য ছিল। এই ইষ্টগোষ্ঠীর বিবরণ কতটা প্রকৃত ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জানিবার উপায় নাই তবে কবিরাজ গোস্বামীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের সার্থকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই এই ব্যাপারে আমাদের অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই ইষ্টগোষ্ঠীতে আমরা দুই জন বিখ্যাত কবি ও দার্শনিকের যে পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিচয় পাইতেছি, তাহা সহজ সত্যের আভায় উজ্জ্বল। স্বরূপ দামোদর সভাস্থ লোকের সমক্ষে রূপগোস্বামীর বিখ্যাত নাটকদ্বয় বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবের পরিচয় দিতেছেন; তাহার পূর্বে এই নাটকদ্বয় অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয়। রাম রায় রূপকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন, আর রূপগোস্বামী সবিনয়ে তাহার উত্তর দিতেছেন। যেখানে স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য, সার্বভৌম ভট্টাচার্য উপস্থিত, সেখানে রামানন্দ কেন প্রশ্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, ইহা প্রণিধানযোগ্য। বস্তুতঃ রসের বিচারে

জগন্নাথবল্লভ নাটক-রচয়িতা রাম রায়ই যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য, ইহা মহাপ্রভু নিশ্চয়ই জানিতেন এবং সভাস্থ সকলেরও যে ইহা অনমুমোদিত নহে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। রূপগোস্বামীর উক্তিতে এই সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে :

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার॥
রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্যোপম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ॥

—ঐ, অন্ত্য, ১ম

এই বিনয়-প্রকাশ শ্রীরূপের পক্ষে যে অত্যন্ত শোভন হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ, জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের একমাত্র সমসাময়িক তুলনাস্থল বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব। শ্রীকৃষ্ণলীলা লইয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা নাটক নহে, কাব্য। রূপগোস্বামীর নাটকদ্বয় শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলায় উল্লিখিত হইলেও ললিতমাধব সম্পূর্ণ হইতে আরও কিছু সময় লাগিয়াছিল। বিদগ্ধমাধব সম্পূর্ণ হয় ১৫৩২ এবং ললিতমাধব ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে। সুতরাং জগন্নাথবল্লভ নাটক যে তাহার বহু পূর্বে লিখিত হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পূর্বেই যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যশঃ পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এইমাত্র অনুমান করা যায়। জগন্নাথবল্লভে সূত্রধার বলিতেছেন যে, তিনি এমন একটি প্রবন্ধ প্রণয়ন করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন যাহা সম্পূর্ণ অভিনব অর্থাৎ যাহাতে অন্য কোনও পুরাতন প্রবন্ধের ছায়া না থাকে।

অভিনবকৃতিমন্যচ্ছায়য়া নো নিবদ্ধং…

ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রূপগোস্বামীর বিখ্যাত নাটকদ্বয়ের পূর্বেই জগন্নাথ-বল্লভ রচিত হইয়াছিল।

শ্রীরূপ ও রায় রামানন্দের কবিতার সমালোচনার স্থল ইহা নহে। তবে

নান্দী শ্লোকে উভয়ে যে দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভঙ্গী দেখিলে ইঁহাদের ক্রম বুঝা যায় :

জগন্নাথ-বল্লভ :

ন ভবতু গুণগন্ধোঽপ্যত্র নাম প্রবন্ধে
মধুরিপুপদপদ্মোৎকীর্ত্তনং নস্তথাপি।
সহৃদয়হৃদয়াপ্তানন্দসন্দোহহেতু-
র্নিয়তমিদমতোঽয়ং নিষ্ফলো ন প্রয়াসঃ॥

এই প্রবন্ধে গুণলেশও না থাকিতে পারে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সম্বন্ধে আমাদের এই কীর্তন সহৃদয় ব্যক্তির প্রচুর হৃদয়ানন্দের কারণ হইবে অতএব, এই প্রয়াস কখনও নিষ্ফল হইবে না।

বিদগ্ধ-মাধবে যথা—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃ-কলুষতাম্॥

হে পণ্ডিতগণ! আমি স্বল্প-বুদ্ধি হইলেও আমার কবিতা আপনাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে; কেন না, অতি নিকৃষ্ট পুলিন্দ বা শবর কর্তৃক কাষ্ঠঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি কি কাঞ্চন-সমূহের অন্তর্মালিন্য বিনাশ করে না?

কবিত্বের দিক্ দিয়া তুলনা করিলে শ্রীরূপগোস্বামীকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। বস্তুতঃই রূপের তুলনা নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্যে জগন্নাথ-বল্লভের কবি অপেক্ষা রূপগোস্বামী যে বহু গুণ অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা কে না স্বীকার করিবে? তবে রূপগোস্বামীর উপর রায় রামানন্দের কাব্য কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সম্যক্ আলোচিত হয় নাই

জগন্নাথ-বল্লভে রাধা পরকীয়া নায়িকা,* রূপগোস্বামীর নাটকেও তাহাই।' বিদগ্ধমাধবে মুখরা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "চঞ্চল! অভিমন্যোঃ সহধর্মিণী পত্নী তব বন্দনীয়া।" শ্রীরাধা অভিমন্যুর পত্নী অতএব তোমার নমস্যা।

এই পরকীয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে উভয়ের ঐকমত্য কি আকস্মিক? অথবা রামানন্দের প্রভাবের ফল? জগন্নাথবল্লভে ললিতা বিশাখা নাই, রাধার সখীর নাম মদনিকা, শশিমুখী। মদনিকা এবং পৌর্ণমাসী উভয়েই বয়োজ্যেষ্ঠা এবং লীলার প্রধান প্রযোজনকর্ত্রী। জগন্নাথবল্লভের বিদূষক রতিকন্দল, রূপের নাটকে মধুমঙ্গলে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু গানের দিক্ দিয়া জগন্নাথবল্লভ যথেষ্ট জনপ্রিয়তার দাবী করিতে পারে! জগন্নাথবল্লভ পঞ্চাঙ্ক নাটক, যথা—পূর্বরাগ, ভাবপরীক্ষা, ভাবপ্রকাশ, রাধাভিসার ও রাধাসঙ্গম। প্রথম অঙ্কে ৪টি করিয়া ১২টি, ৪র্থ অঙ্কে ৫টি এবং পঞ্চম অঙ্কে ৪টি গান আছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি গান পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কীর্তনের আসরেও অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—কেলিবিপিনং প্রবিশতি রাধা; রাধা মধুর বিহারা (অভিসার); গোপকুমার সমাজমিমং সখি পৃচ্ছ কদানুগতোঽহং (রূপানুরাগ) ইত্যাদি।

এই গানের অনেকগুলিই জয়দেবের অনুকরণে রচিত। জয়দেবের প্রভাব কোন বৈষ্ণব কবিই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। জগন্নাথবল্লভের ন্যায় ক্ষুদ্র নাটকখানিতে বিংশত্যধিক গানের সমাবেশ দেখিলে জয়দেবের কথাই বেশী করিয়া মনে পড়ে। তবে জয়দেব যেমন শৃঙ্গার রসের মধ্য দিয়াই কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াছেন, রামানন্দ সেরূপ করেন নাই। পঞ্চম অঙ্কে (রাধাসঙ্গম) মাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার মদনিকার দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে; তাহাও বেশ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

---

* দয়িতো দয়িতস্তস্যা বালেয়ং কুলপালিকা।
অকাণ্ডে কিময়ৌ মুগ্ধে ধত্তামাচারবিপ্লবং॥
জঃ বঃ নাটক, ২য় অঙ্ক।

পূর্বেই বলিয়াছি, রামানন্দের ভাষায় জয়দেবের শব্দালঙ্কারের প্রভাব সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ

মঞ্জুতর গুঞ্জদলি কুঞ্জমতি ভীষণং।
মন্দ মরুদন্তরগ গন্ধ কৃত দূষণং ॥

অথবা, রাধিকে পরিহর মাধবে রাগময়ে ইত্যাদি পদ লওয়া যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের প্রভাব রাম রায়ের কাব্যে না থাকিবারই কথা। কারণ, চণ্ডীদাস বাঙালী কবি। তথাপি তাঁহার রাধাপ্রেমের আকুতি দেখিলে চণ্ডীদাসের কথা মনে না হইয়া পারে না। বিশেষ যখন তিনি বলিতেছেন :

তস্মঞ্চে বিরহে নবৈব বিধুরা কান্তস্য যোগে যথা।

চণ্ডীদাসের অমর চিত্র 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' অবশ্যই মনে পড়িবে। বিদ্যাপতির প্রভাবও রায় রামানন্দের উপর লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার প্রেমবিলাসবিবর্তের পদটি

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।

নিশ্চয়ই বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত। রায় রামানন্দ গানে যে অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন, এ সম্বন্ধে সংশয় নাই। তাঁহার গানগুলির জনপ্রিয়তার ইহাও একটি হেতু। আর একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি সেইজন্যই তাঁহার সংস্কৃত গানগুলিকে বাংলা রূপ দিতে অনুপ্রেরিত হইয়াছিলেন। জগন্নাথ-বল্লভের শ্লোক ও সঙ্গীত অবলম্বন করিয়া লোচনদাস ৪০টি পদ রচনা করিয়াছিলেন। পদগুলি অতি সুললিত এবং স্থানে স্থানে কাব্য-সৌন্দর্যে মূল কবিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। লোচনদাসের পদেও ব্রজবুলি ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার ৪০টি পদের মধ্যে ১৩টি ব্রজবুলি লক্ষণাক্রান্ত।

রায় রামানন্দের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার সংলাপে, যেখানে তিনি মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে সাধ্যের স্থাপন করিতেছেন। অদ্যাপি এই সাধ্যসাধনতত্ত্ব বৈষ্ণবসমাজে ভক্তিধর্মের দৃঢ় ভিত্তি বলিয়া গণ্য হয়। বস্তুতঃ এই প্রসিদ্ধ

সাধ্যসাধনতত্ত্ব-বিচারের ন্যায় প্রেমধর্ম্ম-ব্যাখ্যা আর কোথায়ও দেখা যায় না। রায় রামানন্দ ছিলেন 'রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের সীমা।' কাজেই তাঁহার এই তত্ত্বব্যাখ্যা বৈষ্ণব-ধর্মের নির্যাস বলিয়া আদৃত হইয়াছে।

এই সুপরিচিত সাধ্য-বিচারের মধ্যে মাত্র দুইটি বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। প্রথমতঃ, কান্তা-ভাবের ভজন এই প্রথম স্পষ্টভাবে অঙ্গীকৃত হইল। ভগবান যে প্রিয়তম এ কথা বৃহদারণ্যক এবং নারায়ণীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। ব্রজের গোপীরা যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণকান্তরূপে ভজনা করিয়াছিলেন, ইহাও শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভক্তিধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল তাহাতে মধুর বা উজ্জ্বল রসের স্থান স্বীকৃত হয় নাই। সেইজন্যই শ্রীচৈতন্য যে ভক্তি-সাধনা প্রবর্ত্তিত করিলেন তাহাকে 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' বলা হইয়াছে। তিনি মধুর রস-সমন্বিত ভক্তির প্রবর্ত্তক, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে তাহার প্রেরণা এই দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে আসিয়াছিল ইহা না মানিয়া উপায় নাই।*

দ্বিতীয়তঃ এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি পদ গান করেন :

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জনি॥ ইত্যাদি

এই পদটির ব্যাখ্যায় অনেক কথক এবং অনেক সুধী সমালোচক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, 'না সো রমণ' ইত্যাদির দ্বারা বিপরীত বিহারের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। রায়

---

* অধুনালুপ্ত 'উদয়ন' পত্রিকায় (কার্ত্তিক, ১৩৪১) বাংলার প্রেমধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধে আমি ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছিলাম। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ উদয়নে (পৌষ, ১৩৪১) তাহার প্রতিবাদ করেন; আমার প্রত্যুক্তি (বসুমতী বৈশাখ, ১৩৪২) দ্রষ্টব্য।

রামানন্দ এখানে কান্তা-প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া এমন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থার আভাস দিতেছেন, যেখানে কান্ত ও কান্তা, নায়ক ও নায়িকা, ভক্ত ও ভগবান একাত্ম হইয়া যান; কোনও রূপ ভেদ থাকে না, ইহাই কান্তা প্রেমের চরম পরিণতি। +

বৈষ্ণবদের এই প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত এক অপূর্ব্ব বস্তু। রায় রামানন্দ যেরূপ ভয়ে ভয়ে ইহা ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, প্রেমের এই অভেদতত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ় এবং রহস্যমণ্ডিত মর্ম্মকথা। কান্তা-প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া বক্তা মনে করিলেন যে, এ প্রসঙ্গের ইহাই চরম হইল। কিন্তু

প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার॥
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥

সন্দেহ-দোলায়িত রায় রামানন্দ ইহারই ব্যাখ্যাস্বরূপ নিজকৃত এক পদ গাহিলেন: 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।' এই গান শুনিয়া মহাপ্রভুর প্রশ্ন নিরস্ত হইয়া গেল। তিনি উদ্যত-ফণ অজগরের ন্যায় দুলিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে—

প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।

'প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত' অর্থে এখানে এমন একটি অবস্থার ইঙ্গিত করা হইতেছে তত্ত্ব হিসাবে যাহার উপরে আর নাই। 'বিবর্ত্ত' অর্থে ভ্রম, অর্থাৎ যেমন শুক্তিতে মুক্তাভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম। প্রেমের জগতে ভেদ—ভ্রম, অভেদই—সত্য অর্থাৎ প্রেমবিলাসে যে দ্বৈতত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাথমিক

+ প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে (আষাঢ় ১৩৪৪) আমি যে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ যে প্রত্যুত্তর (ভাদ্র, ১৩৪৪) দিয়াছিলেন তাহা দ্রষ্টব্য।

প্রেমের পরাকাষ্ঠা হয় তখন, যখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের আর কোনও ভেদ থাকে না।

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

এই অভেদতত্ত্বই প্রকটিত হইয়াছে 'রসরাজ মহাভাবে'র একত্বে। 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।' (চৈঃ চঃ) এই রসরাজ মহাভাবের জীবন্ত বিগ্রহ রায় রামানন্দের সম্মুখে বিরাজমান। অর্থাৎ রামানন্দ সর্ব্বশেষে যখন রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে গৌরাঙ্গতত্ত্বে আসিয়া পড়িলেন, তখন মহাপ্রভু স্বহস্তে প্রেমে তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। * এই

ব্যাধিকরণতয়া বানন্দবৈবশ্যতো বা
প্রভুরথ করপদ্মেনাস্যমস্যাপ্যধত্ত।

—চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকং, ৭ম অঙ্ক

কবিকর্ণপূর বিপ্রের মুখ দিয়া সার্ব্বভৌমের প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলাইয়াছেন কিন্তু এই তত্ত্ব অতি নিগূঢ়। এখানে কবি কর্ণপূর ইহাকে চাপা দিয়াছেন মাত্র।

— ৪র্থ শাখা —

পদাবলী

বাদল-অভিসার

বর্ষার ঘনায়মান মেঘপুঞ্জ দেখিলে প্রণয়ীর চিত্ত আকুল হয়। বাদল মেঘ সেই জন্য প্রেমের কাব্যে অমর হইয়া আছে। প্রিয়াবিরহ-কাতর যক্ষের নিকট ধূমজ্যোতিঃ-সলিল-মরুৎ-সন্নিপাতমাত্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রেমের যোগ্য দূতরূপে বৃত হইয়াছিল। ঘটকর্পরও মেঘকে দূত করিয়া প্রোষিত-ভর্ত্তার উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জয়দেব তাঁহার অমর কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন মেঘেরই পুণ্য নাম লইয়া। 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং' স্মরণ করিলে আজিও নীল যমুনার কূলে তমালবনরাজি-শ্যামলিত মেঘ-মেদুর সন্ধ্যার একখানি সুন্দর চিত্রপট নয়নসম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

আর তেমন মেঘ করে না কি? তেমন করিয়া গুরু গুরু দেয়া ডাকে না কি? কই, এখন আর তেমন করিয়া পরাণবন্ধুয়া আঙ্গিনার কোণে প্রণয়িনীর জন্য বৃষ্টির ধারার মধ্যে দাঁড়াইয়া ত প্রতীক্ষা করেন না!

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোণে বন্ধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

ঘরে গুরুজন, আমি যে তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া বাহির হইতে পারিলাম না। তিনি আমার জন্য আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া ভিজিয়া সারা হইলেন। কত কষ্ট তাঁহাকে দিলাম, তাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি।

ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যন্ত্রণা দিনু॥

আমি সঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে আনিয়া এত কষ্ট দিলাম! কিন্তু তিনি ত সে অসহ দুঃখকে দুঃখ মনে করেন না। আমার জন্য বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়াও তিনি সুখী! আহা, এমন প্রেম আর হয় না।

আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কয় বন্ধুর পীরিতি
শুনিয়া জগত সুখী॥

এই প্রীতি লইয়াই বৈষ্ণবের কাব্য। সামান্য নায়ক-নায়িকার নিতান্ত সাধারণ প্রেম উপলক্ষ্য করিয়া কখনও শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হইতে পারে না। রাধাকৃষ্ণের এ পীরিতির কথা শুনিয়া 'জগৎ সুখী'। এমন আর হয় না। মুরারি গুপ্ত চণ্ডীদাসেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন:—

খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপুতে কহে পীরিতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

প্রেমাস্পদ আহারে-বিহারে শয়নে-স্বপ্নে নিদ্রাজাগরণে যাহার চিত্তকে নিঃশেষে অধিকার করিয়াছেন, তাহার প্রেমের কথা শুনিতে শুনাইতে, বলিতে বলাইতে প্রাণ গলিয়া মধুময় হইয়া যায়। এই ত প্রেম। ইহার নাম শ্রীরাধা। যুগে যুগে মানব এই প্রেমের ধ্যান করিয়াছে, এই পীরিতের স্বপ্ন দেখিয়াছে—ইহারই নাম শ্রীরাধা।

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর ঝলগই॥

এমন দুর্দ্দিনে আমার প্রাণকান্ত সঙ্কেতকুঞ্জে গিয়াছেন। আমি কি গৃহের মাঝে বসিয়া আরাম করিতে পারি? আমাকে না গেলেই নয়। ঐ শুনিতেছ না, থাকিয়া থাকিয়া বাঁশী বাজিতেছে?

আজ ঐ বাঁশী শুনিয়া বোধ হইতেছে—নায়কের মনেও মাঝে মাঝে সন্দেহের দোলা লাগিতেছে—সুকুমারী বালিকা এই দুরন্ত বর্ষায় এত দূর পথ অতিক্রম করিয়া কেমন করিয়া আসিবে?

পাঁতর মা ভেল আঁতর বারি।
কৈছে পঙারব সো সুকুমারি॥—গোবিন্দদাস।

প্রান্তর আজ বর্ষার জলে অন্তর (সুদূর) হইয়া পড়িয়াছে—এই জল-প্লাবন অতিক্রম করিয়া সে সুকুমারী আসিতে পারিবে কি?

সখীরা শ্রীমতীকে নিষেধ করিতেছেন, এমন দুর্য্যোগে যাইও না। শেষে কি প্রেমের জন্য প্রাণ হারাইবে? গৃহের বাহিরে দুয়ার রুদ্ধ হইয়াছে। পথ পিছল, চলা শঙ্কাজনক। ঐ দেখ, দূর হইতে বর্ষা ঝাঁপিয়া আসিতেছে। দুরন্ত বর্ষায় কি তোমার সূক্ষ্ম নীল শাড়ীতে জল মানাইবে? অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অভিসারে যাইবে বলিয়া একখানি নীল শাড়ী পরিয়াছ, দেখিতেছি!

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥

আর সে ত এখানে নয়। মানসগঙ্গার অপর পারে—যেখানে তোমার

প্রাণবল্লভ আছেন, সে ত বহু দূর! সেখানে এমন দারুণ বর্ষায় কি যাওয়া যায়?

সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥*

শুধু তাহাই নহে; বর্ষার গতিক চাহিয়া দেখ। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মনে হয় যেন দশদিকে আগুন লাগাইয়া দিতেছে। চাহিয়া দেখিতেই চোখের মণি ঠিকরাইয়া যায়! ঐ শোন ঘন ঘন অশনিপাত। শুনিলেই প্রাণ কাঁপিয়া উঠে! এই দুর্যোগে অভিসারে যাইবে?

দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি যাত॥

কিন্তু হইলে কি হইবে? অনুরাগের গতিই বিচিত্র। সখীরা বুঝাইলে কি অনুরাগিণী ফিরিবে? কেহ যদি ধনুতে শর-যোজনা করে, তবে আকর্ণ সন্ধান করিলেও সে বাণ ধনুত্যাগ করিতে পারে, না-ও করিতে পারে। কিন্তু যে বাণ ধনুত্যাগ করিয়াছে, সে বাণকে আর কি শত চেষ্টা করিয়াও ফিরানো যায়?

গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

* রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। হরি মনোরাজ্যের অপর পারে বাস করেন, ইত্যাদি (বৃহৎবঙ্গ)। 'মানসগঙ্গা' নামে বৃন্দাবনে যে একটি সরোবর আছে, তাহা বোধ হয় তাঁহার স্মরণ ছিল না। বৈষ্ণবপদাবলীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অবশ্য সর্ব্বত্র করা যায়। কিন্তু তাহাতে কাব্যরস একেবারে উবিয়া যায়।

শ্রীমতী সখীদের কথায় তাঁহার অভিসার-সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি বলিলেন—

কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠ কি বাধা।
কুল মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥

কুলবতী সতী তাহার দুস্ত্যজ কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিল, আর কাঠের কবাট তাহার গমনে বাধা জন্মাইবে? কুলমর্য্যাদারূপ সিন্ধু আমি হেলায় গোষ্পদের ন্যায় পার হইলাম, আর ক্ষুদ্র তটিনী (মানসগঙ্গা) আমার নিকট দুস্তর হইবে? সখি, তোমরা আমার মন পরীক্ষা করিতেছ মাত্র; তোমরা ত আমাকে ভালরূপেই জানো, আর আমাকে পরীক্ষা করিও না। প্রিয়তম কি যে আকুল হৃদয়ে আমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে।

সখি হে মঝু পরীখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥

আমার জন্য ভাবিও না। কোটি কুসুম-শরে যাহার হৃদয় জর্জ্জরিত, বর্ষায় তাহার কি করিবে? যাহার হৃদয় বিরহ-দহনে অহর্নিশি পুড়িয়া ছাই হইতেছে, বজ্রপাত তাহার পক্ষে কি এতই কষ্টদায়ক? যাঁহার পদে আমার মন-প্রাণ তিল-তুলসী দিয়া সমর্পণ করিয়াছি, তাঁহার নিকট যাইতে দেহের কথা ভাবিব?

কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছুপর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরক আগি॥

যছু পদতলে হাম জীবন সোঁপলু

তাহে কি তনু অনুরোধ।

গোবিন্দ দাস কহই ধনি অভিসর

সহচরী পাওল বোধ।

তুমি অভিসার কর। আর কিছু বলিতে হইবে না; সখীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন।

আর তাঁহারা বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন না। শ্রীমতী তখন নূপুর খুলিয়া রাস্তার বাহির হইলেন। নূপুরের ধ্বনিতে প্রতিবেশী জাগিবে। আর প্রাণকান্তের জন্য অভিসারে মঞ্জীরের প্রয়োজন কি? শুধু গতি-বাধা জন্মাইবে বই ত নয়। যাহা কিছু বাধা জন্মাইতে পারে, বিলম্ব ঘটাইতে পারে, অনুরাগবতী সে সমস্ত একে একে পরিত্যাগ করিলেন। প্রথমে লীলাকমল ফেলিয়া দিলেন। পরে মস্তকের মোতির মালা খুলিয়া ফেলিলেন। তার পরে গলার মণিময় হার ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। 'দূর কর সোতিনী মোতিম হার।' কেবল নীল শাড়ীখানি অঙ্গে রহিল—অলঙ্কারের ভার হইতে মুক্ত হইয়া সুন্দরী অভিসারে চলিলেন।

রস ধাধসে চলু পদ দুই চারি।

লীলাকমল তেজল বরনারি॥

পরিহরি মৌলিক মালতি মাল।

তেজল মণিময় গীমক হার॥

* * *

বেশ-শেষ রহু নীলিম বাস।

মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

কিন্তু পথে নানা বিঘ্ন ঘটিল। 'তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর'—অমনি বিদ্যুৎ চমকাইল। অভিসারিণী মনে করিলেন, কেহ পথের ধারে স্ফটিকস্তম্ভ রোপণ করিয়াছে। পিছল পথ, পড়িতে পড়িতে স্ফটিকস্তম্ভ মনে করিয়া

বিদ্যুদ্দামবিদ্ধ বিপুল জলধারা ধরিতে গেলেন। উদ্যত-ফণ সর্পের মাথার মণি দেখিয়া মনে করিলেন বুঝি কেহ দীপ জ্বালিয়াছে—তাঁহার অভিসারে বাধা দিবার জন্য। অমনি বাম হস্তে সেই দীপ আবরণ করিলেন। কিন্তু [illegible] বুঝিলেন এ ত দীপ নয়, এ যে ভীষণ সর্পের মাথার মণি! তখনই [illegible] কাঁপিয়া উঠিল। বুঝি সাপের হাতে পড়িয়া আজ প্রাণ যায়! [illegible] ত দুঃখ নাই, কিন্তু বঁধুর সঙ্গে দেখা হইল না, এই বড় দুঃখ

[illegible]মিনি ফটিক তরু জানি
[illegible]নীর ধার রে॥
দীপ জলু জানি
[illegible]জানল যুবতি
সঘ[illegible]

কিন্তু বন্ধু ত নিশ্চিন্ত নাই। [illegible]ষ, তাঁহার প্রণয়পাগলিনী নিশ্চয়ই আসিবেন। [illegible]নিতে অগ্রসর হইলেন। অর্ধপথেই মিলন হইল। মিল[illegible] জানা কথা, গোবিন্দদাস ভাবিতেছেন যে, মিলন যখন [illegible] কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? দুষ্ট মন্মথ এইরূপে প্রেম পরী[illegible]

গুণি-গুণি আকুল চলল মুরারি।
মীলল আধ পথে বরনারী॥
গোবিন্দদাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরীখত মনমথ মন্দ॥

ঝুলন

হিন্দুদের পূজাপার্বণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কৃষি-কার্যের সঙ্গে তাহাদের কিছু-না-কিছু যোগ আছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কাজেই আমাদের আমোদ-প্রমোদ পূজাপার্বণ কৃষিকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়। রাবণবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে অকালবোধন করিতে হইয়াছিল ; সেই কারণে আমাদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা শরতেই সম্পন্ন হয়। রাবণবধের প্রয়োজনীয়তা থাক বা না থাক, ঐ সময়ে কৃষিজীবিগণের প্রচুর অবসর। সেইজন্য উৎসবের দেশব্যাপী আয়োজন। দুর্গাপূজার নাম সেইজন্য দুর্গোৎসব। অন্য কোনও পূজার এরূপ আনন্দবহ নামকরণ হয় নাই। দুর্গোৎসবের পরে পরপর লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, কার্তিকপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, নবান্ন প্রভৃতি।

বৈষ্ণবরা তাঁহাদের উৎসবের পরিকল্পনায় আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিকে তাঁহারা ধর্মকর্মের সঙ্গে গাঁথিয়া লইয়াছেন। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ বৈষ্ণবরা ধর্মের প্রয়োজনে কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রকে জুড়িয়া দিয়াছেন। যাঁহাদের দেবতা অখিলরসামৃতমূর্তি, ভজন যাঁহাদের 'রম্যা কাচিৎ উপাসনা', সাধ্য যাঁহাদের প্রেম—তাঁহাদের সৌন্দর্যবোধ কিছু প্রবল থাকিবে, ইহাই ত আশা করা যায়। বৈষ্ণবদের তিনটি প্রধান উৎসব তিন চন্দ্রমা-শালিনী পূর্ণিমা রজনীতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাবৃট্ পূর্ণিমায় ঝুলন, শারদীয়া পূর্ণিমায় রাস, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হোলি। ভগবানের এই তিনটি লীলাই মনোমুগ্ধকর। প্রত্যেকটিতেই আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়। সৌন্দর্য আনন্দের একটি অপরিহার্য উপাদান। সৌন্দর্যকে বাধা দিলে আনন্দের অনেকখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভক্ত ভগবানকে দেখেন প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে। 'যে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়াতীত,

অতীন্দ্রিয়, নয়নমনের অগোচর, তাহাতে ব্রহ্মবিদ্ পরমহংসগণ তৃপ্ত হউন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা হৃৎকর্ণ-রসায়ন, আপামর সাধারণ সকলের পক্ষেই মধুর। স্বভাবশোভাও সকলের উপভোগ্য, সকলেরই অধিগম্য। কাজেই এই স্বভাবশোভার মধ্যে ভগবানকে পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যদি ভগবদ্-ভক্তির উদ্দীপনা জোগাইতে না পারে, তবে আর কিসে পারিবে? আকাশে যখন রামধনু আঁকে, তখন মনে পড়ে সেই মোহনচূড়া। উপাস্য তখন নবমেঘের অন্তরালে রূপায়িত হইয়া উঠেন সেই ইন্দ্রধনুর অপরূপ রঙের বাহারে।

আকাশ চাহিতে কিবা
ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা।

—জ্ঞানদাস

যমুনার কালো জলে চাঁদের আলো পড়িয়া চিকমিক্ করিতেছে। অমনি ভক্তের মনে পড়িয়া গেল, কৃষ্ণের কালো অঙ্গে সোনার অলঙ্কারের কথা।

অভরণ বরণ কিরণে অঙ্গ ঢর ঢর
কালিন্দী জলে যৈছে চান্দকি চলনা।

—নয়নানন্দ

নীল আকাশে মেঘ করিয়াছে, তাহাতে বিদ্যুৎ খেলিতেছে। গোধূলি বেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে বকের সারি সেই আকাশের বুকে মালা দুলাইয়াছে (অভ্রস্তোরণস্রজাং—কালিদাস)। এমন সময় পূর্বাকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখা দিলেন। এ চিত্র কেমন লাগে? এই সৌন্দর্য স্মরণ করাইয়া দেয় না কি সেই ভগবানকেই, যাঁর নীলকান্তোপম অঙ্গে পীতবসন ঝলমল করিতেছে, যাঁহার সুপ্রসন্ন বক্ষে মালতীর মালা দুলিতেছে, যাঁহার ললাটে চন্দনবিন্দু শোভা পাইতেছে?

উজোর হার উর পীত বসন ধর
ভাল হি চন্দন বিন্দু।

মিলিত বলাকিনী তড়িত জড়িত ঘন
উপরে উজোরল ইন্দু ॥ —ঘনশ্যাম দাস

কেহ কেহ বলেন, বাংলা কবিতায় স্বভাব-শোভার বর্ণনা নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা পড়িলে সে ধারণা বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। ঝুলন লীলায় বর্ষার শোভা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সৌন্দর্য্যানুভূতির যে কোনও ত্রুটি আছে এমন বোধ হয় না। বর্ষার বর্ণনা বর্ষাভিসারেও আছে, স্বপ্নদর্শনেও আছে।

বর্ষাভিসারে, শ্রীমতী অভিসারে যাইতেছেন প্রকৃতির দারুণ বিপ্লবের মধ্যে :

দশদিশ দামিনী দহন বিথার
হেরইতে উচকই লোচন তার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি যাত ॥

—গোবিন্দদাস

সখীরা অনেক নিষেধ করিল। কিন্তু অভিসার ব্যাহত হইল না। শ্রীমতী চলিলেন :

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গগনে গরজে ঘন ঘোর —কবিশেখর

শ্রীমতী প্রাণবন্ধুকে স্বপ্নে দেখিলেন সে এক বর্ষার রজনীতে। 'স্বর্গে মর্ত্যে স্বপনের গুপ্ত আনাগোনা' বর্ষার নিবিড় নিশীথেই সবচেয়ে বেশী হয় বোধ হয়। মনে পড়ে, ইংরেজ কবি স্বপ্নের নিভৃত নিকেতন নির্মাণ করিয়াছেন বর্ষার বারিধারার মাঝখানে ; নিঝুম রাত, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, দূরে কুকুর ডাকিতেছে একঘেয়ে রবে, প্রতিধ্বনি মিলাইতেছে দূর আকাশের কোলে।* এই ত স্বপ্নের বিলাসভূমি। শ্রীরাধিকাও স্বপ্ন দেখিতেছেন এক

* Spenser : Faery Queene, Canto 1.

শ্রাবণ রজনীতে। গুরু গুরু মেঘ ডাকিতেছে, মন্দ মন্দ বৃষ্টিপাত হইতেছে, রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; ঝিল্লীর রবে নিস্তব্ধতা নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। দূরে পর্বতের উপর ময়ূরের কেকাধ্বনি শোনা যাইতেছে, ভেকের দল বর্ষার উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।

* * * *

শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁ ঝাঁ ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেনকালে॥

—জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব কবিরা শাঙন ঘন বিভাবরীর মোহে মুগ্ধ। কি মিলনে, কি বিরহে কবিমাত্রেরই মনে পড়ে বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ; যমুনার কূল, বনভূমি তমালচ্ছায়ায় শ্যামায়মান, রাত্রি সমাগত, মেঘে মেঘে গগন ছাইয়া গিয়াছে—কি চমৎকার পরিবেশ! রাধামাধবের নিভৃত কেলি-বিলাসের এমন সুন্দর উদ্দীপনময়ী প্রাকৃতিক অবস্থা আর হইতে পারে না। জয়দেবেরও বহুপূর্বে কালিদাস নির্বাসিত যক্ষকে এমনই এক বাদল ঘন সন্ধ্যায় বিরহের অশ্রুতে প্লাবিত করিয়াছিলেন। আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘাড়ম্বর দেখিয়া বিরহী যক্ষ ব্যাকুল, বিচলিত, বিভ্রান্ত হইয়াছিল। এমন প্রত্যাসন্ন শ্রাবণের বাদল দিনে প্রণয়িনী যাহার কণ্ঠলগ্না, সে ভাগ্যবানের হৃদয়ও কাতর হইয়া উঠে, সুদূর প্রোষিত কান্তের ত কথাই নাই! এই আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘবর্ষার বর্ণনা দেখিয়া আমার মনে হয় কবিকুলতিলক বাংলা দেশের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। বাংলা দেশ নহিলে পয়লা আষাঢ়ের স্নিগ্ধ মাধুরী আর কোথায়ও এমনভাবে অনুভব করা যাইত কি? যাহা হউক, কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে

মিলন ও বিরহের উদ্দীপক রূপে বর্ষাকে প্রেমের দেউলে চির-প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতিও এই বর্ষার ছবি এমন করিয়া আঁকিয়াছেন যে জগতে তাহার তুলনা মেলা কঠিন।

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘন দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥

বিরহ-বর্ণনায় এই বর্ষার সমাবেশ আরও সুন্দর হইয়াছে। শ্রীমতী আজ একাকিনী নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে কাটাইতেছেন। 'দোসর জন নাহি সঙ্গ।' এমন সময়ে বর্ষা নামিল। 'বরিষা পরবেশ, পিয়া গেও দুর দেশ, রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ।' প্রিয়সঙ্গ-লালসা প্রবল হইল।

সজনি আজু শমন-দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জিউ নিকসয়ে মোয়॥

প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রিয় যে কাছে নাই এমন বর্ষার নিশিতে, এ দুঃখের কি আর অবধি আছে?

সখি হে হামার দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

এই 'শূন্য মন্দির' কথাটির মধ্যে যেন জগতের হাহাকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে!

ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া॥

চারিদিকে মেঘ ঝাঁপিয়াছে ও মুহুর্মুহু গর্জন করিতেছে। ভুবন ভরিয়া বর্ষণ নামিয়াছে। আমার প্রাণকান্ত প্রবাসে রহিয়াছে আর দারুণ অনঙ্গ আমার প্রতি খরতর শর বর্ষণ করিতেছে। (ঐ বারিধারা আমাকে কন্দর্প-শরে জর্জরিত করিতেছে।)

কুলিশ কত শত পাত মুদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

এমন সুন্দরবোধ আর কোনও দেশের কবিতায় নাই। এরূপ শব্দচিত্র কোনও ভাষায় কখনও অঙ্কিত হয় নাই। 'হরি বিনে' এই দীর্ঘ দিন-রজনী কেমন করিয়া অতিবাহিত করিব? বিল্বমঙ্গল ঠাকুর আর এক দিন এমনই কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন:

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদলোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

হে হরি, তোমার অদর্শনে এই অধন্য দিনগুলি কিরূপে কাটাইব! হায় হায়! হে অনাথের বন্ধু, করুণার পারাবার, বলিয়া দাও বিরহের এই দীর্ঘ দিনগুলি কেমন করিয়া যাপন করিব?

যাক্ আজ বিরহের কথা আর বলিব না। ঝুলনলীলার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিরা যে মিলনের সুর গাহিয়াছেন, তাহারই এক আধটি তান যদি ধরিতে

পারি, সেই চেষ্টা করিব। যমুনার কূলে, বটতরুর ডালে নবীন লতা দিয়া সুন্দর একটি হিন্দোলা খাটানো হইয়াছে। তাহাতে নানাবিধ বর্ষার কুসুম দিয়া মনোহর সজ্জা করা হইয়াছে। ভ্রমরকুল ঝাঁকে ঝাঁকে সেই কুসুমপুঞ্জে পড়িতেছে, উড়িতেছে, গুন গুন করিতেছে। শুকপিকপাপিয়া সেই হিন্দোলা ঘিরিয়া ঘিরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে ও কলধ্বনি করিতেছে :

হিন্দোলা রচিত কুসুমপুঞ্জ
অলিকুল তাহে বিহরে গুঞ্জ
সারি শুক পিক বেঢ়ল কুঞ্জ
ঘেরি ঘেরি ঘেরি বোল রি।—

আজ পূর্ণিমা রজনী—'চাঁদ উজোর রাতিয়া'। মাঝে মাঝে মেঘ আসিয়া সে স্নিগ্ধ জোছনাকে মৃদুতর, স্নিগ্ধতর করিয়া দিতেছে—'গগন হি মগন স-ঘন রজনীকর আনন্দে করত নেহারি।' শুধু যে মেঘের দল আকাশের নীল সরোবরে সাঁতার দিতেছে আর তাহার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উঁকি দিতেছেন, তাহা নহে। অল্প অল্প বৃষ্টিও হইতেছে :

বৃন্দ সুন্দর নেনি নেনি।

এই 'নেনি নেনি' বৃষ্টির বালাই যাই! প্রাচীন সাহিত্যে কোথায়ও এই পিশ্ পিশ্ করা ইল্‌শে গুঁড়ির বর্ণনা দেখিতে পাই না! কিন্তু ঝুলনলীলার পক্ষে এমনই এক বর্ষার রাত্রি চাই—ঝড়ঝঞ্ঝা দুর্যোগ চাই না।

বারিদ গরজি গরজি সব ঘেরল
বুন্দ বুন্দ করু পাত।
কহ শিবরাম মলয়াচল ছুহু পর
মৃদু মৃদু করতহি বাত॥

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির সঙ্গে মলয় সমীরণ বহিতেছে। ময়ূর কেকাধ্বনি করিতেছে, চকোর-চাতক-শুক-পিক মধুর গান করিতেছে, অলি-ঝঙ্কারে

কানন ভরিয়াছে। নদীর কূলে কূলে ব্যাঙ ডাকিতেছে, আর সেই ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিশাইয়া গগনে গুরু গুরু দেয়া ডাকিতেছে।

বদত মোর চকোর চাতক
কীর কোইল অলিগণি।
রটত দরদা- তোয়ে দাদুরী
অম্বুদাম্বরে গরজনি ॥ —শিবরাম

'পরম সুঘড় শিরোমণি' অখিল কলাগুরু কৃষ্ণচন্দ্র এমনই দিনে ঝুলনায় বসিয়াছেন। সখীগণ ব্রীড়াসঙ্কুচিতা রাধাকেও তুলিয়া দিলেন। তখন সেই লতার ডুরি ধরিয়া সখীরা দোলা দিতে লাগিলেন। ইহাই 'নওল-নওলী' কৃষ্ণরাধিকার ঝুলন।

কিয়ে অপরূপ ঝুলন কেলি,
শ্যাম হৃদয়ে হৃদয় মেলি
রাধা রহু লাগি। —উদ্ধবদাস

শ্রীমতী ঝুলনার ঝোঁকে যত চমকাইতে লাগিলেন, নায়কশ্রেষ্ঠ তত তাঁহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন।

✓ ঝুলনা-ঝমকে চমকে রাই
বিহসি মাধব ধরল তাই
আনন্দে অবশ পরশ পাই
চাপি করত কোলে রি। —কৃষ্ণদাস

কিছুক্ষণ পরে তিনি দোলনার দুলুনীতে অভ্যস্ত হইলেন। কিন্তু সখীরা যখনই কৌতুকে 'অতিহুঁ বেগে' দোলা চালাইতেছেন, তখনই শ্রীমতী উৎকণ্ঠিত হইয়া সখীগণকে অনুনয় করিতেছেন, 'তোমরা একটু ধীরে-ধীরে ঝুলাও, পাছে আমার প্রাণবঁধু পড়িয়া যান।

ঝুলায়ত সখীগণ করতালি দিয়া।
সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া ॥ —জগন্নাথদাস

বৈষ্ণব কবিরা বর্ষার ছন্দে ঝুলন-গীতি রচনা করিয়া পরম উপভোগের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু লীলার মাধুর্য সকলের প্রাণে সমান আনন্দ দান করে না। শ্রীরাধামাধব কোন এক অতীত যুগে বর্ষার ঘনায়মান সন্ধ্যায় ঝুলনায় ঝুলিয়াছিলেন, শুধু এইটুকুমাত্র স্মরণ করিয়া তাঁহারা ভগবল্লীলারসে অবগাহন করিতে পারেন না। তাঁহাদের সন্ধানী চিত্ত তত্ত্বের দিক ধাবিত হয়। লীলা যে নিত্য বস্তু তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা লীলার ফুলপাতা সরাইয়া ফলের অনুসন্ধান করেন। তাঁহাদের তৃপ্তি-বিধানের জন্য লীলার মধ্যে তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যলীলা তিনটি। একটি রাসলীলা। ইহাতে তত্ত্ব হিসাবে আছে বিশ্বের অফুরন্ত আনন্দের উৎসব। রাস অর্থই প্রকৃষ্ট রস। রস এব রাসঃ। রাস অর্থে অখণ্ড আনন্দ। সেই ভূমা আনন্দের প্রতীক হইল রাসের নৃত্য। রাসের আর এক অর্থ অবশ্য চক্রাকারে নৃত্য। চক্রধারীর রাসমণ্ডলী বা রাসচক্র আনন্দের সীমাহীন পৌনঃপুনিকতা, অনন্ত বিস্তৃত পুলকোচ্ছ্বাস। বিশ্বের যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু আনন্দের সব তাঁহারই বিকাশ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

তাঁহার আর একটি লীলা হোলি। হোলিলীলার তত্ত্ব তাহার বাহিরের লাল রঙেই ঘোষিত হইয়াছে। হোলি বা দোল ফাগের উৎসব। যাহার হৃদয় অনুরাগে অরুণ হয় না, ফাল্গুনের অধীর পুলক যাহার প্রাণে অনুরাগের ফাগ মাখাইয়া দেয় না, তাহার পক্ষে হোলি উৎসব ব্যর্থ। বিজয়া দশমী যেমন শাক্তদিগের পক্ষে এক পরম মৈত্রীর মিলন মহোৎসব, হোলিও তেমনই বৈষ্ণবদের এক সার্বজনীন মহা মিলনক্ষেত্র। প্রীতির পিচকারী যখন লাখে লাখে ছুটে, তখন গালাগালিও কটু না হইয়া উপভোগের সামগ্রী হয়। 'স্তুতি নিন্দা সকলই মধুর।'

ঝুলন লীলা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও প্রাচীনকাল হইতে ইহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। ভগবানের আন্দোলন লীলা সমস্ত ছন্দ, সমস্ত গতি, সমস্ত

জীবপ্রবাহের উত্থান-পতনের প্রতীক। বিশ্বে যে ছন্দ অনন্ত মাধুর্যে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই আভাস ঝুলনে পাওয়া যায়। ছন্দ নহিলে বিশ্ব যে এক মুহূর্ত্ত চলে না! সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছন্দে চলিতেছে, যদি সে ছন্দের ব্যতিক্রম কখনও ঘটে, তবে দিনরাত্রির ক্রমভঙ্গ হইবে, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পরস্পর পরস্পরের পথ রোধ করিয়া চুরমার হইবে। সমস্ত বিশ্বে সঙ্গীতের, কাব্যের প্রধান সম্পদ্, সুষমা, গৌরব তাহার বিচিত্র ছন্দ। সঙ্গীত, কাব্য না হইলেও মানুষ বাঁচিতে পারে, কিন্তু প্রাণের স্পন্দন পর্যন্ত সবই যে ছন্দ। সে ছন্দচ্যুতি যখন ঘটে, তখন প্রাণ নিষ্কৃতি লাভ করে মরণে, গতি মূর্ছিত হয় পাষাণের চিরস্তব্ধ স্থাবরতায়। নীহারিকাপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের কীট-পতঙ্গ অণুপরমাণু পর্যন্ত সবই ছন্দে সুরে সৌন্দর্য্যে বাঁধা। তাহারই সূত্রডুরি ধরিয়া আনন্দময়কে আমরা দোলাই ঝুলনে।

রাসলীলা

শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা আছে, তাহার মধ্যে রাসলীলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই নয় যে আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে রাসলীলাটি বেশী উপভোগ্য। কারণ এই যে, আনন্দময়ের বিকাশ এই লীলাটিতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা 'সর্বলীলোৎসব মুকুটমণি'!

পরব্রহ্মকে লাভ করিবার যে বিবিধ পন্থা আছে ইহা সর্বজনবিদিত। কেহ মনে করেন যাগযজ্ঞের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়; কেহ মনে করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লভ্য। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি পরম আস্বাদ্য। তাঁহার চিন্তনে, মননে, ধ্যানে হৃদয়ের আনন্দ উথলিয়া উঠে। যাঁহারা যাগ-যজ্ঞের দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে বা পরম পদ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বলেন 'অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয়।' যাঁহারা বিজ্ঞানবাদী, তাঁহাদের মতে সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। ইঁহারা নির্বিশেষ, নির্বিকল্প,

ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম স্বরূপ চিন্তা করিয়া এক অখণ্ড জ্ঞানময় রাজ্য লাভ করেন; সেখানে সকল ভেদ দূরীভূত হইয়া গিয়া কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মভূত এই আত্মা দুঃখ শোকের অতীত, তাহার সমস্ত বাসনা আকাঙ্ক্ষা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।'

কিন্তু একদিন ঋষি বলিয়া উঠিলেন যে ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানময় নহেন; তাঁহাকে জানিলে যে সকল সংশয়ের অবসান হয়, সকল বন্ধনের মোচন হয়, শুধু তাহাই নহে; তিনি আনন্দ স্বরূপ। রসো বৈ সঃ। তাঁহাকে জানিলে আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যায়। তাঁহাকে পাইবার জন্য, ধরিবার জন্য হৃদয়ে লোভ জন্মে। সাহিত্যদর্পণকারের মতে রস অর্থে যাহা আস্বাদন করা যায়। কিন্তু আমাদের আস্বাদ্য কি? স্থূলভাবে দেখিতে গেলে আস্বাদ্য—কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর। ইহার সাধন আমাদের জিহ্বা। সেই জন্য তাহার নাম রসনা। সমস্ত জন্তুরই রসনা আছে। কাজেই ইহার আস্বাদন অত্যন্ত স্থূল। এই প্রাথমিক স্তরের উপরে উঠিবার যোগ্যতা কেবল মানুষেরই আছে। সেই জন্য মানুষের পক্ষে অপর একটী বিরাট রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে—তাহার নাম আধ্যাত্মিক রাজ্য। এ রাজ্যে অপর কোনও জীবের প্রবেশাধিকার নাই। এই আধ্যাত্মিক রাজ্যের বাহ্যপ্রকাশ সাহিত্য। সাহিত্যে আস্বাদনের উপকরণ বহু। অলঙ্কার শাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞান সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন রস নয় প্রকার—শৃঙ্গার বা আদি, বীর, রৌদ্র, করুণ, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্‌ভূত ও শান্ত। কাহারও মতে বাৎসল্য রসও গণনীয়। এই সকল রসের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে একটি সামগ্রী অন্তর্নিহিত আছে যাহা সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টি ও কল্পনার বিলাসকে আস্বাদ্য করিয়া তুলে। তাহার নাম আনন্দ। সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম। যে আনন্দ হইতে সমস্ত ভূতনিবহ জন্মলাভ করে, যে আনন্দ লাভ করিয়া তাহারা আহ্লাদিত হয়, আবার যে আনন্দে তাহারা বিলীন হয়, সেই আনন্দই ত ব্রহ্ম। এই আনন্দ নহিলে প্রাণিকুল বাঁচে না। মানুষের আত্মা আনন্দের সন্ধানেই ব্যাপৃত।

পরব্রহ্মকে যখন আনন্দময়, মাধুর্যময়, পরম আস্বাদ্য বলিয়া জানা গেল তখনই ত তিনি রূপে রসে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিলেন। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। তিনি মূর্ত্তিধারী পরম মনোহর, সুন্দর রূপশ্রী-সমন্বিত পুরুষ। সুন্দর বলিয়াই তিনি কৃষ্ণ। কারণ তাঁহার আকর্ষণী শক্তিতে বিশ্ব বিমুগ্ধ। তাহা হইলেই বুঝিলাম যে, একদিকে ভগবান তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য মাধুর্য বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, অপর দিকে সমস্ত বিশ্বের চিত্ত লোলুপ হইয়া তাঁহার দিকি অনাদিকাল হইতে ধাবিত হইতেছে। ইহাই রাসের মর্ম্মকথা বলিয়া বোধ হয়। *

এই তত্ত্বের স্ফুরন লীলায়। তত্ত্ব আর লীলা আপাত দৃষ্টিতে পৃথক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই দুইয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্ত্ব না জানিলে লীলা শুষ্ক ইতিহাসের উপাদান হইয়া পড়ে। আবার লীলায় প্রবেশ না করিলে তত্ত্ব নীরস তর্কে পর্যবসিত হইবার আশঙ্কা থাকে। ভগবদ্গীতা ভক্তিতত্ত্বের সমুদ্র; মহাভারত লীলার খনি। এই তত্ত্ব ও লীলার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের ধর্ম্মমত স্থাপন করিয়াছেন। এ দুইয়ের মধ্যে যে বিরোধ আছে, তাহা তাঁহারা কখনও স্বীকার করেন না। আমাদের অবস্থা অন্যরূপ। আমরা যখন বৈদান্তিকের দৃষ্টি লইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা বুঝিতে যাই, তখন লীলার অসঙ্গতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ি। আর যখন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া লীলার আলোচনা করিতে যাই, তখন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের মত লীলার কামায়নপরতা (Eroticism) প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হই। †

মনে রাখিতে হইবে, কৃষ্ণলীলাকে বিষয়বস্তু করিয়া আমাদের দেশে নানা

* বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'রাসলীলা গোপীগণের ঈশ্বরোপাসনা। একদিকে অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যবিকাশ' আর একদিকে অনন্ত সুন্দরের উপাসনা...'

† যাহাকে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন—

'It is eroticism run wild'—রাসলীলা ৬৫ পৃঃ

পুরাণ, কাব্য ও সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। পুরাণকার এবং কবি নিজ নিজ কল্পনার আলেখ্যে রঙ চড়াইয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যে শুধু কৃষ্ণলীলার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তাহা নহে। মহাভারতের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী কেন হইল কে বলিবে? ঐতিহাসিকেরা ইহার মধ্যে আদিম মানব সভ্যতার লুপ্তাবশেষ দেখিলেও আমাদের সংশয় ঘুচে না। যিনি সতীসাধ্বী বলিয়া আমাদের পূজা পাইতেছেন, যাঁহার কাতর প্রার্থনায় শ্রীভগবান স্বয়ং আসিয়া বস্ত্রোন্মোচনের লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে এই অদ্‌ভুত বিধিলিপি কি করিয়া লিখিত হইল, তাহা কেবল কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নই বলিতে পারেন। রামায়ণে সর্ব্বশক্তিমান সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরাম-চন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নীহরণের কি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা একবার মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ভাগবতে শ্রীভগবানের প্রিয়তমা পত্নীগণের দস্যু হস্তে নিপীড়ন কি এমনি অপরিহার্য ছিল? বুঝিতে পারা যায় না। কালিদাস পার্বতীপরমেশ্বরের লীলায় এরূপ ভাবের আদিরসের ছড়াছড়ি কেন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। সমালোচকগণ এজন্য তাঁহার নিন্দা করিতে ছাড়েন নাই। বৈষ্ণব কবিরা খণ্ডিতায় শ্রীকৃষ্ণের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা ভগবল্লীলার কোন্ অংশে আলোকপাত করে, তাহাও বুঝিতে পারা কঠিন। নিরঙ্কুশ কবিরা যাহাই কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই আমরা লীলা বলিয়া গ্রহণ করি। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের দেশে চিরদিনই কাব্য এবং ধর্মতত্ত্বের দুইটী সমান্তরাল ধারা চলিয়া অসিয়াছে। বিশেষ করিয়া পুরাণগুলিতে এই ধর্ম ও কাব্যের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। রস নহিলে কাব্য হয় না। রসের মধ্যে আদিরস শ্রেষ্ঠ—আদ্য এব পরোরসঃ। সেই জন্য জয়দেবের গীতগোবিন্দ আমাদের দেশে সর্বত্র ধর্মগ্রন্থের সম্মান লাভ করিতে পারিয়াছে। জয়দেব শুধু শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে বসেন নাই, তিনি চাহিয়া-ছেন শৃঙ্গাররসের আদর্শস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিত্রিত করিতে। তাঁহার কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররস—শৃঙ্গাররসের অধিদেবতা। শৃঙ্গার রস কাহাকে বলে তাহা

অলঙ্কারশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত রসকে প্রাকৃত নায়ক নায়িকার রভসকেলির মধ্য দিয়া না ফুটাইয়া জয়দেব রাধাকৃষ্ণের লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিংশ শতাব্দীর নৈতিক কাণ্ডজ্ঞান তাহাতে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমরা ভাবি যে, যিনি এমন সুন্দর দশাবতার স্তোত্র গ্রথিত করিয়াছেন, যিনি প্রতি সঙ্গীতের শেষে শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়াছেন, তাঁহার হস্তে ভগবানের লীলা এমন কামকলায় পরিণত হইল কেমন করিয়া?

এ শুধু আমাদের দেশে নহে, ইয়ুরোপেও ভগবানের সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ কল্পনা কল্পিত হইয়া মানবের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক অপর এক দার্শনিকের ব্রহ্মের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'অনন্ত' এমনই একটি বিরাট ড্রেন যাহাতে সকল রকমের বিরোধের স্রোত একত্র বহিয়া চলিতেছে।* ভগবান এক অথচ বহু, তিনি অসীম অথচ সসীম, তিনি অরূপ অথচ পরম রূপবান, তিনি পরম দয়াল আবার কঠোর করাল, তিনি সমস্ত ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা সংস্থাপয়িতা, আবার সমস্ত নীতির উচ্ছেদকর্ত্তা! তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, অথচ তিনি ঘরে ঘরে মাখন চুরি করিতেছেন, স্তনপানছলে নারীবধ করিতেছেন, তপস্যার জন্য শূদ্রের শিরশ্ছেদ করিতেছেন, অসংখ্য নরনারী লইয়া কেলি করিতেছেন। সুতরাং ইতিহাস বা চরিত্র-নীতির দিক্ দিয়া ভগবানের লীলা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে এই সকল বিরোধী ধর্ম ভগবানে আরোপিত হইলেও, আমাদের ধর্ম-বুদ্ধির স্রোত কখনও রুদ্ধ হয় নাই, কখনও বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার কারণ তর্কে তাঁহাকে না পাইলেও আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি যোগে, পাইয়াছি ধ্যানে, পাইয়াছি বিশ্বাসে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। বৈষ্ণবেরা অধিকারবাদ

* His Infinite is a grand sewer in which all contradictions flow together—Hegel on Spinoza's Doctrine of Substance -

মানেন। তাঁহাদের মতে সকলের সকল বিষয়ে অধিকার নাই। যাঁহাদের যে রসে অধিকার, সেই রসের অনুশীলন লইয়াই তাঁহারা থাকিবেন; অন্য রসের কথায় তাঁহাদের প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গভেদে অধিকারী দ্বিবিধ। রাসলীলা প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তেরই আস্বাদ্য; ইহাতে বহিরঙ্গের প্রবেশাধিকার নাই। বৈষ্ণবদের মধ্যেও এমন অনেক ভক্ত আছেন যাঁহারা শৃঙ্গার বা মধুর রসের গান শ্রবণ করেন না। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা শুনিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করেন। তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রসের অধিকারী। আবার দেখিয়াছি অনেকে মধুর রস বা প্রেম-লীলার আস্বাদনে বিভোর হইয়া পড়েন, কাহারও কাহারও সম্বিৎ থাকে না। ইহার মধ্যেও আবার অধিকার ভেদ আছে। বিপ্রলম্ভের যে চারি প্রকার রস বিভাগ আছে যথা পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস, তাহার মধ্যে 'প্রবাস' বা বিরহ কেহ কেহ শুনিতে চাহেন না।

যাহা হউক, রাসলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যদি কেবল রিরংসা লইয়া ভগবচ্চরিত্রে দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই সমস্ত কর্ত্তব্যের অবসান হয় না। কৃষ্ণলীলার মধ্যে রাসলীলাই সব নহে, অন্যান্য অনেক লীলা আছে। 'রাস' চৌষট্টি রসের মধ্যে একটি বটে। ইহা ব্যতীত সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রসেরও বহু লীলা রহিয়াছে। সে সবই যে কামায়ন-প্রচুর এমন নহে। তার পর যে বিরহে বৃন্দাবন লীলার অবসান, তাহাতেও কি কামায়নের প্রাচুর্য আছে? যে বিরহে কাব্য-লক্ষ্মী অশ্রুবিসর্জন করিয়া কূল পান নাই, যে বিরহে কবিরা বেদনার গীত রচনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সে বিরহেও কি কামের বৈজয়ন্তী উড়িয়াছে? যদি তাহা না হয়, তবে রাসলীলাকে পৃথক করিয়া দেখা উচিত নহে; পরন্তু সমস্ত লীলার সহিত মিলাইয়া বিচার করিতে হইবে। †

শ্রীকৃষ্ণ পরমরূপবান পুরুষ; তাঁহাকে দেখিলে সাধ হয় সমস্ত ইন্দ্রিয় যদি

† হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন প্রণীত 'রাসলীলা' দ্রষ্টব্য।

নয়নে পরিণত হইত। এই রূপ দেখিয়া কি হয়? রমণীরা কামমোহিত হয়। দলে দলে তাঁহার পায়ে আত্মদান করে।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।

স্ত্রীলোকের সাররত্ন যে যৌবন, তাহাও ডালি দিতে ইচ্ছা করে। ইহাই রূপের প্রভাব। রূপ যদি অপরের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া লালসা না জন্মায়, তবে সে রূপ রূপই নহে। এই রূপ দেখিয়া যে অনুরাগ হয়, তাহাই পূর্বরাগ। ইহা প্লেটনিক 'লভ' হইলে অনেক যুক্তিবাদী হয়ত সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু ইহা সেরূপ উন্মত্ত প্রলাপ নহে। রূপ দেখিয়া রতি জন্মে। 'রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।' মিলনই তাহার পরিণাম। ইহা আধ্যাত্মিক মিলন মাত্র নহে ইহা সর্বাত্মা, সর্বেন্দ্রিয়, সর্বাঙ্গের মিলন আকাঙ্ক্ষা করে। সেইজন্য একটি অনবদ্য কাব্য সম্ভব হইয়াছে।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

তাঁহার প্রতি অঙ্গে যেন অনঙ্গের তরঙ্গ খেলিতেছে। সুতরাং অবাধ অফুরন্ত চিরন্তন মিলন ব্যতীত এ প্রেম চরিতার্থতা লাভ করে না। তাই মিলনের জন্য দৈহিক আত্মিক সর্ববিধ লালসা। কোথায়ও এতটুকু উহ্য নাই, অভাব বা ফাঁক নাই। এ যে আত্মহারা, পাগল করা, সর্বস্বপণ প্রেম। এখানে দেহের, মনের, প্রাণের, আত্মার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। কাজেই দেহ পশ্চাতে ফেলিয়া মন ছুটিল আগে;—যখন বাঁশী বাজিল, তখন

শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল-লোলনী। —গোবিন্দদাস

যেখানে দূরে বাঁশী বাজিতেছে সেখানে গিয়া কৃষ্ণ দর্শনে ত বিলম্ব ঘটিবে।

তাই ব্রজগোপীরা মনে মনে আত্মসমর্পণ করিতে করিতে ছুটিলেন। এখানে অর্থ এত বিস্পষ্ট যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গেলে কাব্যরস সব মাটী হইয়া যাইবে কিন্তু ইঙ্গিতের অভাব নাই! সহস্র সহস্র ব্রজগোপী ছুটিলেন—বাঁশীরবের সন্ধানে। কিন্তু কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বলা বাহুল্য সাধন পথের পথিক অনেক। কিন্তু সকলেই আপন মনে পথ চলেন। কেহ কাহাকেও দেখিতে পান না।

তত হি বেলি সখিনী মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি।

কাব্য রসটুকু বজায় থাকিল অথচ অব্যর্থ ইঙ্গিতও রহিল। শরতের পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছে, রাশি রাশি মল্লিকা ফুল ফুটিয়াছে, যমুনার কালো জলে চন্দ্র কিরণের রজত ঢেউ খেলিতেছে, ফুলে ফুলে অগণিত ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, ময়ূর ময়ূরী পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া নৃত্য করিতেছে। এমনই সময় ব্রজগোপীদের ভ্রমাভিসার। কৃষ্ণ যমুনার কূলে নীপমূলে ললিত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছেন। গোপীকুল থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে রূপ দেখিল, সে বাঁশী শুনিল, তাহারা মাধুর্যের ঝর্ণাধারা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া পাগল হইল।

শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে অনেক নীতি কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তোমাদের পতিরা গৃহে রহিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অসময়ে তোমরা বনে আসিলে কেন? এমন অধর্ম করিতে নাই ইত্যাদি। ব্রজগোপীরা যে উত্তর দিলেন, তাহার সারার্থ উপনিষদে পাওয়া যায়: পতিঃ পতীনাং তুমি যে পতিরও পতি, জগৎপতি। পুত্র-কন্যা সংসার কি ছার! তুমি যে প্রেয়ো পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ। কিন্তু আমরা এখানে তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিতে চাহি না। আমরা এই শারদীয় রাসের কাব্য আস্বাদন করিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করি। ভাগবত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ,

বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (প্রচলিত) এখানে কাব্য কথাই ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

জয়দেব এই শরৎকালীন রাস পরিত্যাগ করিয়া বসন্ত-বন বর্ণন আরম্ভ করিয়া বসন্ত রাসের প্রবন্ধ করিয়াছেন। ভাগবত এবং গীতগোবিন্দ উভয়েরই ইচ্ছা বোধ হয় এই যে, অনবদ্য নৈসর্গিক শোভার মধ্যে এই সুন্দর কাব্য-প্রসঙ্গের অবতারণা করিবেন। উভয়েই শৃঙ্গার রসের আতিশয্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা কাব্যের দিক দিয়া অনিবার্য। কারণ রূপানুরাগ, অভিসার ও মিলনের পরে এই রাসেই আনন্দলীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হইবে।

কাব্যের দিক দিয়া ইহার সার্থকতা দুইটি. প্রথম, প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয়ের উৎকর্ষ বুঝাইতে হইলে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। রাসে শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার প্রেমাধিক্য সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের মধ্যে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। কেননা—

অনেনারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

শ্রীগীতগোবিন্দে বসন্তঋতুতে যখন শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীরাধার রূপ হৃদয়ে লইয়া অন্য ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। ইহাতে রাধার প্রতি প্রেমাতিশয্য সূচিত হইল।

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।

কেনই বা না করিবেন? শ্রীকৃষ্ণকে অন্য রমণীর সহিত বিহার করিতে দেখিয়াও শ্রীরাধা তাঁহার পূর্ব প্রীতি স্মরণ করিয়া আনন্দলাভ করিলেন।

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনোমম কৃতপরিহাসম্॥

শরৎকালীয় রাসে তিনি আমার সঙ্গে যে সকল লীলাবিলাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার সহিত যে হাস্য-পরিহাস করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া আমি তাঁহারই মিলন কামনা করিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, লীলার সহিত তত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধান এই সকল কবির এক অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য। বহুবল্লভ যিনি, তাঁহাকে পাইতে হইলে একান্ত আনুগত্যের প্রয়োজন। কবি কৌশলে তাহাই দেখাইয়া তাঁহার বসন্তসময়বনবর্ণনা সমন্বিত রাসলীলাকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিলেন। ভাগবতে রাসের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানও এই সমন্বয়ের উদাহরণ। প্রেম পরম রমণীয় সামগ্রী বটে। কিন্তু অভিমান থাকিলে প্রেম সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। সেই জন্যই রাসের অন্তর্ধান। গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত রমণ করিয়া সৌভাগ্যগর্বে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তাই তিনি—

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।

তাহাদিগকে কৃপা করিবার জন্যই অন্তর্ধান করিলেন। আবার শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ যখন বনান্তরালে গেলেন, কুসুম তুলিয়া, কেশ বাঁধিয়া এবং অন্যান্য বিলাস রচনা করিয়া যখন আনন্দে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন রাধার মনে গর্ব হইল যে আমিই সর্বাপেক্ষা প্রেয়সী। তিনি বলিলেন আমি আর চলিতে পারিতেছি না, আমাকে কাঁধে করিয়া যথা ইচ্ছা লইয়া চল। নয় মাং যত্র তে মনঃ। ইহা বলাতে কৃষ্ণপ্রেমগরবিণী রাধার কি খুব বেশী অপরাধ হইল? মনে ত হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বিধান করিয়া কবি এখানে যে বিরহরসের অবতারণা করিলেন, তাহা পরম উপভোগ্য হইয়াছে। তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া কবি তুলির দুই একটি টানে যে চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে রাসের নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দ যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। তত্ত্বের দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ, শ্রীরাধা ভক্ত, মূর্তিমান মহাভাব। কাব্যের দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ নায়ক, শ্রীরাধা প্রেমিকা। শ্রীকৃষ্ণ রসিকেন্দ্রচূড়ামণি, শ্রীরাধা রসিকাশিরোমণি। নব নব সৌন্দর্য মাধুর্যের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা যেন অবারিত স্রোতে বহিয়া গিয়াছে।

কবিত্বের দিক ছাড়িয়া দিয়া কেবল তত্ত্বের দিক দিয়াও রাসলীলা

আস্বাদন করা যাইতে পারে। বিশ্বের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু উপভোগ্য, তাহা ত ভগবানেরই বিভূতি। যেখানে একটু আলো, একটু গীতিগন্ধ, যেখানে একটু সৌন্দর্য্য সেখানেই আনন্দময় ভগবানের কিরণ-সম্পাত। তাই বিশ্ব আলোকে পুলকে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাই এত হাসি, এত গান, এত কলরব। ইহাদের কাহারও ত স্বাধীন সত্তা নাই। সমস্তই ভগবানের আনন্দময় বিকাশের কণা।

তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমেব বিভাতি।

সূর্য্য চন্দ্র তাঁহাকে আলোকিত করে না। চন্দ্রের কৌমুদীতে পৃথিবী আলোকিত। সে চন্দ্র আবার সূর্য্যের কিরণে উদ্‌ভাসিত। কিন্তু সূর্য্যচন্দ্র যাঁহার কিরণে উদ্‌ভাসিত, তিনিই ব্রহ্ম। এই যে বিশ্বে বর্ণের খেলা, সূর্য অস্ত গেলে বর্ণ থাকে কোথায়? এই যে বিশ্বে এত আনন্দ, এত হাসি, ইহা ভগবানেরই লীলা খেলা। রাসলীলা তাহারই কাব্য, তাহারই ইতিহাস।

মানবীয় প্রেমের আদর্শে ভগবানের লীলা কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং দোষসম্পৃক্ত আদর্শের (anthropomorphism) বাধা একেবারে তিরোহিত হয় না। তাই আমরা সময়ে সময়ে সংশয়ে সন্দেহে আকুল হইয়া পড়ি। কিন্তু বৈষ্ণবেরা এই প্রেমের আদর্শকে উচ্চতম কোঠায় স্থাপন করিতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী বসন্ত রাসের বর্ণনায় কি সুন্দর ভাবে এই প্রেমের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন! বসন্তরাসে গোপীরা দলবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে ছুটিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ বেগতিক দেখিয়া কুঞ্জাভ্যন্তরে গিয়া আত্মগোপন করিলেন। তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিলেন। তখন গোপীগণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিল এবং বলিল, ঠাকুর আমাদের কৃষ্ণ কোথায়? তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিয়া আমাদের দুঃখ দূর কর।

নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোরে খণ্ডাহ বিষাদ॥

তুমি নারায়ণ তোমাকে প্রণাম করি। কিন্তু আমরা তোমাকে চাই না, বল, বল, আমাদের কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে শ্রীরাধা যখন আসিলেন, তখন আর তাঁহার ছদ্মরূপ রহিল না, তাঁহার অতিরিক্ত দুইখানি হস্ত মিলাইয়া গেল।

সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা
নাসীচ্চতুর্বাহুতা।—উজ্জ্বলনীলমণি।

লীলার দিক দিয়া ইহার অর্থ হইল প্রেমের এই লুকোচুরি খেলায় কৃষ্ণ হইলেন পরাভূত। আর তত্ত্বের দিক হইার অর্থ হইল এই যে, প্রেমের নিকট ঐশ্বর্য (ঈশ্বরত্ব) টিকিতে পারে না। চতুর্বাহুত্ব ঐশ্বর্যের লক্ষণ। দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ প্রেমের অধিদেবতা। এখানে কি কামায়নতার প্রাচুর্য? 'উত্তুঙ্গ অনঙ্গতরঙ্গে'র * মধ্য দিয়া যে সত্যটি বৈষ্ণবেরা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা কি ঐ তরঙ্গকে অতিক্রম করিতে পারে নাই?

আর একটি কথা বলিয়া আমার এ প্রবন্ধ শেষ করিব। ভাগবতে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বা গীতগোবিন্দে যে আদিরসের প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় চৈতন্যপরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহা অনেক সংযত হইয়াছে। সেখানে রিরংসার কথা বড় একটা নাই—আছে প্রেম, আছে নাচগান আমোদ আহ্লাদ।

বাজত তাল রবাব পখোয়াজ
নাচত যুগল কিশোর।
অঙ্গ হেলাহেলি নয়ন ঢুলাঢুলি
দুহুঁ মুখ দুহু হেরি ভোর॥

রাস অর্থে এই নৃত্য। রাস অর্থে যেমন রসের প্রগাঢ়তা বুঝায়, তেমনি আর এক অর্থে মণ্ডলাকারে নৃত্য বুঝায়। ব্রজ গোপীরা বাঁশীর

* 'রাস লীলা'য় হীরেন্দ্র নাথ দত্ত ইহাকে 'উত্তুঙ্গ অনঙ্গতরঙ্গ' বলিয়াছেন।

স্বরে আত্মহারা হইয়া যমুনাতীরে নীপকুঞ্জে মিলিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের আকুলতা দর্শন করিয়া রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন। রাস বা হল্লীশ অর্থে মণ্ডলী বন্ধন করিয়া নৃত্য—কৃষ্ণ মধ্যস্থলে, ব্রজ গোপীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া চক্রাকারে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

এই নৃত্যকে সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিবার জন্য যোগেশ্বর কৃষ্ণ আপনাকে বহুতে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এইরূপে কবির কাব্যে এক অপূর্ব চিত্র উদ্‌ঘটিত হইল।

তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥

একটি স্বর্ণময় মণি তার পাশেই একটি মরকত, একটি মেঘখণ্ড তার পাশেই একটি বিদ্যুৎ, একটি চাঁদ তার পাশেই আঁধার—চমৎকার চিত্র এই কাব্যের রস আস্বাদন করিতে করিতে অপূর্ব অপার্থিব আনন্দে মন ভরিয়া যায়। ধর্মতত্ত্বও মনে পড়ে না, নীতিকথাও ভাল লাগে না ভুলাইয়া দেয় রাসলীলা কি ; কামক্রীড়া না প্রেমোৎসব।

হোলি

হোলি শব্দ হোলাকা বা হোলিকা শব্দ হইতে আসিয়াছে। হোলাকা একটি উৎসবের নাম! ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন উত্তর-পশ্চিমে যে বহ্ন্যুৎসব হয়, তাহার নাম হোলাকা। বঙ্গদেশে এই উৎসব পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে, অথবা খড়ের একটি পুতুল গড়িয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কোন কোনও স্থানে ইহাকে চাঁচর বা মেড়া পোড়ান বলে। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি, তাহা বলা যায় না। দীপালীতে প্রদীপ দানের ব্যবস্থা বা কোন কোন স্থলে আকাশ প্রদীপের ব্যবস্থার একটা সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়—অর্থাৎ ঐ সময়ে কীট-পতঙ্গের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, দীপালিতে সেই কীট-পতঙ্গ হয় উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, না হয় নাশপ্রাপ্ত হয়। হোলির সময়ে বহ্ন্যুৎসবের যে কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। হয়ত এমন হইতে পারে যে, ফাল্গুনে ফসল উঠিয়া গেলে তৃণগুল্ম জঞ্জাল ও বৃক্ষের গলিত পত্র অনেক সঞ্চিত হয়, তাহাই পোড়াইবার একটি যৌথ ব্যবস্থা এই বহ্ন্যুৎসব। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও স্বাভাবিক কারণ মনে হয় এই যে, প্রায় প্রাচীন কাল হইতে সর্বজাতির মধ্যে উৎসববিশেষে আগুন লইয়া খেলিবার রীতি দেখা যায়। এমন হইতে পারে যে, হিন্দুদের মধ্যেও সেই সার্বজনীন রীতির প্রমাণ এই বহ্ন্যুৎসব। মহরমের সময় মুসলমানগণ আগুন লইয়া যে খেলা করেন, তাহাও এই প্রথারই অনুবর্ত্তন। কিন্তু হোলাকা বা হোলিকা শব্দ হইতে কি করিয়া অগ্নির উৎসব আসিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

একটি প্রবাদ আছে যে, হোলিকা নামে এক রাক্ষসী ছিল। সে যমুনার পারে বাস করিত ও ছেলে ধরিয়া উদর পূরণ করিত। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাক্ষসীকে বধ করিয়া যমুনাপুলিনের বালুরাশি তাহার রক্তে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন।

হোলির আবির খেলা তাহারই স্মৃতি বহন করিতেছে। অন্য একটি কিংবদন্তী বলে যে, হোলিকা রাক্ষসীকে বধ করা হয় নাই। গালাগালি দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভূত-প্রেত ছাড়াইবার সময় নানা অশ্লীল গালি দিবার প্রথা আছে। আদিমকাল হইতে এইরূপ একটি ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে, ভূত-প্রেত রাক্ষসী-দানবীরা অশ্লীল গালাগালি সহ্য করিতে না পারিয়া সে স্থান ত্যাগ করে। ইহা সত্য হইলে ভূত-প্রেতের রুচি শিষ্টতর বলিতে হইবে। হোলিতে এখনও অশ্রাব্য গালিবর্ষণের রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা হিন্দুস্থানীদের কোনও কোনও শাখার মধ্যেই নিবদ্ধ। বৈষ্ণব পদাবলীতে হোরি প্রসঙ্গে গালাগালির উল্লেখ আছে :—

ব্রজবনিতা যত ঝিঝি ঝঝায়ত
রসগারি মৃদু ভাষ।

গোপালচম্পূতে শ্রীজীব গোস্বামীও ইহার কথা বলিয়াছেন—

সকেলিগালিরীতিময়গীতিকোলাহলৈঃ !

—পূর্ব্বচম্পূ।

পুরাণে এই উৎসবের কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। ভাগবতে ইহার উল্লেখ নাই। জয়দেব বসন্ত রাসের বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু হোলির কোনও প্রসঙ্গ গীতগোবিন্দে নাই। চণ্ডীদাসের হোলির পদ দেখি নাই। বিদ্যাপতিতেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমার বোধ হয়, উত্তর-পশ্চিম হইতে এই উৎসব আমাদের দেশে আসিয়াছে। হোলি, হোরি নামটি হিন্দীর মত ; ফগুয়া, ফাগ হিন্দী শব্দ। সংস্কৃত শব্দ ফল্গু আছে এবং হোলির উৎসবকে ফল্গুৎসব বলে। রঘুনন্দন এই ফল্গুৎসবের পদ্ধতি তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে হোলি-

উৎসবের প্রচলন বঙ্গদেশে ছিল। শ্রীসনাতন গোস্বামীর পদেও আছে—

ভদ্রালম্বিত- শৈব্যোদীরিত
রক্ত-রজোভরধারী।
পশ্য সনাতন- মূর্ত্তিরিয়ং ঘন
বৃন্দাবন-রুচিকারী॥

ভদ্রা সহকৃত শৈব্যা কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত রক্তবর্ণ ফল্গুচূর্ণধারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখ। ইনি নিত্য শাশ্বত-মূর্তি-বিশিষ্ট ও বৃন্দাবনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগশীল! এই কবিতা হইতে বুঝা যায় যে, সে সময়ে বৃন্দাবনে ফাগ খেলিবার প্রথা সুবিদিত ছিল। শ্রীজীব গোস্বামী গোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূতে লিখিয়াছেন—

অপি বত! জনতাসু হোরিকায়াং
হরিমভিসস্রুরহো! ব্রজস্থ নার্য্যঃ!

ব্রজ-রমণীগণ শ্রীহরিকে হোলির উৎসবে (রঙ্গগোলালে) অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের সমকালীন প্রসিদ্ধ পদকর্তা ও গায়ক বাসুদেব ঘোষের একটি পদে পাওয়া যায়:—

দেখ দেখ ঋতুরাজ বসন্ত সময়।
সহচর সঙ্গে বিহরে গোরা রায়॥
ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে॥
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা গায়।
কুঙ্কুম পিচকা লেই পিছে পিছে ধায়।

বাসু ঘোষের অন্য একটি পদে আছে:—

আজুরে কনকাচল নীলাচলে গোরা।
গোবিন্দের সঙ্গে ফাগু রঙ্গে ভেল ভোরা॥

এখানে নীলাচলে হেমগিরি সদৃশ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীজগন্নাথের সঙ্গে ফাগ খেলিতেছেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ গৌরচন্দ্রিকায় সুরধুনীতীরই হোলির ক্রীড়াক্ষেত্র। কিন্তু বাসু ঘোষের উপরি উক্ত পদে এবং গোবিন্দ দাসের আর একটি পদে শ্রীগোরাঙ্গের হোলিলীলা নীলাচলে বর্ণিত হইয়াছে। পদ দুইটির সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে, গোবিন্দ দাসের পদ অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া কেহ বাসু ঘোষের নামে চালাইয়া দিয়াছে।

হোলির যে সকল গৌরচন্দ্রিকায় নরহরি নাম আছে, সেগুলি নরহরি চক্রবর্তীর রচিত বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যের সময়ে যে, হোলিলীলার প্রচলন ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই সময়ে বা ইহার অদূরবর্তী প্রাক্‌কালে হোলিলীলা বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যে ও বাঙ্গালীর সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

বহু পূর্বে বাসন্ত-পঞ্চমীতে মদন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। রত্নাবলীতে এই মদন-মহোৎসবের বর্ণনা আছে। এই উৎসবে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া পটবাসক বা পিঠালি কুঙ্কুমচন্দনে সুবাসিত করিয়া পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিত। শৃঙ্গ ভরিয়া জল লইয়া যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে অভিসিঞ্চিত করিত। শৃঙ্গ শব্দের সহিত ইংরেজি syringe শব্দের ভাষাগত সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আমাদের দেশে পিচকারীর ব্যবহার ছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, পিচকারীর কোনও সাধু প্রতিশব্দ আমরা এ পর্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারি নাই। এই অর্থে শৃঙ্গ শব্দের প্রচলন নাই বলিলেও চলে। পিচকারী সম্ভবতঃ হিন্দী হইতে আসিয়াছে। আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে উহাকে স্থান দিয়াছি অথবা কিছু পরিবর্তন করিয়া লইয়াছি, যথা—পিচকিরি, পিচকা, পেচকা ইত্যাদি। এই পিচকারী, পটবাস বা আবির, কুঙ্কুম চন্দন, জল-নিক্ষেপ প্রভৃতি সমস্তই মদন-মহোৎসবের অঙ্গ ছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এই মদন মহোৎসবই পরে বসন্তলীলা বা হোলিলীলায় পরিণতি লাভ করিয়াছে।

মদন মহোৎসবে অশ্লীলতার নামগন্ধ ছিল না। এখন 'মদন' বলিতেই আমরা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। সেই জন্য মদন-মহোৎসবকে মনে করি বুঝি Bacchanalian revelryজাতীয় কিছু হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে মদন চিরদিনই প্রেমের দেবতা। এ মদন অন্ধ নয়, পরন্তু পরম রূপবান্। রূপ এবং প্রেমের সম্বন্ধ অতি নিবিড়। মদনের সখা বসন্ত এবং সেই জন্য বসন্তের আগমনের সঙ্গে মদনের বিজয়যাত্রা আরম্ভ হয়। বসন্তকালই মদনোৎসবের সময়। এখানে একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমাদের দেবতারা চরিত্র বিষয়ে সব সময়ে হুঁসিয়ার না হইলেও মদনের সম্বন্ধে সাধারণতঃ কোনও অপবাদ দেওয়া হয় না। যাহা হউক, বসন্তোৎসবে আমরা মদনের পরিবর্তে মদনমোহনকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছি। মদনমোহন শুধু প্রেমের দেবতা নহেন, তিনি সমস্ত বিশ্বের অধিদেবতা। তিনি একদিকে মন্মথেরও মন্মথ, 'সাক্ষান্মথমন্মথ', অপর দিকে 'অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্'। কাযেই বসন্তোৎসব আর্য্যাবর্তের প্রায় সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হয়। হোলির উৎসব, বহ্নু্যৎসব, ফল্গুৎসব সমস্ত এই বসন্তোৎসবের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

হোলি বাসন্তী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যোপভোগের সঙ্গে পূজা পার্বণ অনুষ্ঠান জুড়িয়া দেওয়ায়, ইহা অনেকটা বাধ্যতামূলক হইয়াছে। ইয়ুরোপে স্বভাবশোভার বোধ জনসাধারণের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ছিল না বলিলেই চলে। ফরাসী দার্শনিক ও সাম্যবাদী রুসোর রচনা পাঠ করিয়া লোক স্বভাব-শোভা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের দেশের লোক স্মরণাতীত কাল হইতে পূজা-অর্চনা-ব্রত-উৎসবের মধ্য দিয়া নিসর্গ-দেবীর পদে অঞ্জলি দিয়া আসিতেছে। বসন্তকালের নির্মল প্রফুল্ল রাকা রজনীতে হোলির ব্যবস্থা, শরৎকালের নির্মল মেঘমুক্ত আকাশে যখন পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হয়, তখন ঘুমাইবে কে? সে দিন কোজাগর লক্ষ্মীপূজা—সে রাত্রিতে

ঘুমাইতে নাই। ঘুমাইলে যে অমন রাত্রিটি বিফল হইয়া যায়! হেমন্ত-কালের স্নিগ্ধ জোছনা নিশীথে রাসলীলা, বর্ষার মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণ চন্দ্রের ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাব ঝুলনের দোলায় বড় সুন্দর মানায়। গ্রীষ্মের রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জগৎ জুড়ায়, বনে বনে ফুল ফোটে, সুবাস ছড়ায়। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল। কুহু রজনীর ঘন অন্ধকারেরও একটি গম্ভীর, ভীতিজনক সৌন্দর্য আছে—সে দিনও ফাঁক যায় নাই। করালিনী কালীর পূজার জন্য ঐরূপ কুহু যামিনীই প্রশস্ত।

ভগবানের লীলা বিচিত্র রহস্যময়। তিনি কি লীলা করেন, তাহা ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ বলিতে পারে না।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ক্রিয়তে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ।

ভগবান মানুষের রূপ পরিগ্রহ করিয়া মানুষী লীলা করেন। যাঁহারা মনে করেন যে, ভগবান্ মানুষের মত লীলা কখনও করিতে পারেন না, তিনি অনন্ত, অসীম, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ; তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার নাই। তাঁহাদের পক্ষে লীলামাত্রই অলীক। লীলাবাদের প্রতিকূল ব্যক্তির সংখ্যা অল্প নহে। যুক্তির দ্বারা লীলাবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। লীলাবাদ রহস্যবাদের সহিত জড়িত। এই Mysticism বিভিন্ন অনুপাতে সকল ধর্মের মধ্যেই আছে। রূপক (Symbolism) ব্যতীতও ধর্ম হয় না। সুতরাং কেবল ন্যূনাধিক্যের ব্যাপার—all a difference of degree. মানবাত্মার সঙ্গে প্রেমময়ের সম্বন্ধ বুঝিতে বুঝাইতে ভক্তগণ প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতের কথাটির মত মূল্যবান্ কথা খুব কমই শোনা যায়। "ক্রিয়তে তাদৃশী ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ।" তিনি সেই সকল লীলা করেন, যাহা শুনিলে মন তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। ভগবানের জীবনচরিত কেহ লিখে নাই, তাঁহার জীবনের কোনও সন তারিখযুক্ত প্রামাণিক ইতিহাস রচিত হয়

নাই, কোনও শিলালিপিতে বা তাম্রশাসনে তাঁহার কার্যকলাপ উৎকীর্ণ হয় নাই। ভগবান্ এক অনন্ত মাধুর্যপূর্ণ চিন্তামণিধামের অধীশ্বর। সে চিন্তামণিধামের নাম বৃন্দাবন—পরম পবিত্র রমণীয় উপবন। সে রাজ্য, সে জগৎ আমাদের ধূলিমলিন কলুষকলঙ্কিত সংসারের মত নয়। সে চিন্তামণিধাম কেবল চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, যোগের দ্বারা লভ্য।

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী সেই বৃন্দাবনধাম॥
চিন্তামণিময় ভূমি চিন্তামণি-ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনে কেহ না মাগে অন্য ধন॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে।
সহজ লোকের কথা যাহা দিব্যগীত।
সহজ গমন করে নৃত্য প্রতীত॥
সর্বত্র জল যাঁহা অমৃতসমান।
চিদানন্দ জ্যোতি স্বাদ্য যাঁহা মূর্তিমান্॥

কৃষ্ণ যেখানে বাস করেন, সে-ই চিন্তামণিধাম—সে-ই বৃন্দাবন; যেখানে ভূমি, গৃহ সমস্ত চিন্তামণিময়। চিন্তামণি নামক বহুমূল্য রত্ন সেখানে দাসীগণের চরণভূষণ। সেখানে প্রতিবৃক্ষ কল্পবৃক্ষ, প্রতি ধেনু কামধেনু। সেখানে কেহ ফল পুষ্প দুগ্ধ ব্যতীত অন্য ধনের কামনা করে না। সেখানে সহজ গমনই নৃত্য, সহজ বচনই দিব্য সঙ্গীত। সেখানে জল অমৃত এবং যে চিদানন্দজ্যোতি যোগিগণের ধ্যানেরও অতীত, তাহাই পরম আস্বাদ্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

এ হেন বৃন্দাবন ভগবানের প্রেমলীলা স্থল হইলেও হইতে পারে।

সেই চিন্তামণিধাম বৃন্দাবন, সেই যমুনার কূল, সেই মালতী যূথী জাতীর গন্ধভরা বসন্ত-সমীরণ। এখানে ভগবানের বিহার কল্পনা করা যাইতেও পারে। এখানেই "অপরূপ দুহুঁ জন অতনু-বিলাস।" ইঁহাদের বিলাসে দেহের সন্ধান মাত্র নাই, তাই অতনু-বিলাস। উভয়ের তনু শুধুই প্রেমে গড়া। প্রেমের প্রকৃতি এই যে, পুরাতনকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করে, অথবা প্রেমের চোখে সবই নূতন, তাই চির বসন্তে—

বিহরে শ্যাম নবীন কাম
নবীন বৃন্দাবিপিন ধাম
সঙ্গে নবীন নাগরীগণ
নবঋতুপতি রাতিয়া।
নবীন গান নবীন তান
নবীন নবীন ধরই মান
নৌতুন গতি নৃত্যতি অতি
নবিন নবিন ভাতিয়া॥

আজ সবই নূতন বোধ হইতেছে। এমনই নবীন বসন্তে, নবীন বৃন্দাবনে নবীন সহচরীগণকে লইয়া নবীনকিশোর হোরি খেলা পাতিলেন।

সমবয়ঃ সখাগণের সঙ্গে হোরি খেলিতে খেলিতে ব্রজ-যুবরাজ চলিয়াছেন। পৌর্ণ-মাসী সকল ব্রজললনাকে সাবধান করিয়া দিলেন—

আজ কোই কুলবতী নাহি বাহিরাব।
যমুনা সিনানে কোই নাহি যাব॥
বিপতি পড়ল আজু যুবতি সমাজ।
সখাগণ সঙ্গে খেলই যুবরাজ।

হোলিখেলার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। পথগুলি ব্রজ-বালকরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—কাহারও পলাইবার যো নাই। পিচকারি লইয়া সকলে এমন

ভাবে রঙ্গগোলাল নিক্ষেপ করিতেছে, যেন মাথার উপর দারুণ বর্ষণ হইতেছে তাই পদকর্ত্তা বলিতেছেন—

কহ গোবর্দ্ধন রহ গৃহমাঁহ।
কোই জনি মন্দির ছোড়ি বাহিরাহ ॥

শ্রীমতী গৃহে বসিয়া ভাবিতেছেন, আহা, এমন আনন্দের দিন বাহিরে যাইতে পাইব না?

ইহ দিনে কৈছে রহিতে কহ ঘর মাহা
সো সুখে হোই নৈরাশ।

আমরা সব সখী মিলিয়া দর্শন করিতে যাইবই। ইহাতে লজ্জা করিলে চলিবে না। শ্রীমতী গুরুজনের নিকট অনুমতি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এক বিপদ হইল—শুনিতে পাইলেন পদ্মা সখী সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা প্রাণনাথের সহিত হোলি খেলিবেন। এতক্ষণ বুঝি তাঁহাদের মিলন হইয়া গেল।

বংশীবট তট মীলন ভেল বুঝি
ফাগু যন্ত্র করি হাত।
সজনি ইহ দারুণ পরমাদ।
ঐছন ভাতি রচন করি চল সখি
যাই করিয়ে সব বাদ ॥

চল, আমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি। তার পরে—

সভে মিলি ফাগু তিমির করি বেঢ়ব
লখই না পারই কোই ॥
ঐছনে কানু লেই সভে আওব
তুরিতহিঁ নিধুবন পাশ।
গোবর্দ্ধন কহ আনন্দে খেলহ
পদ্মা পাউ নৈরাশ ॥

আমরা সকলে মিলিয়া এমন করিয়া ফাগের আন্ধার করিয়া দিব যে, কেহই কিছু দেখিতে পাইবে না। তখন আমরা কৌশল করিয়া সত্বর কৃষ্ণকে নিধুবনের নিকটে আনিব। পদ্মা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে।

ফাগুরজে সকল করল আঁধিয়ার
নারি-পুরুষ কোই লখই না পার ॥
ঐছনে কানুক মাঝহি ঘেরি।
আনলুঁ নিধুবনে সো নাহি হেরি ॥

হোলিতে দুই দলে আবির-কুঙ্কুমের যুদ্ধ চলিত। লাখে লাখে পিচকারী ছুটিত। শ্যাম-অঙ্গ লালে লাল হইয়া যাইত। শ্রীরাধিকার দলের সেনা-পতি হইতেন প্রধানা সখীরা—ললিতা বিশাখা। শ্রীকৃষ্ণের দলের সেনা-পতি হইতেন বটু অর্থাৎ মধুমঙ্গল ও সুবল। সাধারণতঃ গোপীরা জয়লাভ করিতেন ও মধুমঙ্গলের দুর্দশা করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। হোলিলীলার খণ্ড-কাব্যে মধুমঙ্গল বিদূষক। ললিতমাধব, জগন্নাথবল্লভ প্রভৃতি নাটকেও মধুমঙ্গলই বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি কিছু লোভী ব্যক্তি, প্রেমের আবেদন অপেক্ষা ক্ষুধার তাড়নাই তাঁহার পক্ষে অধিক আগ্রহের বিষয়। ব্রজ-গোপীরা তাঁহাকে লইয়া হাস্য-পরিহাস করিতে ভালবাসেন। মধু-মঙ্গল সুতরাং এই রমণীব্যূহের নিকট পরাজয়-সম্ভাবনা মাত্রেই পলায়ন করিতে তৎপর। গোপীরাও তাঁহাকে ধরিয়া নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। যাহা হউক—

মধু মঙ্গল সহ সুবলা পলাওল
বল্লবী দাস জয় গায়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা তখন সঙ্কটজনক। কর হইতে মুরলী ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে; শিখিপুচ্ছচূড়া আউলাইয়া পড়িয়াছে। দুই হাতে তিনি চক্ষু রগড়াইতে ব্যস্ত; ততক্ষণে লক্ষ লক্ষ পিচকারী তাঁহাকে রঙ্গগোলালে স্নান করাইতেছে। কিন্তু একজন তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া

ছল ছল চোখে তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সখীদের আনন্দে শ্রীরাধা সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিতেছেন না। কখনও

'চুয়া চন্দন গোরী দেয় শ্যামের গায়।'

কখনও বা বসনাঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়ন বয়ন মুছাইয়া দিতেছেন।

শ্যামেরে বিভোর দেখি রসবতী রাই।
অরুণ বসন দিয়া ওমুখ মুছাই॥

কিন্তু জয়ের আশা তখনও মেটে নাই। তাই বলিতেছেন :—

এস বঁধু আরবার খেলাই হে ফাগুয়া।
যদি বল একা আমি বহু সঙ্গের সঙ্গী তুমি
সযূথে বিশাখা হউক তুয়া॥

বিশাখা তাহার দল সহ তোমার পক্ষে যাক। তোমার পিচকারী না থাকে, বল কত চাই? আমি যোগাইব। রঙ্গ না থাকে, তাহাও দিব। তোমার কৃপায় আমাদের রঙের (অর্থাৎ অনুরাগের) অভাব নাই।

ফাগের রঙ্গে গগন পবন লাল হইয়া গেল। যমুনার জল, নীলোৎপল, কোকিল, ময়ুর, বৃক্ষলতা সব লাল হইল।

ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে!
বৃন্দাবনের তরুলতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ুর নাচে গাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥

কিন্তু এই যে সব লালে লাল হইল, এ রঙ কি শুধু বাহিরে রহিল? প্রাণে কি সে অরুণিমার পরশ লাগিল না? বৈষ্ণব কবি প্রাণের ঠাকুরকে শুধু ফাগ মাখাইয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাই তিনি বলিতেছেন, উভয়ে মনে মনে লাল হইতেছেন :—

নিরখত বয়ন নয়ন পিচকারী
প্রেম গোলাল মনহি মন লাগ।

প্রেমিকযুগল উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে যে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, সে দৃষ্টি ঐ পিচকারীর ধারারই মত অব্যর্থ; সহজেই অরুণ দিঠির অনুরাগ ভরা চাহনিতে মুহুর্মুহু উভয়ে লাল হইয়া উঠিতেছেন। এদিকে

'অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর সবে ভেল এক বরণী॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ;
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ॥

অন্যদিকে উভয়ের মনের মধ্যে প্রেমের হোরি খেলা চলিতেছে—

ফাগু রঙ্গ তহিঁ নব অনুরাগ।

সে হোরি-খেলায় নব অনুরাগ ফাগ হইল, নয়নের দৃষ্টি পিচকারীধারা হইল। তনু মন দুই যুক্ত করিয়া শৃঙ্গ বা পিচকারী হইল—

'খেলত তনু মন জোরি ভোরি দুহুঁ

পিচকারীতে একটি নল ও একটি দণ্ড বা Piston লাগে। এ ক্ষেত্রে দেহ হইল নল, মন হইল দণ্ড। গোলাল প্রস্তুত করিতে আতর গোলাপের প্রয়োজন হয়; এ প্রেমের খেলায় 'দুহু অঙ্গ পরিমল চুয়া-চন্দন' হইল। এইরূপে হোরিখেলা প্রেমে এবং প্রেমের লীলা হোরিখেলায় পরিণত হইয়া বৃন্দাবনে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইল। বৃন্দাবন যখন আবিরে অরুণ, অর্থাৎ ফাগ বৃষ্টিতে অন্ধকার, তখন এই হোরি খেলিতে খেলিতে—

বন্ধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে
কেহ না দেখিতে পায়।

আমরাও কিশোর-কিশোরীকে হৃদয়ের মধ্যে অনুরাগে অভিসিঞ্চিত করিয়া আজ সেই চিন্তামণিধামের হোলি স্মরণ করি।

ভাবোল্লাস

আজু রজনী হম ভাগে পোহাইলুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

বিদ্যাপতির এই প্রসিদ্ধ পদটি ভাবোল্লাসের পদ বলিয়া উল্লিখিত হয়। ভাবোল্লাস বলিতে আমরা বুঝি যে, দীর্ঘ বিরহ যখন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, মন যখন আর কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিতেছে না, তখন শ্রীরাধিকা অন্তশ্চিত্তে মিলন-সুখ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। দৈহিক মিলনের পরিবর্তে এখানে আত্মিক মিলনই বর্ণনীয়। বিদ্যাপতি সুকৌশলে তাই এই আত্মিক মিলন ঘটাইয়াছেন। সখি, আমি আজ (গত) রজনী ভাগ্যে কাটাইলাম। কেন না, আমি স্বপ্নে আমার প্রিয়তমের চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়াছি। দেখিয়া আমি জীবন যৌবন সফল বলিয়া গণ্য করিলাম। সমস্ত সংশয়-কুহেলিকা দূর হইল এবং দুঃখের ঘনঘটা কাটিয়া গিয়া দশ দিক্ প্রসন্ন হইল।

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥

আজ স্বপ্নে প্রিয়তম আসিয়াছেন, এজন্য আমি গৃহ—গৃহ বলিয়া মানিলাম—এতদিন এ গৃহ তাঁহার বিরহে শ্মশান-সম হইয়াছিল। আমার দেহ আজ দেহ বলিয়া মনে করিতেছি—এত দিন দেহের কোনও সার্থকতা ছিল না।

সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ—
মলয় পবন বহু মন্দা॥

চণ্ডীদাসের পদেও আছে—

গগনে উদয় হউক চন্দ।
মলয় পবন বহুক মন্দ॥
কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥

মিলনে এই সকল প্রেমোদ্দীপক উপাদানের প্রয়োজন আছে। এখন মদনের পাঁচ বাণ লক্ষ বাণ হইলেও ক্ষতি নাই।

বিদ্যাপতি এই ভাবোল্লাসের স্রষ্টা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যাপতির উপরিলিখিত পদটি এবং সুপ্রসিদ্ধ 'হরি যব আওব গোকুলপুর। ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয় তূর॥' অথবা "অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। পলটি চলব হম ঈষত হসিয়া॥" অথবা 'পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে। মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥' নায়িকা মনে মনে এই যে মিলন-মহোৎসবের কল্পনা করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন, কোথায়ও ইহার তুলনা আছে বলিয়া আমি জানি না। বৈষ্ণব সাহিত্যেও ইহার তুলনা বেশী নাই। বিদ্যাপতি ইহার প্রবর্তক, এই জন্য মনে হয় যে, অন্য সকলের পদে বিদ্যাপতির মুদ্রাঙ্কই দেখিতে পাই। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে দেখা যায় যে, এক এক জন কবি এক এক বিষয়ের রচনায় সিদ্ধ। যেমন চণ্ডীদাস পূর্বরাগে, গোবিন্দ দাস অভিসারে, নরোত্তম দাস প্রার্থনায়, বিদ্যাপতি প্রার্থনার পদেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায়। কিন্তু তাঁহার 'ভাবোল্লাস' পদগুলিতে এমনই একটি অজ্ঞাতপূর্ব বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাই যে, সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যেও তাহা দুর্লভ।

সাহিত্যদর্পণে ভাবোল্লাসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। উজ্জ্বলনীলমণিতেও

দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বিদ্যাপতি এই পদগুলিকে কোথায়ও ভাবোল্লাস আখ্যা দিয়াছেন কি না তাহাও জানি না। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্রে ভাবোল্লাস কথাটির সহিত বোধ হয় প্রথম পরিচয় লাভ করা যায়। 'ভাবোল্লাস' রসপর্য্যায়ে তিনি অনেকগুলি পদ দিয়াছেন।

রাধামোহন ঠাকুর যে ভাবে এই পদগুলির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যেন গায়কদের মধ্যে এই নামটি সুপরিচিত ছিল। কেন না, তিনি টীকায় বলিতেছেন, 'অথ ভাবোল্লাস-গান-নির্ব্বাহকং তদ্‌ভাবাক্রান্তং শ্রীমদ্‌ গৌরচন্দ্রং "আজহুঁ শচীসুত" ইত্যাদিনা স্মরতি।' ভাবোল্লাস সম্বন্ধে টীকায় বেশী কিছু নির্দেশ তিনি দেন নাই। শুধু এই মাত্র বলিয়াছেন, "ভাবোল্লাসোঽয়ং ভাবি সমৃদ্ধিমদ্‌ রসস্যাঙ্গভূতত্বাৎ তদ্‌ রস এবেতি জ্ঞেয়ঃ।" অর্থাৎ ভাবী (ভবিষ্যৎ) সমৃদ্ধিমান রসের অঙ্গ বলিয়া ইহা সেই রস বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সমৃদ্ধি বা সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ রসশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। 'দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাৎ বিযুক্তয়োঃ' উজ্জ্বল-নীলমণির এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার লোচনরোচনী টীকায় বলেন; 'ঋদ্ধি শব্দস্তাবৎ সম্পন্নতা-বাচকঃ, তত্র সমিত্যুপসর্গে আধিক্যং মতুপ্‌ প্রত্যয়স্তু প্রশংসাতিশয়নিত্যযোগ প্রত্যায়নং তু ততোঽপ্যাধিকং দর্শয়তি।' তাহা হইলে বুঝা যায় যে, সুচির বিরহের পরে যে মিলন হইল, তাহাতে উপভোগ বা আনন্দাতিশয্য থাকায় তাহাকে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ বলে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় এই কথাই বলিতেছেন; 'সুদূর প্রবাসবশাৎ বিরহিণোর্যূনোর্নায়িকানায়কয়োঃ···উপভোগাস্যাতিরেক আধিক্যং স সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগঃ কীর্ত্ত্যতে।' এই সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ যদি শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের 'সমৃদ্ধিমদ্রসঃ' হয়, তবে ভাবোল্লাসের অর্থ দাঁড়ায় যে সুদীর্ঘ বিরহের পর যে মিলনানন্দোপভোগের আতিশয্য তাহারই নাম ভাবোল্লাস।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে ভাব অনেক স্থলে প্রণয়ের নামান্তর মাত্র। অতএব ভাবোল্লাস অত্যধিক প্রণয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস। এই অর্থ গ্রহণ করিলে বিরহের

পর মিলনের সমস্ত পদকেই ভাবোল্লাস বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু অনেকগুলি শ্রেষ্ঠপদে অনুরূপ ভাবও দেখা যায়। সে সকল পদে কবি কল্পনায় আনন্দ উপভোগ করাইতেছেন মিলনের পূর্বে। প্রিয় আসিবেন, এই স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীমতী অধীরা হইয়াছেন। তাঁহার আগমন-সম্বন্ধিনী আশায় উৎফুল্ল হইয়া উপভোগের ও অভ্যর্থনার নানা উপচার মনে মনে রচনা করিতেছেন, অথবা নানা সুলক্ষণ দেখিয়া প্রিয়তমের আগমন সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আয়োজন করিতেছেন। কাকের কর্কশ স্বরও আজ কর্ণে মধু বর্ষণ করিতেছে। কাকের যতই দোষ থাক্, ভবিষ্যদ্বেত্তা বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে। তাই জ্ঞানদাস বলিতেছেন,

আজু পরভাতে কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সুধাইতে
উড়িয়া বৈসয়ে তায়॥

বিদ্যাপতি বলিতেছেন ; কাক, তোমার চঞ্চু সোণা দিয়া বাঁধাইয়া দিব—যদি বন্ধু আজ আসেন।

সোনে চঞ্চু বাঁধএ দেব মোঞে বাঅস
জঞো পিয়া আওত আজ রে।

আরও কত সুলক্ষণ প্রিয়তমের আগমন সূচনা করিতেছে ;

বামভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে
হৃদয়ে উঠিছে সুখ।
প্রভাত স্বপন প্রতীত বচন
দেখিব পিয়ার মুখ॥—বংশীদাস।

হাতের বাসন খসিয়া পড়িতেছে, দুইজনার মুখে যুগপৎ একই কথা, 'বন্ধু আসিবার ঠিকন সুধাইতে' নাগিনী মাথা নাচাইতেছে—এ সকল শুভ লক্ষণ কি কখনও বৃথা হইতে পারে?

খঞ্জন কমলিনি সঙ্গ।
পুলকে পুরয়ে সব অঙ্গ॥
বাম নয়ন করু কম্প।
সঘনে খসয়ে নিবি-বন্ধ॥—জ্ঞানদাস।

খঞ্জন-নাচা একটি অতীব শুভ লক্ষণ, যদি কমলে খঞ্জনের নৃত্য দর্শন করা যায়, তাহা হইলে আরও শুভ হয়। এ সব লক্ষণ কখনও বিফল হইবে না। 'মাধব, নিজ গৃহে আব।'

চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
নাচিছে হিয়ার হার॥—গোপাল দাস

এইরূপ ভাবে অনেক কবি ভাবোল্লাসের পদ রচনা করিয়াছেন। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই রসের কোনও প্রসিদ্ধ পদ গোবিন্দ দাস রচনা করেন নাই। আকস্মিক ভাবোল্লাসে

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভবাণী।
শুভ-সূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত
অতএ নিচয় করি মানি॥

গোবিন্দ দাসের এই একটি মাত্র পদ আছে। কিন্তু ইহাতেও রসটি সুপরিস্ফুট হয় নাই। শ্রীমতী শুভ-সূচক লক্ষণ প্রতি অঙ্গে পরিব্যক্ত দেখিয়া সখীগণকে বলিতেছেন; তোমরা স্থানে স্থানে মঙ্গলকলস স্থাপন করিয়া তাহার উপর আম্র-পল্লব দেও। গ্রহগণককে ডাকিয়া আনিয়া নানা উপহার দেও। সুবর্ণের পাত্রে খই ভরিয়া চোখের সম্মুখে রাখ। সখীগণ, সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া হুলুধ্বনি দেও—আমার প্রাণের প্রাণ হরি আজ নিজগৃহে আসিবেন।

ভাবোল্লাসের পদে বিদ্যাপতির প্রতিভা কেহ খর্ব্ব করিতে পারে নাই। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠ পদগুলি বঙ্গদেশে ব্যতীত অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় নাই। মিথিলায় প্রাপ্ত কয়েকটি পদে তাহার কিছু কিছু ভাব পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু বিদ্যাপতির খ্যাতি রক্ষা করিতে তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। প্রিয়তমের আগমন আশায় নায়িকা যে মনের কত সাধ ব্যক্ত করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই :—বন্ধু যখন আমার আঙ্গিনায় আসিবেন, তখন 'পলটি চলব হাম ঈষত হসিয়া', একটি তুলির টানে বিরহিণীর আশা-উৎফুল্ল হৃদয়ের ছবিখানি যেন চোখের সমক্ষে ভাসিয়া উঠে। প্রিয়তম যখন আমার আলিঙ্গন প্রার্থনা করিবেন, তখন

'মুখ মোড়ি বিহসি বোলব নহি তবহি।'

তবে তিনি আসিলে তাঁহার সর্ব্বোপচারে অর্চ্চনা করিতে হইবে। নগরের ঘরে ঘরে জয়-তূর্য্য বাজিবে। আমি আর কি দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিব ? প্রাণবন্ধুর অভ্যর্থনার জন্য কাহারও নিকট কিছু ত প্রার্থনা করিতে যাইতে পারিব না। লজ্জা করে না ? আমি আমার নিজের দেহেই সমস্ত উপচার করিব। আলিপনা দিতে হয়, আমার গলার শুভ্র মোতির মালা আলিম্পন হইবে। মঙ্গল-কলস স্থাপন করিতে হয়, আমার কুচযুগল মঙ্গল কলস হইবে। আমার অঙ্গগন্ধ ধূপ, আমার এই রূপশ্রী দীপ, এবং আমার সর্ব্বাত্ম-নিবেদন নৈবেদ্য হইবে। আর নয়ন-সলিলে প্রিয়তমের অভিষেক করিব।

নিদারুণ বিরহের মধ্যে যখন এই সুরটি বাজে, তখন তাহা মর্মে গিয়া প্রবেশ না করিয়া পারে না। বিশেষতঃ যখন মনে পড়ে যে এই মরণাধিক বিরহের হয় ত কোনো দিন অবসান নাই।

মুরলী-শিক্ষা

বংশীগানামৃত ধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
যে না হেরে সো চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মাথে বাজ
জন্ম তার হৈল অকারণ ॥
সখি হে শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনা সকলই বিফল ॥ —চৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র মনে হইলেই সর্বাগ্রে মনে পড়ে তাঁহার বাঁশীর গান। মহাপ্রভু তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, সেই মুরলীরঞ্জিত বদন যে নয়নে না দেখিল তাহার নয়নে কি কাজ? সে নয়নে বাজ পড়ুক। সেই ভুবন-মনোমোহন মুখখানি সমস্ত লাবণ্যের আকরস্থল। বিশ্বের যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, সুশ্রী, সুষমামণ্ডিত, তাহার মূল প্রস্রবণ যে ঐ চাঁদ মুখখানি।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

তাই মহাপ্রভু শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া খেদ করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন বিনা তাঁহার সমস্তই বিফল হইল। শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন শ্রীরাধিকার প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য। বস্তুতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলার দুইটি জিনিষ অতুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণের রূপের তুলনা নাই, আর শ্রীরাধিকার প্রেমের তুলনা নাই। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই রূপ ও প্রেমের উৎকর্ষ অন্য সমস্ত বিষয়কে অতিক্রম করিয়া আমাদের বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রূপ নহিলে প্রেম স্ফূর্তি লাভ করে না। এখানে যত না রূপ, তত না প্রেম।

কিয়ে কমল দোলে রে নাটুয়া খঞ্জন পাখী।
ঘর সরবস্ব যৌবন দিয়ে শ্যামরূপ দেখি॥ —গোবিন্দ দাস

এই রূপ দেখিবার জন্ত গৃহ, সর্বস্ব যৌবনে তিলাঞ্জলি দিতে হয়। নহিলে ত এ রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিলেও প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হয় না। যিনি এমন করিয়া রূপ দেখিতেন, তাঁহার প্রেম কেমন? এমন সর্বহারা প্রেম ত কল্পনা করা যায় না। তাই এই 'প্রেমের মধুরিমা' কেমন তাহা দেখিবার জন্ত যেন রাধাকৃষ্ণ এক দেহ ধারণ করিয়া গৌরাঙ্গসুন্দররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে ও নীলাচলে স্বরূপ গোস্বামী প্রমুখ পার্ষদবৃন্দ মহাপ্রভুকে এই অপূর্ব ভাব-সমন্বয়ের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা ইহা শুনিতে শুনিতে এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে এই সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ভাবগম্ভীর কল্পনার গুরুত্ব বা মৌলিকত্ব সম্বন্ধে একবারও চিন্তা করি না। এরূপভাবে অবতার-কল্পনা ভারতীয় অবতারবাদসঙ্কুল ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই। এমন প্রাণস্পর্শীভাবে মানব-দেবতার চরিত্র-চিত্র আর কোথায়ও কোনও যুগে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্ত সাক্ষাৎ রূপ ও প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। একাধারে রূপ ও প্রেমের এরূপ অবস্থান আর কোথায়ও কল্পিত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমরা সচরাচর ইহাই জানি রূপ যেখানে, প্রেম সেখানে নয়; আবার প্রেম যেখানে রূপ সেখানে নয়। প্রেমের নির্মল দর্পণেই রূপ অম্লান-মধুরিমায় বিকশিত হয়। কাজেই রূপ ও প্রেম পরস্পরের সাহায্যকারী। রূপ হৃদয়ে জাগায় প্রেম; আর প্রেম রূপকে আস্বাদন করিয়া সার্থক করে, ধন্ত করে, সম্পূর্ণ করে। প্রেম আধার, রূপ আধেয়। উভয়ের পারম্পর্যেই সার্থকতা। কিন্তু বৈষ্ণব মহাজনদের চোখে কে যেন প্রেমের অলৌকিক অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা দেখিলেন রূপে রসে মাখামাখি হইয়া একজন আসিয়াছেন; তিনি আধারও বটে, আধেয়ও বটে। ভগবান্‌ও বটে, ভক্তও বটে। আস্বাদ্যও বটে, আস্বাদিকাও বটে। অপূর্ব পরিকল্পনা! ইহার তুলনা নাই।

প্রেমলম্পট ভগবান বৃষভানুনন্দিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। আর শ্রীমতীর নয়নমন ভুলিয়া গেল তাঁহার আরাধ্যের রূপে। শুধু কি রূপে? তাঁহার প্রাণমনও উদ্‌ভ্রান্ত হইল বাঁশীর রবে। 'কদম্বের বন হইতে কি যে শব্দ আচম্বিতে' কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহাতেই ত পাগল করিয়াছে। নবমেঘের গর্জনের ন্যায় এ কি অপূর্ব ধ্বনি! বাঁশীর স্বরলহরী ভুবন ভাসাইয়া দিতেছে। এ অপূর্ব বাঁশী যাহার, তাহার পায়ে আপনাকে বিলাইয়া দিতে ইচ্ছা হয় কেন? মনে হয় এমন মধুর সঙ্গীত কখনও শুনি নাই, আবার মনে হয় এই মধুর সঙ্গীত শুনিয়া কেহ প্রাণ ধরিতে পারে কি? এমন আকুল আহ্বানে কেহ কি তিলার্ধ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে? এ যে তপ্ত ইক্ষু চর্বণের ন্যায় উষ্ণ অথচ মধুর; মুখ জ্বলিয়া যায়, অথচ ত্যাগ করিবারও সাধ্য নাই। এ যেন অমৃত এবং গরল মিশাইয়া কে বাঁশী বাজাইতেছে!

বাঁশীর গানের এই অপূর্ব কল্পনা একমাত্র বৈষ্ণব কবিতায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যে গানে

যোগী যোগ ভুলে মুনির ধ্যান টলে।
ধায় কামিনী কাননে ত্যজি কুলে —নৃসিংহদেব

যে গানে বনের পশু পাখী মোহিত হয়, যে গানে জলের মকর মীন ভাসিয়া উঠে, মৃত তরু মুঞ্জরে, যমুনা উজান বহে, পাষাণ বিগলিত হয়, সে-ই কৃষ্ণের শ্রবণমঙ্গল বাঁশী। শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,

বাঁশী, তোর গানে স্থকিত রে
যমুনা নীর উছলই
মীন ভাসে মুখ চাহই রে।
তোর গানে পাষাণ রে
দরষিত, মৃত তরু মুঞ্জরে
কাননে পশু পাখী ধাবই রে।

এ কি বাঁশী! এ কি সঙ্গীত! যে বাঁশীতে এমন পাগল করে, সে বাঁশী

কেমন, দেখিব ; সে বাঁশী শিখিব। এই কল্পনা লইয়া একদিন শ্রীরাধিকা বাহির হইলেন। আমাকে যে বাঁশীতে এমন করিয়া পাগল করে, আমিও সেই বাঁশী শিখিয়া আমার বন্ধুকে পাগল করিতে পারিব না ? ব্যাধের বাঁশী শুনিয়া হরিণী যেমন জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া ছুটে, আমারও তেমনই দশা হয়। সুতরাং আমি ঐ বাঁশী শিখিব।

মঞ্জু বঞ্জুল কুঞ্জ ভবন। অস্থির মলয় পবন দূর হইতে দূরান্তরে সঙ্গীতের তান বহন করিতেছে। শ্রীরাধা আসিয়া বাঁশীটি প্রিয়তমের হস্ত হইতে লইয়া বসনাঞ্চলে লুকাইলেন। বলিলেন,

'আমায় শিখাও, নহিলে বাঁশী দিব না।'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'বেশ ত, এ আর কঠিন কথা কি ? তুমি আমার প্রেমের গুরু। আবার আমার 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' হইতে সাধ হইয়াছে, এ ত সুখের কথা।'

তখন শ্রীমতী বাঁশীটি ধরিয়া প্রতি রন্ধ্রে অঙ্গুলি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

'কোন রন্ধ্রে কি সুর বাজে আমাকে একে একে বুঝাইয়া দেও দেখি। কোন রন্ধ্রে বাঁশী বাজাইলে, রসালে পারিজাত ফুটে। কোন রন্ধ্রে ফুঁ দিলে ষড় ঋতুর এক সঙ্গে আবির্ভাব হয়, কোন রন্ধ্রে, প্রিয়তম, আমার নাম ধরে' ডাক ? আমায় বলে' দেও।'

মুরলী করাহ উপদেশ।
যে রন্ধ্রে, যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥

* * * * *

কোন্ রন্ধ্রে, রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে, কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে, ষড় ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে, নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥

শ্রীকৃষ্ণ একে একে সকল রন্ধ্রের পরিচয় দিলেন। তখন অতি যত্নে সোল্লাসে শ্রীমতী সেই শ্রীকৃষ্ণাধরচুম্বিত জাতিকুলহরা বাঁশীতে নিজ অধরপুট সংলগ্ন করিয়া ফুঁ দিলেন।

কিন্তু বাঁশী বাজিল না। প্রাণমন শক্তিতে শ্রীমতী বাঁশী পূরিলেন, কিন্তু কোন ধ্বনিই নির্গত হইল না। তখন তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন,

'এ কোথাকার ভাঙ্গা বাঁশী তুমি আমাকে দিয়াছ! এ বাঁশী বাজে না।'

তখন কৃষ্ণ নিজ বাঁশীতে ফুঁ দিলেন। বাঁশী বাজিল, ভুবন মোহিত হইল। নিজের অপটুতার জন্য রাধার চোখে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইল। তিনি কৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে আবারও বাঁশীতে ফুঁ দিলেন, কিন্তু বাঁশী বাজিল না।

'তোমার বাঁশীতে কোন যাদুবিদ্যা আছে। একা তোমার মুখেই তোমার বাঁশী বাজে, অন্য কাহারও মুখে এ বাজিকরের বাঁশী বাজে না, এ কথা আগে বলিলেই ত হইত!'

শ্রীমতীর অভিমান দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মৃদুমন্দ হাসিতেছিলেন। এইবার তিনি বলিলেন,

'ওঃ ঠিক ঠিক। এ বাঁশী ত অমনি বাজিবে না। তুমি আমার মত ধড়া চূড়া পর, গলে বনমালা দোলাও, এবং আমার মত চরণে চরণ থুইয়া হেলিয়া দাঁড়াও, তা হলেই বাঁশী বাজিবে।'

'বা রে। আমি এখানে ধড়া চূড়া কোথায় পাইব?'

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তুমি পরিবে? আমি সব দিতেছি।'

তখন কৃষ্ণ তাঁহার পীতধড়া, মোহনচূড়া সমস্ত খুলিয়া শ্রীমতীকে পরাইলেন, আদর করিয়া বনমালা পরাইয়া দিলেন। এবং নিজে শ্রীরাধিকার শাড়ী পরিয়া লইলেন। সখীরা ফুল তুলিতে তুলিতে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছিল। কাজেই এ বেশ পরিবর্তন অনায়াসেই নিষ্পন্ন হইল। শ্রীমতী ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া বাঁশীতে ফুঁ দিলেন। বাঁশী বাজিল। এমন মোহন সুরে বুঝি বাঁশী আর কখনও বাজে নাই। সখীরা দূর বন হইতে

উচ্চকিত হইয়া শুনিল। তাহারা ফুল তোলা ত্যাগ করিয়া নিকুঞ্জ কাননের দিকে ছুটিল।

শ্রীরাধা তাঁহার প্রাণবন্ধুকে বলিলেন, 'এই রন্ধ্রে আমার নাম বাজে ত? আমার মুখে আমার নাম কেমন বাজে একবার শুনিব।'

শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়া দিলেন। বাঁশী ত রাধা বলিল না, বাজিল 'কৃষ্ণ'!

বড়ই মিষ্ট লাগিল। যত বাঁশী বাজান, তত বলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ।'

শ্রীকৃষ্ণ তখন রাধার মুখের নিকট মুখ লইয়া সেই রন্ধ্রেই ফুঁ দিলেন। বাঁশী বাজিয়া উঠিল, 'রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ।'

সখীরা দূর হইতে শুনিল। ভাবিতে লাগিল, আজ কে বাঁশী বাজাইতেছে? এমন প্রাণমন আকুল করিয়া, সুধাসিন্ধু মন্থন করিয়া কে এমন মোহন সুরে বাঁশীতে অপূর্ব তান ধরিল? দেখি, দেখি। ও কি? এ আবার কে? গৌরবর্ণ ত্রিভঙ্গিম মুরলীধর নিজের রূপে বন আলো করিয়াছে? উহার বামে ঐ চিকণশ্যামবর্ণা রমণীই বা কে? এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই। মরি মরি! এ রূপ দেখিলে যে রমণীরও চোখ ফিরে না। এ কে?

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়॥
*   *   *   *
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী।
নীল উজলি নীলমণি॥
*   *   *   *
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এ রূপ হইবে কোনও দেশে॥

নবদ্বীপে এই গৌরবর্ণ ত্রিভঙ্গিম নটবর আসিয়াছিলেন। ভক্তেরা আবেশে সে রূপ দেখিয়াছিলেন।

শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবর বেশ।
চরণে নূপুর বাজে সর্বাঙ্গে চন্দন ;
বংশীবদনে কহে চল গোবর্ধন ॥

চণ্ডীদাস কি ধ্যানে জানিতে পারিয়াছিলেন? মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আগমনী গাহিলেন—চণ্ডীদাস। আজ একথা বলিতে হইলে অনেক সাহসের প্রয়োজন। কারণ এক চণ্ডীদাসের স্থলে এখন বহু চণ্ডীদাস হইয়াছেন। আমরা অঙ্গদের রায়বার করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি—এ কোন চণ্ডীদাস? সেদিন দেখিলাম 'সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম' এই প্রসিদ্ধ পদটি চৈতন্যের পরবর্ত্তী এক অখ্যাতনামা চণ্ডীদাসের। তার অকাট্য প্রমাণ এই যে রূপ গোস্বামীর কবিতায় উহার অনুরূপ ভাব আছে। কিন্তু রূপ গোস্বামীর কবিতায় কি চণ্ডীদাসের ছায়া পড়িতে পারে না? চণ্ডীদাস বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহার ভাব শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এবং তাঁহার সমসাময়িক কবির মধ্যে পাওয়া যাইবে, ইহাই ত স্বাভাবিক। কিন্তু এখন ইহার বিপরীত যুক্তিতর্কেরই সমাদর বেশী। যেহেতু চণ্ডীদাসের কবিতায় নামের প্রভাব সুস্পষ্ট এবং মহাপ্রভু স্বয়ং নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন ; অতএব ইহা নিঃসংশয় যে চণ্ডীদাস চৈতন্যের ভাবধারা হইতে তাঁহার কবিতার রসায়ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই চণ্ডীদাস চৈতন্যের পরবর্ত্তী না হইয়া যান না।

এইরূপ যুক্তিতে আমার আদৌ শ্রদ্ধা নাই। তাহার কারণ এখনও ইহা সপ্রমাণ হয় নাই যে শ্রীচৈতন্য যে ভাবপ্রবাহে অবগাহন করিয়া মূর্তিমান মহাভাব হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূল প্রপাত চণ্ডীদাসের কবিতা যোগায় নাই। আমরা জানি যে চণ্ডীদাসের কবিতা মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন, সুতরাং ইহা ভাবাই স্বাভাবিক যে সেই ভাবসিন্ধু-অবতারের অনেকগুলি তরঙ্গ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যোগাইয়াছিলেন। আমার এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, এতদিন বাংলার বৈষ্ণব

সমাজে যে বদ্ধমূল ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বাভাস দিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনও পণ্ডিত হয়ত চৈতন্য পরবর্তী কোনও চণ্ডীদাসের স্কন্ধে চাপাইতে চাহিবেন! অর্থাৎ চৈতন্যের পরবর্তী কোনও চণ্ডীদাস লোক ঠকাইবার জন্য এইরূপ এক ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া থাকিবেন! ইহা নিশ্চয়ই চৈতন্যের প্রকটাবস্থার পরে লেখা! যাঁহারা এরূপ মনে করিতে পারেন, তাঁহারা বৈষ্ণব কবিগণকে চেনেন নাই। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা মুনিদের জন্য 'ঋষি' শব্দটি আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল; আর ধ্যানপ্রণত বৈষ্ণব কবিদের জন্য 'মহাজন' নামক নূতন শব্দটির আমদানী করিতে হইয়াছে। ইঁহারা মিথ্যাকথা কহিবেন বলিয়া মনে হয় না। 'আজু কে গো মুরলী বাজায়' এই পদটি কল্পনার মৌলিকতায়, ভাবের কোমলতায় বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবির অনুপযুক্ত বলিতে পারা যায় না। তাই তাঁহার মুরলী-শিক্ষায় যে সৌন্দর্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরম উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে।

স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা

অনেকে মনে করেন যে, বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে পরকীয়া-বাদ পরবর্তী কালে প্রবেশ করিয়াছে; ষড় গোস্বামীদের মধ্যে কেহ উহা অনুমোদন করেন নাই।* আমরা জানি যে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে স্বকীয়া-বাদের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরূপ এবং শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্তবাবলী পাঠ করিলে তাঁহারা পরকীয়া-বাদের বিরোধী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

* Thus the Six Gosvamins at any rate do not countenance the Parakiya-Vada which developed at a later period in Bengal Vaisnavism.—Professor Sushil Kumar De's Introduction to Padyavali of Rupa Gosvamin—Page Lxxvii

তাঁহাদের কাব্যে, স্তবে ও গানে প্রেমের যে চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে প্রেমকে কোনও কৃত্রিম সীমার দ্বারা বিভক্ত বা নির্দিষ্ট করিবার চেষ্টা দেখা যায় না।

শ্রীরাধিকা প্রেমের পরাকাষ্ঠা। যে প্রেম কোনও বিধি-নিষেধের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে, যে প্রেম প্রেমিক ও প্রেষ্ঠের মধ্যে কোনও প্রভেদ রাখে না, যে প্রেমে স্বার্থানুসন্ধান নাই, তাহারই চিদানন্দঘন মূর্তি শ্রীরাধা। যাঁহারা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিত পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলে খুসী হয়েন, তাঁহারা সংসারের নীতিবাদীদের মাপকাঠি হস্তে লইয়া একটি সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সংসারের খুঁটিনাটির উপরে না উঠিতে পারিলে এই প্রেমের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা বৃথা হয়। পৃথিবীর মায়া-মোহের অতীত কোনও অবস্থায়, রক্তমাংসের আকর্ষণ হইতে দূরে—বহুদূরে আপনাকে স্থাপন করিতে পারিলে বিশুদ্ধ রতির স্বরূপ সাধকের চক্ষে প্রতিভাত হয়। তখন সামাজিক রীতিনীতি, যুক্তিতর্কের বাঁধ ভাসাইয়া হৃদয়ে যে নির্মল স্বচ্ছ মুক্তধারা বহে, তাহারই মাঝে কমলে-কামিনীরূপে বিকশিত হইয়া উঠে যে প্রেমময়ী মূর্তি—তাহাই বৈষ্ণবদিগের রাধা। মহাবিরক্ত, রিক্তস্বার্থ, ভজনসাধনপরায়ণ বৈষ্ণব সাধুদিগের সম্বন্ধে আর যাহাই বলা যাক্, তাঁহারা যে দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা ছিলেন এ কথা বলিলে অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। সুতরাং স্বকীয়া-পরকীয়াবাদের দুর্গম গহনে প্রবেশ করিতে হইলে মনে রাখা আবশ্যক যে, স্বর্গীয় প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণে জাগতিক মাপকাঠি সর্বদা সহায়তা করে না। নদীর জল মাপিতে দীর্ঘ বংশখণ্ড যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সমুদ্রের জল মাপিতে উহার উপযোগিতা বা সামর্থ্য কোথায়?

প্রসিদ্ধ গোস্বামিচরণগণ যে কবিতাবলী, স্তবমালা এবং কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের ঝোঁক কোন দিকে ছিল, বুঝিতে কঠিন হয় না। তাঁহাদেরই একখানি ক্ষুদ্র কাব্য হইতে

আমরা বক্তব্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কাব্যখানির নাম বিলাসমঞ্জরী বা স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা। স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা অর্থে স্বয়ং-দৌত্য। একদিন শ্রীরাধা গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও অধীর হইয়া উঠিলেন শ্যামসুন্দরকে দেখিবার জন্য। অতঃপর তিনি সূর্যপূজার জন্য পুষ্পচয়নচ্ছলে গৃহত্যাগ করিয়া যমুনা পুলিনে গমন করিলেন! তথায় পবনচালিত অঙ্গ-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ নিকটেই আছেন। অতঃপর সেইদিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন. শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জসমীপে নীপতরু অবলম্বন করিয়া ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণদর্শন-জনিত ভাবাবেশে মন্থরগতি হইয়া নিকুঞ্জকাননে পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইলেন—যেন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াও দেখেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কুসুমচয়নে নিরতা দেখিয়া তাঁহার দিকে মৃদু হাস্য করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। বলিলেন, কে তুমি, আমার নিকুঞ্জবনে এমন উপদ্রব করিতেছ? সুন্দর গোরোচনাচর্চিত প্রশস্ত ললাটযুক্তা শ্রীমতী গ্রীবা বাঁকাইয়া চঞ্চলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন এবং ঈষৎ ভ্রূকুটী করিয়া বস্ত্রদ্বারা আপনার দেহ উত্তমরূপে আবৃত করিলেন এবং কিছু দূরে সরিয়া গেলেন। ভাব এই যে, আমি সূর্যপূজার জন্য ফুল তুলিতেছি, তুমি আমাকে কেন বিরক্ত করিতে আসিলে? শ্রীমতী যাইতে যাইতে অদূরে যমুনাতটে নিবিড়পল্লব একটি মল্লিকা ফুলের লতামণ্ডপ দেখিতে পাইলেন এবং তাহার মধ্যে যেন লুক্কায়িত রহিলেন। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া তথায় গমন করিলেন এবং শ্রীরাধাকে বলিলেন হে চন্দ্রমুখি, তুমি আমার কাননে পুষ্পরাজি লুণ্ঠন করিতেছ কেন? কোমল লতাগুলির অঙ্কুর ভাঙিয়া ফেলিতেছ কেন? শ্রীরাধা ঈষৎ কোপ করিয়া বলিলেন, বাঃ আমরা দেবপূজার জন্য চিরদিন এই নির্জন বনে ফুল তুলিয়া থাকি, এতদিন কেহই ত আমাদিগকে নিষেধ করে নাই? আজ তুমি কেন এইরূপ প্রগল্ভ বাক্য বলিতেছ? হে কমলনয়ন! আজ আমার গৃহে মহতী ক্রিয়া আছে, সেইজন্য ফুল

লইয়া আমাকে শীঘ্র গৃহে গমন করিতে হইবে, অতএব বৃথা বিলম্ব করিয়া দিও না। (ব্যঞ্জনা এই যে গৃহে কোনই কাজ নাই, বনে বিলম্ব হইলেই ভাল।)

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি পৃথিবীপতি অনঙ্গদেব কর্তৃক এই বনের রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছি ; সুতরাং যদি কেহ এই উদ্যানের একটি শীর্ণ পত্র বা ফুলদলার্ধ অপহরণ করে, তাহা হইলে আমি তাহার বস্ত্রবিত্ত সব কাড়িয়া লই। হে কাঞ্চনগৌরি! আজ আমি তোমাকে ধরিয়াছি—তুমিই আমার উদ্যানের পত্রপুষ্প এমন করিয়া প্রতিদিন ছিন্ন করিয়া থাক! প্রত্যুত্তরে কোপসহকারে শ্রীরাধা বলিতেছেন :—

স্বপতিঃ পিশুনঃ কুপিতঃ পিশুনঃ
সদনে মুখরা জরতী মুখরা
চতুরা গুরবো ভবিতা কুরবো
ব্যসনং পুরুষেশ্বর কিং কুরুষে।

হে পুরুষেশ্বর! আমার পতি আমার দোষ প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। (স মে পতির্ধবঃ পিশুনঃ পত্ন্যাশ্ছিদ্রসূচকঃ।) তিনি কুপিত হইয়া আমাকে বিশেষ যন্ত্রণা দেন। বাড়ীতে প্রখরা মাতামহী অতি মুখরা ; শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনেরা আমার ছল অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত। অতএব আমাকে বৃথা বিলম্ব করিয়া দিবার বিফল চেষ্টা (ব্যসন) করিলে তোমার ও আমার উভয়ের নিন্দা হইবে? সূর্য অস্তগামী হইতেছেন অতএব আর বিলম্ব করাইও না।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কিন্তু কেমন করিয়া তোমাকে যাইতে দিব। আমার বোধ হইতেছে, তুমি অনেক মাধবী ফুল তুলিয়া তোমার কবরী ও কঞ্চুক মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ। আমি মন্মথরাজের কর্মচারী মাত্র, তোমাকে ত ছাড়িতে পারি না। হে স্থির সৌদামিনীদ্যুতি! একবারটি এস, সমস্ত দেখাইয়া গৃহে গমন কর।

শ্রীরাধা বলিলেন :—

ন মুধা মাধব রচয় বিবাদং
বিদধে তব মুহুরহমভিবাদং।
গোকুল বসতো স্মরমিবমূর্ত্তং
ন কিমু ভবন্তং জানে ধূর্ত্তং ॥

হে মাধব, আমি তোমাকে বার বার প্রণাম করি, তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যা কলহ করিও না। হে ধূর্ত, এই গোকুলমধ্যে তুমিই ত সাক্ষাৎ মন্মথ ইহা কি জানি না? অর্থাৎ আবার নিজকে কেন মিছা মন্মথের কর্মচারী বলিয়া পরিচয় দিতেছ?

বেত্তি ন গোপী-বৃন্দারামং
বৃন্দাবনমপি ভুবি কঃ কামং।
অহমিহ তদিদং কিতব রসালং
কথমবচেষ্যে ন কুসুমজালং ॥

হে কপটী, এই বন আমাদের গোপীবৃন্দের; আমাদেরই বৃন্দা সখী ইহার পালিকা। তাহা কে না জানে? এখানে মন্মথ আবার কে? (এই বৃন্দাবনে কামের অধিকার নাই) সুতরাং আমি ফুল তুলিব। তুমি বারণ করিবার কে?

শ্রীরাধার উক্তি বাহিরে কঠোর কিন্তু অন্তরে কোমল বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কুঞ্জগৃহে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, যদি একান্তই গৃহে গমন করিতে বাসনা, তবে শত শত ভ্রমর-বীর রক্ষিত এই কুঞ্জগৃহে চল।

শ্রীরাধা তখন বলিলেন,

গোকুলে কুলবধূভিরর্চ্চিতা
শীল চন্দন-রসেন চর্চ্চিতা
রাধিকাহমধিকারিতামতঃ
কিং করোষি ময়ি ধূর্ত্ত কামতঃ ॥

হে ধূর্ত! আমার নাম রাধিকা, সচ্চরিত্রতারূপ চন্দন-রসে অনুলিপ্ত বলিয়া সমস্ত গোকুল-বধূগণ আমাকে অর্চনা করিয়া থাকেন, অতএব তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে অধিকার করিবার জন্য এ কি করিতেছ?

শ্রীকৃষ্ণ ধৃষ্টতা করিতে উদ্যত হইলে রাধিকা হরিণী এবং ময়ূরীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, তোমরা সকলে সাক্ষী হও, দেখ, মাধব আমার প্রতি কিরূপ উপদ্রব করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে বলিলেন, হে সুন্দরি! তুমি আমাকে ব্যঙ্গার্থ-সুধায় (বাহিরে কঠোর, অন্তরে কোমল) তৃপ্ত করিয়া আবার সুন্দর সকোপদৃষ্টি করিতেছ কেন? আজ তুমি হরি-হস্তে নিপতিত হইয়াছ, কে তোমাকে রক্ষা করিবে?

বৃত্তা ত্বং হরিহস্তে ত্রাতাঽন্যো ভুবি কস্তে?

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার নর্ম্মগর্ভ বাক্যশ্রবণে রাধিকার বসন স্খলিত হইল, তিনি গদগদ স্বরে অস্পষ্ট ভাষায় অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই রূপ মন্দ-হাস্যযুতা, চঞ্চলকটাক্ষ-শোভিতা প্রেমিকা-রমণীশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে যিনি কুঞ্জগৃহে লইয়া গেলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর এই কাব্য হইতে এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীর

হে সুন্দরি! পশ্য মিলতি বনমালী।

প্রভৃতি পদাবলী হইতে কি ইহাই ধারণা হয় যে বড় গোস্বামীদের মধ্যে কেহই পরকীয়া-বাদের অনুমোদন করেন নাই?

মুরারি গুপ্তের একটি পদ মনে পড়ে:

খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বঁধু বিনা আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপুতে কয় পিরীতি এমতি হয়
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

খণ্ডিতা

অলঙ্কারশাস্ত্রে অবস্থাভেদে অষ্টপ্রকার নায়িকার কথা আছে : স্বাধীনভর্তৃকা, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্তৃকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা। নায়িকার এই সকল অবস্থাবিচারে বিচিত্ররসের সৃষ্টি হয়। প্রিয়-সমাগমের জন্য অভিসার করিয়া নায়িকা সঙ্কেত কুঞ্জে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সাজল কুসুম শেজ পুন সাজই
জারই জারল বাতি।

পুনঃপুনঃ আগমনের পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর রচিত ফুলশয্যা পুনরায় ফুল দিয়া সাজাইতেছেন আর প্রজ্বলিত দীপ আরও উজ্জ্বল করিতেছেন; একবার অঙ্গে অলঙ্কার পরিতেছেন আবার প্রিয়তমের বিলম্ব দেখিয়া সে সকল খুলিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু এইভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রজনী প্রভাত হইল। তখন

উমত ঝুমত চরত চরত
চরণ ধরত থোর।

এইভাবে শ্যামসুন্দর শ্রীরাধার কুঞ্জে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীমতীর ক্রোধের সঞ্চার হইল।

ন মানিনীশং সহতেঽন্যসঙ্গমম্—ভট্টিকাব্য

মানিনী নায়িকা প্রিয়তমের অন্য-সংসর্গ সহ্য করে না। এই এবস্থাটি খণ্ডিতা নায়িকার অবস্থা।

পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্য-সম্ভোগ-চিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা ॥—সাহিত্য-দর্পণ

অর্থাৎ অন্য রমণীর সঙ্গে রজনী যাপন করিয়া অঙ্গে সম্ভোগ-চিহ্ন লইয়া উপস্থিত হন, তাঁহাকে দেখিয়া ঈর্ষান্বিতা যে রমণী তাহাকে খণ্ডিতা বলে।

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্

ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা ॥—উজ্জ্বলনীলমণি।

যে নায়িকার প্রিয়তম অন্য রমণীর সঙ্গ উপভোগ করিয়া সেই উপভোগশ্রী সমন্বিত হইয়া সময় উল্লঙ্ঘনপূর্বক প্রাতে আগমন করেন সেই খণ্ডিতা।

প্রেমের গতি সব সময়েই কুটিল। এই কুটিলতাময় প্রেমের সুরগুলি বৈষ্ণব কবিদের আলেখ্যে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, এরূপ আর কোনও সাহিত্যে দেখা যায় না। জয়দেবের সময় হইতেই এই খণ্ডিতা নায়িকার রসে বৈষ্ণবসাহিত্য ভরপূর।

শ্রীজয়দেব ভণিত রতিবঞ্চিত খণ্ডিত যুবতী বিলাপম্।

শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্॥

সনাতন গোস্বামী (অথবা শ্রীরূপ গোস্বামী ?) এই খণ্ডিতার রস আস্বাদন করিয়াছেন :—

যাং সেবিতবানসি জাগরী।

ত্বামজয়ত সা নিশি নাগরী॥

কপটমিদং তব বিন্দতি হরে।

নাবসরং পুনরালি-নিকরে॥

হে কৃষ্ণ! তুমি রাত্রি জাগরণ করিয়া যে রমণীর সেবা করিয়াছ, সে তোমাকে পরাজয় করিয়াছে (রতিরণে), (এই সকল দেখিয়া) আমার সখীরা তোমার কপট বাক্যে বিশ্বাস করিতেন না। অতএব—

যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতব বাদং (জয়দেব)

সেখানে যাও, যেখানে কমলনয়না রমণী তোমার দুঃখ ঘুচাইবে।

খণ্ডিতার মধ্যে এই অভিমানের সুরটিই অধিক বাজিয়াছে। তুমি আমার চরস্তন বন্ধু আমি তোমাকে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি, তুমি আমাকে নির্লজ্জের

মত মুরলী সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া অন্য রমণীর সহিত নিশি যাপন করিলে, অতএব আর এমন পীরিতিতে কাজ নাই।

ধিক রহু মাধব তোহারি সোহাগ।
ধিক রহু যো ধনি তোহে অনুরাগ॥
চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ।
কৈতব বচনে অবহু কিয়ে কাজ॥—বলরাম দাস

যাঁহারা আধ্যাত্মিকভাবের সন্ধানী, তাঁহারা ভক্ত ভগবানের মধ্যে এই মান-অভিমানের পালা দেখিতে পান। ভক্ত ভগবানকে অনন্যশরণ হইয়া ভজনা করেন; কিন্তু ভগবান্ ত একের একান্ত বশীভূত হইতে পারেন না। কাব্যের ভাষায়, রসের ভাষায় তাই ভগবানকে বহুবল্লভ বলা হয়।

বৈষ্ণব কবিতার কাব্যরসই মূলতঃ আস্বাদ্য, আধ্যাত্মিকভাব তাহার অনুগামী। আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকে প্রাধান্য দিলে কাব্যরসের অনুপম মাধুর্য হারাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে। আহার করিবার সময় যেমন আস্বাদনের দিকেই বেশী মনোযোগ থাকে, মধুর অম্ল প্রভৃতি বিচিত্র রসের পরিবেশনে যেমন আহার্য রুচিকর হইয়া উঠে এবং ক্ষুধার নিবৃত্তি তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল, বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধেও আমার বোধ হয় কবিদের সেইরূপ অভিসন্ধি দেখা যায়। আস্বাদনের জন্যই রসপারিপাট্য, সেই জন্যই এই গীতি-কবিতা ভক্ত-অভক্ত সকলের পক্ষে চিরন্তন আস্বাদ্য হইয়া রহিয়াছে।

যাহা হউক, এই খণ্ডিতা-রস বৈষ্ণব কবিরা কিভাবে আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই আলোচনা করা যাক্। বিদ্যাপতির খণ্ডিতার অনেকগুলি পদ আছে, যথেচ্ছভাবে দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

সহস রমণী সোঁ ভরল তোহর হিয়
করু তনি পরসি ন ত্যাগে।
সকল গোকুল জনি সে পুনমতি ধনি
কি কহব তহিক ভাগে॥

পদ-জাবক হৃদয় ভিন অছ
অরু করজ খত তাহে।
জাহি যুবতি সঙ্গে রয়নি গমৌলহ
তত্তহি পলটি বরু জাহে ॥—তালপত্রের পুঁথি

তোমার হৃদয় সহস্র রমণী দ্বারা পূর্ণ। (কিন্তু) তাহার স্পর্শ ত্যাগ করিও না। গোকুলে সকল নারীর অপেক্ষা সেই রমণী পুণ্যবতী, তাহার ভাগ্যের কথা কি বলিব? পদের অলক্তকরাগ এবং হৃদয়ে নখরেখার দ্বারা সে কর্জ্জখত লেখাইয়া লইয়াছে। যে রমণীর সঙ্গে রজনী কাটাইলে বরং তাহার নিকট ফিরিয়া যাও। তোমার

প্রতি অঙ্গে রতি চিন বেকত হোয়।
করতলে চাঁদ ধপাবয় কোয় ॥—কীর্ত্তনানন্দ।

চণ্ডীদাসের অনবদ্যপদ—

ভাল হইল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥

কোনও কোনও বিষয়ে এই পদটির তুলনা বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই। শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতে সঙ্কেত-কুঞ্জে আসিয়াছেন, তাঁহার নয়ন অর্ধ নিমীলিত নিশি জাগরণের ফলে, বক্ষে যাবকলেখা ও খর নখর-ক্ষত। এ অবস্থায় নায়িকার অত্যন্ত ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ হইলে, চোখের জলে দৈন্য প্রকাশ পাইলে, পরাভবের গ্লানি স্বীকার করিতে হয়। কাজেই তিনি বক্রোক্তির সাহায্যে মনোভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ নায়িকাকে "ধীরা মধ্যা" খণ্ডিতা বলে। সাপরাধ নায়ককে হাসিয়া হাসিয়া তীব্রশ্লেষোক্তির দ্বারা যে নায়িকা পীড়া দান করে তাহাকে ধীরামধ্যা বলে। যে নায়িকা ঐরূপ অবস্থায় কাঁদিয়া কাটিয়া নায়কের সন্তাপ উৎপাদন করে, তাহাকে বলে 'ধীরাধীরা মধ্যা'; আর যে নায়িকা কটূক্তির দ্বারা নায়কের মনস্তাপ ঘটায় তাহাকে 'মধ্যা অধীরা' বলে। বক্রোক্তির অর্থ:

অন্যস্যান্যার্থকং বাক্যমন্যথা যোজয়েদ্ যদি।
অন্যঃ শ্লেষেণ কাক্কা বা সা বক্রোক্তিস্ততো দ্বিধা॥

যিনি কথা বলিতেছেন, তাঁহার বাক্য যদি বাহ্যতঃ এক অর্থ বহন করে আর অন্য অর্থ বক্তার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বক্রোক্তি অলঙ্কার বলে।

শ্লেষপূর্ণ বাক্যের দ্বারা বা বিকৃত স্বরের দ্বারা এই ব্যঙ্গ গূঢ় অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে। বেণীসংহারে ভীমকে দুঃশাসনের রক্তপান করিতে দেখিয়া যখন অশ্বত্থামা কর্ণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন

"অঙ্গরাজ! সেনাপতে! দ্রোণোপহাসিন্
রক্ষ সাম্প্রতম্ ভীমাদ্ দুঃশাসনম্।"

তখন তাহার প্রত্যেকটি বাক্য শাণিত ছুরিকার ন্যায় শ্রোতার অন্তরে প্রবেশ করে। অভিনয়ের স্থলে স্বরের ঈষৎ বিকৃতির দ্বারা এই উক্তিকে আরও কঠোর করিয়া তোলা হয়। পূর্বে যে পদটির উল্লেখ করিয়াছি—ভাল হৈল আরে বন্ধু—ইহার নিষ্ঠুর শ্লেষ সহজেই পীড়াদায়ক, কীর্তন গায়ক স্বরের কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য সাধন করিয়া ইহাকে অপূর্ব করিয়া তোলেন। সঙ্গীতে স্বরভঙ্গীর দ্বারা বিদ্রূপকে যে এমন ফুটাইয়া তোলা যায়, তাহা না শুনিলে বিশ্বাস করা কঠিন। বস্তুতঃ কোনও সঙ্গীতেই বিদ্রূপের এরূপ অভিব্যক্তি দেখা যায় না। এইজন্য গীতটির বৈশিষ্ট্য অদ্ভুত! কবি আগাগোড়া এই অলঙ্কার ঠিক রাখিয়াছেন। পদটি সুপরিচিত হইলেও এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

[বন্ধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই॥

তোমাকে শতমুখে প্রশংসা করি, কারণ তোমার যে অপূর্ব শ্রী হইয়াছে, তাহা দেখিবার যোগ্য। (এই কথা শুনিয়া যখন নায়ক মুখ লুকাইতেছেন তখন বলিলেন) তুমি একবার আমার দিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াও, তোমার অনিন্দ্যসুন্দর (নূতন শোভায়) মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখি।]

আই আই পড়েছে রূপে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনোলোভা॥

কি অপরূপ শোভাই হইয়াছে! সখী (আই আই) তোরা একবার দেখিয়া যা। একেবারে কাজলে সিন্দুরে মাখামাখি! কালোরূপে কি সুন্দর মানাইয়াছে।

খরনখ দশন অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাড়ী কোঁচার বলনি।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥

চিরদিন ত তোমার পীতধটী পরাই অভ্যাস, আজ একি সুন্দর সাজ! রমণীর নীলশাড়ী পরিয়া আসিয়াছ, তাহাতে আবার কোঁচা দুলাইয়াছ!

সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে॥

তোমার বক্ষে সুলোহিত অলক্তক রেখা সুন্দর মানাইয়াছে। এমন করিয়া কে তোমাকে সাজাইল বল দেখি? সেই রসিকা রমণী রতিরণে তোমাকে পরাভব করিয়া বোধ হয় পদাঘাত করিয়াছে, অথবা প্রেমে বশীভূত হইয়া তাহার অলক্তক-রঞ্জিত পদযুগল তুমি নিজে বক্ষে ধারণ করিয়াছ! এখন বল, তোমার জন্য আমি কি করিতে পারি? আমি তোমার এই নবপ্রেমোৎসবে সব কিছু করিতে সতত প্রস্তুত আছি।

চারি পানে চাহে নাগর আঁচরে মুখ মোছে।
চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে॥*

* পদটি পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে গোপালদাসের ভণিতায় আছে। গোপালদাস বা রামগোপাল দাস পীতাম্বর দাসের পিতা। পিতার সম্বন্ধে পুত্র সঠিক সংবাদ না দিয়া পারেন না, এই মনে করিয়া অনেক গবেষক এই পদটি চণ্ডীদাসের বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু সব দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই উৎকৃষ্ট পদটি চণ্ডীদাসের বলিয়াই মনে হয়। খণ্ডিতার মধ্যে চণ্ডীদাস-রচিত বহু পদ পাওয়া যায়। একই ভাবের সুন্দর সুন্দর পদ খণ্ডিতার মধ্যে চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের, ইহা না মানিয়া উপায় নাই। গোপালদাসের একটিমাত্র পদ খণ্ডিতায় আছে :—

[নাগর মহা ফাঁপরে পড়িয়া চারিদিকে চাহিতেছেন। কিন্তু ধৃষ্ট নায়ক সহজে হঠিবার পাত্র নহেন। তিনি প্রবঞ্চনার জাল বুনিয়া বলিলেন :—

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেনে একে দেখ আন॥
বংশী-পরশি আমি শপতি করিয়ে।
তোমা বিনে দিবা নিশি কিছু না জানিয়ে॥
ফাগু বিন্দু দেখিয়া সিন্দুর বিন্দু কহ।
কণ্টক কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলিতে চায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থরে থর॥

তুমি তরুণী, তোমার চোখের দৃষ্টি এত খারাপ হইল কি করিয়া? এক দেখিতে অন্য দেখিতেছ। সিন্দুর কোথায় দেখিলে? ও ত ফাগের বিন্দু। (তোমার জন্য সারানিশি জাগিয়া বনে বনে ফিরিয়াছি) তাহারই জন্য বক্ষে কণ্টকের ক্ষত হইয়াছে। কঙ্কণের দাগ বলিয়া তাহাই ভুল করিয়াছ। 'ধৃষ্ট নাগর' অর্থে যে মিথ্যা কথায় দক্ষ। আজ শ্রীমতীর মন রাখিবার জন্য ধৃষ্ট মিথ্যার উপর মিথ্যা কথা অসংকুচিত ভাবে বলিয়া যাইতেছেন। অথচ তিনি তাঁহাকে বুঝাইতেছেন :—

মিছা কথায় যত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যেই সেই সে পাপিনী॥—চণ্ডীদাস]

ছল করি বাণী কতয়ে পরলাপসি
তোহারি বচন পরমাণ।
চারি পহর রাতি জাগিয়া পোহায়লুঁ
আয়লি রাতি বিহান॥ ইত্যাদি

এই পদটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর রচনা, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। রাধামোহন পদামৃত-সমুদ্রে এবং বৈষ্ণবদাস পদ কল্পতরুতে চণ্ডীদাসের ভণিতাই দিয়াছেন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণব প্রভাব

অনেকের ধারণা যে বৈষ্ণধর্ম্মের প্রভাব বঙ্গদেশেই নিবদ্ধ। সে ধারণার হেতু বোধ হয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্লাবনে এ দেশ ভাসাইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের বাহিরেও যে এ ধর্ম্মের প্রভাব ছিল, তাহা ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্বে দক্ষিণভারতে শ্রীরামানুজ আচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারও পূর্বে দক্ষিণদেশে অনেক সাধুসন্ত বৈষ্ণবধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গোপীভজনও অনুমোদন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্যও দক্ষিণদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি বৈষ্ণবধর্মের দুইখানি উৎকৃষ্ট পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। একখানি ব্রহ্মসংহিতা, অপরখানি ভক্তচূড়ামণি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত। মহাপ্রভু নীলাচলে যে সকল পুস্তক অনুক্ষণ আস্বাদন করিতেন, তাহার মধ্যে কর্ণামৃত অন্যতম। দক্ষিণদেশের কবি, ভক্ত ও দার্শনিক রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভু সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন। সেরূপ আলোচনা, সেরূপ ইষ্টগোষ্ঠী কোন ধর্মের ইতিহাসে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। রায় বলিতেছেন—

ইহা আমি কিছুই না জানি,
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট।

—চৈতন্য চরিতামৃত।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীরাম-সীতার লীলাই সমধিক প্রচলিত বলিয়া আমাদের ধারণা। রামসীতার লীলা মহাপ্রভুর সময়ে দাক্ষিণাত্য দেশেও

যে প্রচলিত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। মহাপ্রভু শুধু যে রামসীতার মন্দির দেখিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের অনেক সময় সীতা ও রামের চরিত্র আলোচনা করিয়া কাটাইতেন। উত্তর-পশ্চিমে রামলীলার প্রবল প্রচার হইল তুলসীদাস হইতে। তুলসীদাস আকবরের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাম-চরিতমানস আজিও কোটী কোটী লোকের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইয়া থাকে। তাঁহার দোহা ও চৌপাই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুর কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজ করে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে কৃষ্ণলীলার প্রসারও কম নহে। মহাপ্রভুর সমকালে শ্রীবল্লভাচার্য মথুরামণ্ডলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার জন্ম সন ১০৭১ খৃস্টাব্দ অর্থাৎ বল্লভাচার্য মহাপ্রভু অপেক্ষা সাত আট বৎসরের বড় ছিলেন। তাঁহারও পূর্বে রামানন্দ প্রভৃতি সাধুরা বৈষ্ণবধর্মের সারকথা পশ্চিমাঞ্চলের নরনারীগণকে শুনাইয়া গিয়াছেন। রামানন্দ রামানুজাচার্য্যের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ভক্তপ্রবর কবীর ('কাশীর জোলা'), বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রুইদাস (মুচি) রামানন্দের শিষ্য বলিয়া কথিত হয়েন। নিম্বার্ক নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্যও বঙ্গের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, তুলসীদাসের কিছু পূর্বে সুরদাস শ্রীকৃষ্ণলীলা লইয়া হিন্দীতে অসংখ্য পদ রচনা করিয়াছিলেন। সুরদাসকে বৈষ্ণবমহাজন দিগের মধ্যে গণনা করা হয় এবং তাঁহার কৃত পদাবলী বৈষ্ণবপদসংগ্রহের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। সুরদাস গোকুলে বসিয়া যে সময় তাঁহার সুরসাগর রচনা করিতেছিলেন, প্রায় সেই সময়েই শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য ও কবিগণ বৃন্দাবনে বসিয়া তাঁহাদের অমর কাব্য ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইঁহারা পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় না।

শ্রীমধ্বাচার্য সম্বন্ধে ভক্তমালে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার সহিত

মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি (বল্লভ) শ্রীধরস্বামীর টীকার (শ্রীমদ্‌ভাগবতের) নিন্দা করিলে মহাপ্রভু কানে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন :—

কহেন স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয়।
ভ্রষ্টা করিয়া তাহে বেদেতে কহয়॥

—ভক্তমাল।

এই বল্লভাচার্য নিজেই ভাগবতের একখানি টীকা করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নাম 'বল্লভাচারী'। বল্লভাচার্যের এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম বিঠ্‌ঠলনাথ। বল্লভাচার্য্যের ন্যায় তিনিও শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্যের ৪ জন শিষ্য ছিলেন; বিঠ্‌ঠলনাথেরও শিষ্য ছিলেন ৪ জন। এই আট শিষ্য অষ্টছাপ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

অষ্টছাপের মধ্যে একজন শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম 'নন্দদাস'। নন্দদাস বিঠ্‌ঠলনাথের শিষ্য। নন্দদাস এই নামটি তাঁহার গুরুদত্ত নাম কিনা বলা যায় না। নাম শুনিলেই মনে হয় যে, হয় তিনি কোনও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা গুরু হইতে এই নাম লাভ করিয়াছিলেন।

নন্দদাস শুধু প্রসিদ্ধ অষ্টছাপের একজন ছিলেন না, তিনি বিখ্যাত কবি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার কবি গোবিন্দদাস যেমন শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষালাভ করিয়া অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি লাভ করেন ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা-গানে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, নন্দদাসজিও সেইরূপ গুরু-কৃপায় অপূর্ব প্রতিভাশালী কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা এত মধুর যে, মনে হয় যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমামৃতে তিনি তাঁহার লেখনী ডুবাইয়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতায় জয়দেবের ঝঙ্কার পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জয়দেবের কবিতা যেমন পদ্মাবতীর প্রেমে ফুটিয়াছিল, চণ্ডীদাস যেমন রামীর কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেম অনুভব করিতে পারিয়া-

ছিলেন, বিদ্যাপতির কবিতা যেমন লছিমা দেবীর কৃপা ব্যতীত স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইত না, নন্দদাসের সম্বন্ধেও সেইরূপ কিম্বদন্তী আছে। বিঠ্ঠলনাথের এক শিষ্যা ছিলেন, তাঁহারই আদেশে নাকি নন্দদাসজির প্রাণে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের ফোয়ারা ছুটিয়াছিল।

নন্দদাসজির 'রাস পঞ্চাধ্যায়' শুধু ভাগবতের অনুবাদ নহে। তিনি নিজে লীলারসে ডুবিয়া ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জয়দেব গীতগোবিন্দে বসন্ত রাসের বর্ণনা দিয়াছেন। হরিবংশেও রাসের বর্ণনা আছে। কিন্তু নন্দদাসজি ইঁহাদের গ্রন্থ হইতে আখ্যানভাগ লইলেও নিজের প্রতিভাগুণে তাহাকে সুন্দর কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। হিন্দী সাহিত্যে নন্দদাসের রাসপঞ্চাধ্যায় ও ভম্বর-গীতার (ভ্রমর গীতা) সুখ্যাতি ধরে না। সুরদাসও ভ্রমর-গীতায় অপূর্ব মাধুর্যের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

রাজপুতানায় মীরাবাই গিরিধরলালের প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন। মীরা চিতোরের রাণা ভোজরাজের পত্নী ছিলেন। মীরার অপূর্ব প্রেম-সঙ্গীতে রাজপুতানা এক দিন মাতিয়া উঠিয়াছিল। পরে আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবন ছাড়িতে বাধ্য হইলেন, তখন রাজপুতানা তাঁহাদের আশ্রয় স্থান হইয়াছিল। শ্রীমদনমোহন প্রসঙ্গে জানিতে পারা যায় যে, মূলতান ও পাঞ্জাব এক সময়ে মদনমোহন ও সনাতন গোস্বামীর স্মৃতির সমাদর করিত। পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাংড়া উপত্যকায় এখনও অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দের বৈষ্ণব চিত্র পাওয়া যায়। লাহোর চিত্রশালায় রাধাকৃষ্ণের স্বাধীনভর্তৃকার যে ছবিখানি রক্ষিত আছে, তাহা বস্তুতঃ অতি সুন্দর।*

* 'শ্রীপদামৃত মাধুরী'র তৃতীয় খণ্ডে প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের সৌজন্যে ছবিখানি মুদ্রিত হইয়াছে।

উত্তর বঙ্গে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাব

রাজসাহীর অধিবাসী আমি না হলেও এর সঙ্গে আমার অন্তরের যে নিবিড় যোগ আছে, সেই কথাটি আপনাদের কাছে আগে বলি। আমার এই শেষোন্মুখ কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল রাজসাহীতে। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক পদ লাভ করে' প্রথম যখন আসি, তখন প্রমত্তা পদ্মার সেই বর্ষা-কালের ঢল ঢল রূপ আমাকে মুগ্ধ মূক করেছিল। আমি সেদিন সারাদিন অভুক্ত ছিলাম, কিন্তু তাতে আমার কোনও কষ্ট বোধ হয়নি। তখন আমি বালক বল্‌লেও অন্যায় হবে না। সেদিন পদ্মা আমাকে যে চঞ্চলতার দীক্ষা দিয়েছিল, জীবনে তা ভুলতে পারিনি। তারপরে এসেছিলাম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে—সেও আজ বহুদিন হ'লো। আপনাদের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যখন ভিত্তি স্থাপিত হয় তখন আমি উপস্থিত ছিলাম সে উৎসবে। লর্ড কারমাইকেল যে সৌধের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, আজ তা সারা বাংলার গৌরবস্থল হয়েছে। সুতরাং আপনাদের আভিজাত্যপূর্ণ ইতিহাসের সঙ্গে কোনও রূপে জড়িত হতে পারা যে-কোনও ব্যক্তির পক্ষে সৌভাগ্যের কথা।

আমার দুঃখ এই যে, প্রথম জীবনে যে সকল বন্ধু পেয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ নেই। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার, সুকবি রজনীকান্ত, সুলেখক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ—এঁরা রাজসাহীর লোক, কিন্তু সমগ্র বাংলার দুলাল। এঁদের বন্ধুত্ব লাভ করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাই স্মরণ ক'রে রাজসাহী জেলার এই উৎসব-বাসরে আমার শ্রদ্ধার স্রক্‌-চন্দন তাঁদের উদ্দেশে অর্পণ করি। রাজসাহী থেকে একখানি কাগজ বা'র হতো —তার নাম উৎসব। ব্রজসুন্দর সান্যাল ছিলেন তার সম্পাদক—আমার প্রবন্ধ সে কাগজে বেরিয়েছে। এখন এ অঞ্চলে কোনও কাগজ আছে কিনা জানি না। যদি থাকে, তবে আমার সহানুভূতি তার সঙ্গে অবশ্যই

থাকবে। যদি কাগজ না থাকে, তা'হলে আপনাদের মারফতে আমি এই আবেদন জানাতে চাই, পাঠাগারের সঙ্গে একখানি সাময়িকপত্র থাকলে সোনায় সোহাগা হয়। তার কারণ যেখানেই জ্ঞান, সেখানেই প্রকাশ। সত্ত্বগুণের ধর্মই এই যে, সে প্রকাশশীল। যাঁরা পাঠাগারকে সত্যিকার বস্তু বলে' মনে করেন, যাঁরা তার সমস্ত সার্থকতা দিতে চান, তাঁরা প্রকাশের পথ খুঁজবেনই; কারণ পাঠাগারের সার্থকতা প্রচারে। পাঠাগারের বিস্তৃতিও অনেকটা প্রচারের উপর নির্ভর করছে। তা নইলে ঘরের গৃহিণীরা চাকর পাঠিয়ে মধ্যাহ্ন-বিনোদনের জন্য কতকগুলি পাঠ্য অপাঠ্য নভেল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। আপনাদের এখানে উপস্থিত পরিস্থিতি ঠিক এই রকম কিনা জানিনা। কিন্তু বহু পাঠাগারের সঙ্গে আমি পরিচিত, যেখানে অবস্থা এর চেয়ে বেশী ভাল নয়।

আমাদের অতীত ইতিহাস এমন নৈরাশ্যজনক ছিল না। এই বরেন্দ্র ভূমি একদিন যশঃসৌরভে ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস মুগ্ধ করে' রেখেছিল। সেদিনকার ইতিহাস যদি আমরা ভুলে যাই, তা হ'লে অকৃতজ্ঞতার চরম হবে। অতীত ইতিহাসের সোপানরাজি কোনও জাতির সভ্যতাকে উন্নত হ'তে উন্নততর রাজ্যে পৌঁছে দেয়, একথা ভুললে চলবে না। আজ যেখানে আমরা সম্মিলিত হয়ে, এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে' গৌরব বোধ করছি, (নওগাঁ) একদিন তারই অনতিদূরে নানা বিদেশ হ'তে জ্ঞান-মন্দিরের তীর্থযাত্রীরা সহস্র সহস্র সংখ্যায় সমাগত হয়েছিল। পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার পালরাজাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারও পূর্বে হিউয়েনসাং এখানে এসে' এক উন্নতিশালী জনপদের বিবরণ লিখেছিলেন। জৈন ধর্মেরও নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবও বহুপূর্ব হ'তে বর্তমান ছিল, পণ্ডিতেরা এরূপ অনুমান করেন। শিবশক্তির যে যুগনদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে, তার থেকে বৌদ্ধ ও হিন্দুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ আদান প্রদানের পরিচয় পাওয়া যায়। হেবজ্র এবং প্রজ্ঞাপারমিতার যুগল মূর্তি (তিব্বতীয় ভাষায় যবযুম) বোধ হয়

পরে শিবশক্তি রূপে হিন্দুদের দেবগোষ্ঠীতে প্রবেশ করেছিল। হিন্দু বৌদ্ধ জৈনের মিলনক্ষেত্র এই সুন্দর দেশ কি ভাবে সভ্যতা, ঐশ্বর্য ও শৌর্যবীর্যের মহান্ আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তা ভাবলে সম্ভ্রমে ও ভক্তিতে আমাদের মস্তক অবনত হয়ে' আসে স্বভাবতঃই। যা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না, তাই ঘটেছিল এই উত্তর বঙ্গে। আমরা ভাবি যে সভ্যতা ও জ্ঞানে আমরা অতীত যুগকে বহু পশ্চাতে ফেলেছি। কিন্তু এ যে কত বড় ভুল, তা একটু প্রণিধান করলেই বুঝতে পারা যায়। ইলেকট্রিক পাখা, টেলিফোন, বেতার, মোটর প্রভৃতি বর্তমান যুগের আবিষ্কার আমাদের নিত্য নূতন চমক লাগিয়ে দিচ্চে সত্য; কিন্তু সেই অতীত গৌরবময় যুগের তুলনায়, আমাদের এই ধার-করা উন্নতি যে কতখানি ম্লান তা আমরা ভেবে দেখিনে। সে সুবর্ণ যুগের তুলনায় এখনকার যুগকে বড় জোর গিল্‌টি যুগ বলা চলে, তার বেশী নয়।

সেই অতীত যুগের কথা আজ স্মরণ করি। পালরাজগণের সময় উত্তর বঙ্গ যে উন্নতি করেছিল, তা আজ কল্পনার বস্তু। পালরাজগণের গৌরবময় যুগে বঙ্গের এই উত্তর প্রদেশের ইতিহাস ভারতের ইতিহাস বললেও অত্যুক্তি হয় না। [সে সময়ে বঙ্গে যে সকল রাজ্য ছিল, তারা কোথায় গেল? সেই দণ্ডভুক্তি, কোটাটবী, বালবলভী, রাজসাহী জেলার কৌশাম্বী প্রভৃতি আজ কোথায়? সেই প্রসিদ্ধ বিহারগুলিই বা কোথায়? ওদন্তপুর, বিক্রমশীল, জগদ্দল প্রভৃতি বিহারগুলি একাধারে ধর্ম ও বিদ্যাশিক্ষার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার সেই গৌরবময় যুগের স্মৃতি মৃত্তিকাতলে লুকিয়ে রেখেছে যুগযুগান্ত ধরে'। এই রাজশাহী জেলাতেই দিব্বোকের বিজয়বাহিনী দ্বিতীয় মহীপালের দর্প চূর্ণ করে' যে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিল, আজও তা বর্তমান আছে শুনেছি।] রামপাল অতিকষ্টে আবার এই দেশে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। শেক শুভোদয়ায় রামপাল সম্বন্ধে যে গল্প আছে, তা রোমের ন্যায়-বিচারের খ্যাতিকেও ম্লান করে। তিনি তাঁর

একমাত্র পুত্র যক্ষপালকে অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন এবং সেই শোকে নিজেও নদীগর্ভে আত্মবিসর্জন দিলেন। তারনাথের ইতিহাস থেকেও আমরা পাই যে রামপালের এক পুত্র ছিল তার নাম যক্ষ। এ সব কীর্তি কাহিনী আমরা ভুলে গিয়েছি।

শুধু রাজারাজড়ার কীর্ত্তি গাথা নয়, সংস্কৃতির দিক দিয়েও উত্তরবঙ্গ বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। স্মরণাতীত কাল হ'তে রাঢ়দেশ অপেক্ষাও উত্তর বঙ্গের গৌরব ছিল বেশী। গুপ্ত সম্রাটদের সময় থেকে আরম্ভ করে উত্তর বঙ্গের একটি অব্যাহত ইতিহাস দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেজন্যই এখানে অতীতের এত নিদর্শন পাওয়া যাচ্চে যে বঙ্গের অন্য কোনও স্থানে সেরূপ নয়। বৌদ্ধ ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা কোনও সম্প্রদায় বা শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। শ্রমণ বা ভিক্ষুরা আপামর সাধারণের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করতেন। আমরা এখন শুধু জানি যে, বৌদ্ধেরা তাঁদের ধর্ম প্রচার করতে দেশ বিদেশে অভিযান করেছিলেন। কিন্তু দেশের মধ্যেও অহিংসা, সন্তোষ ও শান্তির বাণী তাঁরা যে কি অদম্য উৎসাহে প্রচার করেছিলেন, তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। অশোকের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি—এ সব চিরপরিচিত উপায় ত ছিলই। সারা দেশময় সঙ্ঘারাম, বিহার, মহাবিহার প্রভৃতি স্থাপন করে, তাঁরা লোক-শিক্ষার বিরাট আয়োজন করেছিলেন। লোকশিক্ষার এরূপ বিপুল ব্যবস্থা আর কোনও প্রাচীন জাতির ইতিহাসে দেখা যায় না। হিউয়েনসাঙের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে তিনি বিংশতিটি বিহার এই উত্তর বঙ্গেই দেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, অন্তঃপুরচারিকাদের নিকট সদ্ধর্মের অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের মর্ম বুঝাবার জন্য ভিক্ষুণীগণেরও সংখ্যা নগণ্য ছিল না।

বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা সমগ্র জগতের ধর্মেতিহাসে যে এক অতি উন্নততর স্তরের সূচনা করেছিল এ কথা সকলেই জানেন। জীবনযাত্রার যে নীতি তাঁরা শিখিয়েছিলেন তা আজও পুরানো হয় নি বা অন্য নীতির দ্বারা পরাভূত

হয় নি। এই অত্যদ্ভুত উন্নতি কিরূপে সম্ভব হয়েছিল, তার ইতিহাস আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। তবে অনুমান হয় যে পাহাড়পুর, তাম্রলিপ্তি, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে যে সকল বিহার ছিল, তাকে কেন্দ্র করে' এক একটি প্রদেশের সভ্যতা.বিস্তার লাভ করেছিল। প্রত্যেক বিহারে ত্যাগশীল, সুপণ্ডিত, বহুদর্শী প্রবীণ শ্রমণগণ বাস করতেন। তাঁদের কাছে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রেরা সমাগত হতো জ্ঞানলাভ করবার জন্য। এইভাবে বিক্রমশীল, তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতির খ্যাতি বহু দূর পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন আর কখনও হয় নি। পণ্ডিতেরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। ছাত্রেরা শিক্ষা করতেন। উভয়ের জন্য পুঁথি লিখিত হতো শত সহস্র সংখ্যায়। পুঁথি না হলে বিশ্ববিদ্যালয় কেন, সাধারণ বিদ্যালয়ও চলে না। নালন্দায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতো, এই কথা হিউয়েনসাং বলেছেন—তাদের জন্য অন্ততঃ দুই শত কি আড়াই শত অধ্যাপক থাকতেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পুস্তকের প্রয়োজন মিটাতে হলে কত পুঁথি থাকা আবশ্যক, ভেবে দেখুন। নালন্দায় নয়তলা বাড়ীতে গ্রন্থাগার ছিল। অন্যান্য বিহারেও এইরূপ পুস্তকাগার নিশ্চয়ই ছিল—কারণ পূর্বেই বলেছি বিহারগুলি ছিল প্রধানতঃ শিক্ষার কেন্দ্র। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, কাজেই পুঁথি নকল করবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের পরিশ্রম আবশ্যক হতো। এই সকল লোক ভূমি, গ্রাম এবং বিত্ত পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রাপ্ত হতো। ৮ম শতাব্দী হতে আরম্ভ করে' দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তিব্বতের পণ্ডিতেরা দলে দলে এদেশে আসতেন—ভারতের—বিশেষতঃ উত্তর ভারতের—পুঁথি তিব্বতীয় অক্ষরে নকল করতে। এই ভাবেই অতীত কালে আমাদের সংস্কৃতির সৌধ বিরচিত হয়েছিল, যার গঠনে উত্তর বঙ্গ কম সহায়তা করে নি। সে সংস্কৃতি কিরূপ ছিল? আজ আর শত চেষ্টাতেও তার একটি ছবি আমরা চোখের সম্মুখে আনয়ন করতে পারি না। ভারতবর্ষ থেকে, বাংলা দেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়েছে। এর কারণই বা কি?

কেহ কেহ মনে করেন মুসলমানেরা বৌদ্ধধর্মের কীর্তিকলাপ নিশ্চিহ্ন করে' মুছে দিয়েছেন। কিন্তু সেটা সত্য কথা নয়। কারণ মুসলমানদের কাছে বৌদ্ধও যা, হিন্দুও তা-ই। মুসলমান আক্রমণে দেশের সংস্কৃতির স্রোত অনেকটা বাধা পেয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মের মন্দির, আশ্রম, গুহাগুলি এখনও ত মেখলার মত আমাদের জন্মভূমির অঙ্গ বেষ্টন করে' বিরাজ করছে। এই কারণেই হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্রদেশ এখনও হিন্দুদের স্থান বা হিন্দুস্থান বলে' দেশ বিদেশে পরিচিত হবার দাবী রাখে। তা হলে' মুসলমানদের দৌরাত্ম্য বৌদ্ধধর্মের বিলোপের কারণ হ'তে পারে না।

কেহ কেহ বলেন শঙ্করাচার্যের সময় হ'তে হিন্দুধর্মের যে অভ্যুদয় হয়েছিল, তারই ফলে বৌদ্ধধর্মের পতন হয়েছে। কিন্তু তা-ই বা কেমন করে' বিশ্বাস করা যায়? হিন্দুধর্মের যে অবস্থা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, তা বৌদ্ধ ধর্মের অনেকখানি আত্মসাৎ করে' নিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ—নির্বাণ, হিন্দুদের—মোক্ষ বা মুক্তি। বৌদ্ধদের জন্মান্তর ও কর্মফলবাদের সঙ্গে হিন্দুর অধ্যাত্মবিদ্যার একটুও প্রভেদ নাই। বৌদ্ধদের শূন্য এবং হিন্দুদর্শনের নির্গুণ ব্রহ্মে তফাৎ কি বড় বেশী? এইভাবে হিন্দু এবং বৌদ্ধমতের যে সমন্বয় আমরা দেখতে পাই, তাতে এক ধর্মের দ্বারা অপর ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন সম্ভব কতখানি—তাহাও বিবেচ্য। পালরাজগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা হিন্দুমতের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। যতদূর জানা যায় তাতে পালরাজারা ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করতেন, ভূমিদান করতেন এবং নিশ্চয়ই তাদের উপাসনাদিতে বাধা দিতেন না।

আমার বোধ হয় বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থান বৌদ্ধসংস্কৃতির বিশেষ অন্তরায়রূপে দেখা দিয়েছিল। বাংলা দেশে ঐ ধর্মের যে প্রবল বন্যা একদিন বয়েছিল, তার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই হয়ত সুস্পষ্ট ধারণা নেই। আমার বোধ হয় যে, বহুদিন এরূপ শক্তিশালী প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে অনুভূত

হয় নি। তার ফলে হয়েছে এই যে, বঙ্গদেশে বহুলোক এখনও বৈষ্ণব, এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতিও নানা ছদ্মবেশে বৈষ্ণবমতের সঙ্গে মিশে আত্মগোপন করে' রয়েছে। হিন্দুর অধ্যাত্মবিদ্যার সঙ্গে বৌদ্ধমতের যতটা মিল আছে, বৈষ্ণবদের সঙ্গে ততটা নয়। কিন্তু [একটি বিষয়ে বৌদ্ধদের অনুকরণ করেছিলেন বৈষ্ণবেরা—সেটা হচ্চে বৈষ্ণবদের জাতিভেদের প্রতি অনাস্থা।] জাতিভেদ বৈষ্ণব প্রভাবে কতটা খর্ব হয়েছিল, তা এখন বুঝতে পারা কঠিন হবে। কারণ পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের যে সমন্বয় ঘটলো, তা'তে জাতিভেদ আবার মাথা তুলতে সমর্থ হয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা এই বিষয়ে চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের উপর গোড়া থেকেই খুব চটা ছিলেন। এখন দাঁড়িয়েছে এই যে, বৈষ্ণবতত্ত্ব কতকটা হিন্দু সমাজে চলুলেও জাতিভেদ পুরোমাত্রায় মেনে নেওয়া হচ্চে। [সে 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি-পরায়ণঃ' আর নেই।] মহাপ্রভু যা শিখিয়ে গিয়েছিলেন—

"যে-ই ভজে সে-ই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।"

সে শিক্ষা আমরা ক্রমে বিস্মৃত হয়েছি। অবশ্য সেজন্য আমাদের যে দুর্গতি, তার জন্য এখনই [আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েছে ভীষণভাবে। বাংলার তথা ভারতবর্ষের প্রধান রাষ্ট্রীয় সমস্যা এখন হিন্দু মুসলমান নিয়ে নয়, এখন সে সমস্যা scheduled caste বা অনুন্নত জাতি নিয়ে।] যাদের আমরা আঙ্গিনার বাহির ক'রে দিয়েছি, তারাই অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে হিন্দুদের স্বাধীনতা-লাভের পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব দেখে মনে হয় যে, বৌদ্ধদের শিক্ষা, বৈষ্ণবদের শিক্ষা ত্যাগ করে' আমরা ভাল করি নি। আর কোনও দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই জটিলতা নেই। আমাদের নিজ কর্মফল অভিসম্পাতস্বরূপে আমাদের ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করছে।

সে যাই হোক, এই জেলাতেই বৈষ্ণবদের যে অভ্যুদয় হয় ষোড়শ শতাব্দীতে, শ্রীচৈতন্যের পরে এত বড় বিপ্লব আর ঘটে নি। খেতুরির রাজপুত্র

বুদ্ধেরই মত গৃহত্যাগ করে’ যে আদর্শ এই জেলাতেই (রাজসাহী) দেখিয়েছেন, তা গৌতম বুদ্ধের সংসার ত্যাগেরই মত মর্মস্পর্শী ও আধ্যাত্মিক প্রভাবশালী। দিকে দিকে এই বার্ত্তা বাহিত হলো, নরোত্তমদাসের এই ত্যাগের আদর্শে বৈষ্ণব ধর্ম মহীয়ান্ হয়ে উঠলো। দেশব্যাপী যে আন্দোলন হলো, তার কাছে সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেসে গেল। [শূন্যবাদের রিক্ত সিংহাসনে বসলেন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। শালগ্রাম শিলা নয়, একেবারে রূপেরসে ভরপুর সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ।] শালগ্রাম অনেকটা শূন্যের প্রতীক। কিন্তু তার স্থলে আসলেন অখিলরসামৃত মূর্তি, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বৌদ্ধদের [দুরূহ অষ্টমার্গিক সাধনের স্থলে এলো আপামর সাধারণের জন্য নাম-সংকীর্তন। শুষ্ক কঠোর বিধি-নিষেধের স্থলে এলো প্রেম, অহিংসার স্থলে করুণা।] অহিংসা একটি অভাবাত্মক ধর্ম—হিংসার অভাব এই মাত্র। কিন্তু করুণা হৃদয়ের একটি সহজাত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এই ভাবে সারা দেশ বৈষ্ণব ধর্মের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উঠেছিল। পূর্বের যে সকল সংস্কৃতির ভগ্নাবশেষ তখনও বর্তমান ছিল, সেগুলি অল্পে অল্পে ধরণীপৃষ্ঠ হতে বিদায় গ্রহণ করতে লাগলো।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এইরূপে যখন খর্ব হতে আরম্ভ করেছিল, তখন বৈষ্ণবরাও ভগবান বুদ্ধের জন্য একটু স্থান করে’ তাঁকে দশাবতারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন; তারই পরিচয় আমরা জয়দেবে পাই। জয়দেব বাংলার কবি; তাঁর সময়ে বৌদ্ধ প্রভাব জীবন্ত ভাবে বাংলা দেশে বর্তমান ছিল।

নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রভাব কীর্ত্তনের অনুকূল পবনে দূর দূরান্তরে প্রবাহিত হতে’ লাগলো। আমার মনে হয় কূলপ্লাবিনী পদ্মার প্লাবনের মত এই ধর্মের ঢেউ লেগেই পুরাতন ভাবধারার শেষ সৌধগুলি ভেঙে পড়তে লাগলো। [নরোত্তম দাস গরাণহাটী কীর্তনের প্রবর্তক, শ্রীনিবাস আচার্য মনোহরসাহী কীর্তনের জনক বলে’ বিখ্যাত। এঁদের উভয়ের সম্মিলন ঘটেছিল এই জেলাতেই। একজন উত্তর বঙ্গের, আর একজন

রাঢ়ের ।] এই হতে উত্তর বঙ্গ আর রাঢ় এক স্বর্ণ সূত্রে গ্রথিত হলো। এমনটি পূর্বে কখনও হয়েছিল বলে' জানা যায় না।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী কালে নদীয়া শান্তিপুর দিয়ে রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের ঢেউ বয়েছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলেও এর কতকটা প্রভাব পৌঁছেছিল। কিন্তু উত্তর বঙ্গে যে বৈষ্ণব ভাব-প্রবাহ এমন প্রবলভাবে ধাক্কা দিতে পারলো, তার কারণ আমার বোধ হয় উত্তরবঙ্গের পুরাতন সংস্কৃতি। উত্তরবঙ্গ পূর্ব থেকেই যেন এর জন্য প্রস্তুত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও সোমপুর বিহারকে কেন্দ্র করে' যে সভ্যতা যুগযুগান্ত ধরে' পুরাতন অট্টালিকায় বট গাছের মত অসংখ্য শিকড় বিস্তার করে' সমাজকে আচ্ছন্ন করে ছিল, তারই ফলে একদিন হঠাৎ জাগরণ এসেছিল। সে জাগরণের দিকে সারা বাংলাদেশ নির্ণিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলো। ঠাকুর নরোত্তম দাস যা' করেছিলেন, তার তাৎপর্য বুঝতে হলে' সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মমতের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়। তিনি একদিকে যেমন কীর্তনের পদ্ধতি বেঁধে দিলেন, তেমনি বৈষ্ণব মতবাদের ভিত্তিও সুদৃঢ় করে' দিলেন। তাঁর 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', 'হাটপত্তন', 'প্রার্থনা', 'চমৎকারচন্দ্রিকা' প্রভৃতি পুস্তক বৈষ্ণব সমাজের যে কি অসামান্য উপকার করেছে, তা বলে' শেষ করা যায় না। নরোত্তম দাস ঠাকুরের অবদান বরেন্দ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনের গরিমময় ইতিহাসের উপযুক্ত বলে' আমরা মনে করতে পারি। তাঁর 'প্রার্থনা' পদগুলি জগতের সাহিত্যে তুলনাবিহীন এবং তাঁর প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে বৈষ্ণবেরা বলেন 'লক্ষ গ্রন্থের টীকা'।

উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান বৈষ্ণব কবি

বাংলা দেশে এক সময়ে অনেকগুলি মুসলমান বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে জানা যায়। নসির মামুদ, সালবেগ, সৈয়দ মর্তুজা, আকবর শাহ প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি যে বৈষ্ণব ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এ কথা বৈষ্ণব সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদও কয়েকজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। গরিব খাঁ নামক একজন কবি শুধু বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বৈষ্ণব রসতত্ত্বেও ডুবিয়াছেন। রাই কানু একতনু হইয়া যে নদীয়ায় আসিয়া গৌর হইয়াছেন, এ নিগূঢ় তত্ত্বও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না :

গরিব কয় ধর্‌মু বলে ডুবে পেলে না
তাই ক্ষেপে নদেয় এসেছে।

বাংলায় আর একজন মুসলমান কবি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়াছেন। পদটি এই :

জীউ জীউ মেরে মনোচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চলু নট নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া॥
ঐছন পহুঁক যাঙ বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেমভিখারী॥

—গৌরপদতরঙ্গিণী

এই শাহ আকবর কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ইনি যে আকবর বাদশাহ নহেন, তাহা না বলিলেও চলে। কারণ ঐ পদটির মধ্যে যে গৌরপ্রীতি দেখা যায়, তাহার কোন নিদর্শন সম্রাট্ আকবরের চরিত্রে ঘুণাক্ষরেও পাওয়া যায় না।

কিন্তু ঐ একই সময়ে খান খানান আবদুর রহীম খান বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি যে প্রীতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায়। আবদুর রহীম আকবরের অভিভাবক বৈরাম খানের পুত্র ছিলেন। তিনি নিজেও একজন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ এবং যোদ্ধা ছিলেন। মোগল সম্রাটের সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি কাব্যলক্ষ্মীর সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দান এত অধিক ছিল যে, অনেকে তাঁহাকে দাতাকর্ণের সহিত তুলনা করিত। আকবরের এক সভাকবি ছিলেন, তাঁহার নাম গঙ্গ। এই কবিকে রহীম ছত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। আবদুর রহীম একবার বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কোপে পড়িয়া সর্বস্বান্ত ও কারারুদ্ধ হন। রহীম তুলসী দাসের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। রহীমের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে দোহাবলী, সৎসই, রাসপঞ্চাধ্যায়ী প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। রহীমের কৃষ্ণভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় নিম্ন লিখিত পদে :

অনুদিন শ্রীবৃন্দাবন ব্রজ তেঁ আবন আবন জানি।
অব রহীম চিতে তেঁ ন টরতি হায় সকল স্যামকী বানি॥

—হিন্দি সাহিত্যকা ইতিহাস পৃঃ ১৮৫

উত্তর পশ্চিমের আর একজন মুসলমান কবি বৈষ্ণব ভক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না। কবিতার ভণিতায় ইনি আপনাকে রসখান বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, রসখান বাদশাহ-বংশসম্ভূত ছিলেন (খানদান), এ কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। যতদূর জানা যায়, তাহাতে রসখান দিল্লীর একজন পাঠান সর্দার ছিলেন।

ইঁহার রচিত 'সুজান রসখান' ও 'প্রেমবাটিকা' নামক পদ্যগ্রন্থদ্বয় পাওয়া যায়। প্রেমবাটিকা ১৬৭১ সংবৎ অর্থাৎ ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

বিধু সাগরে রস ইন্দু সুভ বরস সরস রসখানি।
প্রেমবাটিকা রুচির রুচির চির হিয় হরসি বখানি ॥

এই সময়ে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব কাব্য ও সঙ্গীতের সুবর্ণ যুগ চলিতেছিল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, ও শ্যামানন্দের প্রভাবে বঙ্গ ও উৎকল কীর্তনে মাতিয়া উঠিয়াছিল। বাংলার অধিকাংশ বৈষ্ণব কবি এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবে নানকজি হইতে যে ভক্তিবাদের ধারা প্রবাহিত হয়, মিথিলায় বিদ্যাপতির মধ্যে যে ধারার পরিণতি দেখা যায়, উত্তর পশ্চিমে সুরদাস, তুলসীদাস ও বল্লভাচার্যের দ্বারা সেই ধারারই পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালী কবিরা যে উত্তর পশ্চিমের বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন অথবা উত্তর পশ্চিমের কবিরা যে বাঙ্গালী কবির নিকট হইতে তাঁহাদের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে অবশ্য এখনও যথেষ্ট অনুসন্ধান হয় নাই। সুরদাস যখন তাঁহার 'সুর সাগর' গোকুলে বসিয়া রচনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামীগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি নির্মাণ করিতেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইঁহাদের মধ্যে কোনও সংস্রব ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। মীরা বাঈয়ের সম্বন্ধে প্রবাদ কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু সুরদাসের সম্বন্ধে প্রবাদও নীরব। অথচ সুরদাসের পদাবলীর সহিত বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির এমন অদ্ভুত সাজাত্য কিরূপে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। রসখানের পদাবলীর সহিতও বাংলা পদাবলীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। রসখান যে রসটিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও বৈষ্ণব রসতত্ত্বের মধ্যে একটি বিশিষ্ট রস; তিনি সখ্য রসের উপাসক ছিলেন। এই রসের সাধক খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার

এই আবেশ ছিল যে, তিনি কৃষ্ণের সহিত নিত্য গোচারণে যাইতেন। তাঁহার কবিতায় মধুর বা শৃঙ্গার রসেরও অভাব নাই। [তিনি একটি কবিতায় গোপী-ভাবের আবেশে বলিতেছেন :

মোর পখা সির উপর রাখিহৌ
গুঞ্জকী মাল গরে পহিরৌংগী।
ওঢ়ি পিতাম্বর লৈ লকুটি বন
গোধন গ্বারন সঙ্গ ফিরৌংগী॥
ভাবতো সোই মেরো রসখান সো
তেরে কহে সব স্বাংগ করৌংগী।
যা মুরলী মুরলীধর-কী
অধরান ধরী অধরা ন ধরৌংগী॥

আমি শিরোপরি ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করিব, গলে গুঞ্জমালা পরিব। পীতাম্বর পরিয়া, লাঠি হইয়া গোধন গোয়ালার সঙ্গে বেড়াইব। (রসখান বলেন) তিনি যে অভিপ্রায় করেন (অথবা তিনিই যখন আমার প্রিয় তখন) তিনি বলিলেই আমি তাহা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিব। (কিন্তু) যে মুরলী মুরলীধর অধরে ধারণ করেন, তাহা অধরে স্পর্শ করিব না। (কারণ মুরলী আমাকে বঞ্চিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতেছে।)]

রসখান ভাববেশে গরু চরাইতেন, শ্রীকৃষ্ণের মোহনবেণু শুনিয়া বিভোর হইতেন, আর তাঁহার রূপ-সুধারস পান করিবার জন্য পাগল হইয়া যাইতেন

মত্ত ভয়ো মন সঙ্গ ফিরৈ
রসখানি স্বরূপ-সুধারস ঘূট্যো।

এবং নদী যেমন সাগরে মিলিতে ছুটিয়া যায়, সেইরূপভাবে মন কূলের বাঁধ ভাঙিয়া ফেলে—

সাগর কোঁ সরিতা জিমি ধাবতি
রোকি রহে কুলকৌ পুল টুট্যো।

[রসখানজি শ্যামের রূপ এইভাবে আস্বাদন করিয়াছেন.

সুন্দর শ্যাম সিরোমণি মোহন
জোহন মেঁ চিত চোরতু হ্যায়।
বাঁকী বিলোকনি কী অবলোকনি
নোকন্থু কৈ দৃগ্ জোরতু হ্যায়॥

রসখানি মনোহর রূপ সলোনে কৌ
মারগ তেঁ মন মোরত হ্যায়।
গৃহ-কাজ সমাজ সবৈ কুল লাজ
ললা ব্রজরাজ কৌ তোরতু হ্যায়॥

সুন্দর শ্যাম মোহন-শিরোমণিকে অনুসন্ধান করিতেই আমার চিত্ত চুরি করিয়াছে। সুন্দর নয়নের যে অবলোকন তাহা দেখিলাম—নাসিকার উপর চক্ষু দুইটি যেন যুক্ত হইয়াছে। রসখান বলিতেছেন, সুন্দর মনোহর রূপ আমার মনের পথ ফিরাইয়া দিয়াছে, (অর্থাৎ অন্য পথে যাইতে গেলে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে) ব্রজ-রাজ লালা (কিশোর তনয়) গৃহকাজ, সমাজ, সমস্ত কুললাজ ভাঙিয়া দিল।]

[রসখানের একটি দানের পদ আছে ;

দানী ভয় নয়ে মাঙ্গত দান
সুইন জু-পৈ কংস তৌ বাঁধিকৈ জৈহো।
রোকত হো বন মে রসখানি
পসারত হাথ ঘনো দুখ পৈহো॥

টুটে ছরা বছরা অরু গোধন
জো ধন হ্যায় সু সবৈ ধরি দৈহো।
জৈছে ভুষণ কাহ্নু সখী কৌ
তো মোল ছলা কে ললা ন বিকৈহো॥

দানী হইয়া নূতন দান চাহিতেছে ; কংস যখন শুনিবে তখন তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। রসখান বলিতেছেন বনের মধ্যে পথ রোধ করিয়া (দানের জন্য) হাত পাতিতেছ, ইহাতে অত্যন্ত দুঃখ পাইবে। যদি হার ছিঁড়িয়া যায়, তবে তোমার গরু বাছুর সব ধরিয়া লইয়া যাইবে। যদি কোনও সখীর অলঙ্কার যায়, তবে, হে লালা, তোমাকে বেচিলেও হারের দাম পরিশোধ হইবে না।

এই দানের পালা লইয়া বাংলা দেশে বেশ একটু কৌতুককর আলোচনা আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দানলীলার প্রসঙ্গ নাই। এ দানলীলার ব্যাপার কোথা হইতে আসিল? ইহাই প্রশ্ন।

এতদ্দেশে দানলীলার প্রাচীনতম প্রামাণিক বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীরূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'দানকেলি-চিন্তামণি'তে। দানকেলিকৌমুদী নামক ভাণিকা রচিত হয় ১৪৭১ শকে—

গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বর সমন্বিতে
নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্মিতা ॥

ইহারই অল্প পরে দানকেলিচিন্তামণি রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে রূপগোস্বামীর নাম আছে। ভক্তিরত্নাকরে রঘুনাথ গোস্বামীর এই গ্রন্থ দানচরিত নামে উল্লিখিত হইয়াছে :

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী পরে কয় ॥
শ্রীদানচরিত মুক্তাচরিত মধুর
যাহার শ্রবণে মহা দুঃখ যায় দূর ॥

দাস গোস্বামীর দানচরিত বলিয়া কোনও গ্রন্থ নাই। কাজেই দানকেলি-চিন্তামণিকে নরহরি চক্রবর্তী দানচরিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ইহাই বোধ হয়।

সুরদাস অনুমান ১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কবিতায় দান-

লীলার উল্লেখ আছে। সুরদাসের দানলীলার পদাবলী এখনও গীত হইয়া থাকে। রসখানের দানলীলার সম্বন্ধে পদ রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে দানলীলা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোনও পূর্বতন সংস্কৃত কাব্য উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল যাহা হইতে পশ্চিম দেশীয় কবিরা এবং বঙ্গদেশের মহাজনরা প্রেরণা পাইয়াছিলেন। সুরদাস এবং রূপগোস্বামী সমসাময়িক কবি; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ইঁহাদের মধ্যে একজন যে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে [রসখানজির দানের পদে যে ভাবটি রহিয়াছে, বঙ্গদেশীয় দানলীলার পদাবলীতে ঠিক সেই ভাবটি আমরা দেখিতে পাই :—

গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজকর নাহি মান কংস দরবার জান
দেখি কেনে নহে একপাশ ॥ —জ্ঞানদাস]

অন্য একটি পদ :—

সহজই তুহুঁ সে অধীর।
ধর কুলবধূগণ চীর ॥
রাজভয় নাহিক তোহার।
পথমাহা এতহুঁ বেভার ॥ —রাধাবল্লভ দাস

দানলীলার মধ্যে কাব্য-বৈচিত্র্য এই যে গোপীরা দধিদুগ্ধঘৃতের পসরা সাজাইয়া চলিয়াছেন, আর পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট 'দান' সাধিতেছেন অর্থাৎ শুল্ক চাহিতেছেন। গোপীরা তাঁহাকে কংসরাজার ভয় দেখাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে যে উক্তি-প্রত্যুক্তি, তাহা কাব্যরসে সরস হইয়া উঠিয়াছে। দান চাহিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার রূপ বর্ণন, এবং প্রেম নিবেদন অনাবিল কাব্যসম্পদে ভূষিত। চণ্ডীদাসের

কৃষ্ণ-কীর্তনেই কেবল ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। রসখানের কবিতায়ও যে কাব্যকলা আছে, তাহাও উপভোগ্য। রাধিকা বলিতেছেন—সখীগণের কোনও ভূষণ যদি তুমি ছিঁড়িয়া দেও বা নষ্ট কর, তাহা হইলে তোমাকে বেচিলেও তাহার মূল্য হইবে না। কেননা তুমি ধেনুর রাখাল।

রসখানজি যে একজন ভক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি শ্রীবৃন্দাবনের পশুপাখী হইয়া থাকিতে পারিলেও আপনাকে ধন্য মনে করেন, অন্য কিছু কামনা করেন না।

মানুষ হোঁ তো বহী রসখান
বসৌ ব্রজ গোকুল গাঁব কে গ্বারন।
জো পসু হোঁ তো কহা বসু মেরো
চরৌ নিত নন্দকী ধেনু মঁঝারন॥
পাহন হোঁ তো বহী গিরি কো
জো কিয়ো করছত্র পুরন্দর-ধারণ।
জৌ খগ হোঁ তো বসেরো করৌঁ
মিলি কালিন্দী-কূল-কদম্ব কী ডারন॥

যদি মানুষ হই, তবে (রসখান বলেন) যেন ঐ ব্রজগোকুল গ্রামের গোয়ালা হইয়া বাস করি। যদি পশু হই, তবে নন্দের ধেনুপাল মধ্যে যেন চরিতে পারি। যদি পাষাণ হই, তবে যেন গিরিগোবর্দ্ধনের পাষাণ হই—যে গোবর্দ্ধনকে শ্রীকৃষ্ণ ছত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন। যদি পাখী হই, তবে যেন কালিন্দী-কূল-কদম্ব তরুর ডালে বাস করিতে পারি।

আমরা ইহাই জানি, বৃন্দাবন বাঙালীরই সৃষ্টি। বাঙালী কবিরাই নানা ছন্দে ইহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দী কবিদের মধ্যেও ইহার প্রভাব যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বংশী-অলি নামে একজন কবি অষ্টাদশ বিক্রমসংবতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য কিশোরী-অলির একটি প্রসিদ্ধ পদ আছে:—

শ্রীবৃন্দাবন বৃন্দাবন বৃন্দাবন কহুরে।
বৃন্দাবন রজ কী তূ সরণ বেগি গহুরে॥

বৃন্দাবনের রজে গড়াগড়ি দিতে বিলম্ব করিও না।

আর একজন কবি বলিতেছেন :—

প্রথম জথামতি প্রণউ শ্রীবৃন্দাবন অতি রম্য।
শ্রীরাধিকা কৃপা বিনু সব কে মাননি অগম্য॥

(হিতহরিবংশ ১৫৫৯ সংবৎ)

বাঙালী কবিও গাহিয়াছেন :—

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। —নরোত্তম দাস

শুধু বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য-প্রচারে নহে, রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধেও উত্তর-পশ্চিমের কবিদের সহিত বাঙালী কবিদের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে মূর্তিমতী ভক্তিরূপিণী শ্রীরাধিকার আরাধনা আবশ্যক। ভগবান যে ভক্তির বশ এই কথাটি বৈষ্ণব কবিরা বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন। এমন কি মুসলমান কবি রসখান তাঁহার একটি কবিতায় সেই ভাবটি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, বেদে, পুরাণে ব্রহ্মকে খুঁজিলাম পাইলাম না ; কত নরনারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই সন্ধান দিতে পারে না ; দেখিলাম তিনি নিভৃত কুঞ্জ-কুটীরে রাধিকার পদসেবা করিতেছেন !

দেখো দুর্‌য়ো বহ কুঞ্জ-কুটীর মেঁ
বৈঠয়ো পলোটতু রাধিকা-পায়ন।

রসখান প্রেমভক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলী লালিত্যে ও সরলতায় অপূর্ব। ইঁহার জীবন-কথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। একটি প্রবাদ আছে যে, তিনি একজন রমণীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণির ন্যায় এই রমণী তাঁহার প্রেমের সমাদর করিত না। সে অত্যন্ত অভিমানিনী ও রূপগর্বিতা ছিল। রসখান একদিন ঘটনাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি উর্দু অনুবাদে

দেখিলেন যে, ব্রজের সহস্র সহস্র গোয়ালিনী শ্রীকৃষ্ণকে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে রসখান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীনাথজির একখানি চিত্র দেখিয়া মোহিত হইলেন। অতঃপর এই প্রেমিক কবি তাঁহার সমস্ত প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন এবং বৃন্দাবনে গিয়া সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করিলেন। নিম্নলিখিত কবিতায় ইহার আভাস পাওয়া যায়:—

তোরি মানিনী তেঁ হিয়ো ফোরি মোহনী মান।
প্রেমদেব কী ছবি হি লখি ভয়ে মিয়া রসখান॥

প্রেম দেবতার ছবি দেখিয়া তোমার মোহিনী মায়া অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়া রসখান শ্রেষ্ঠ (মিয়াঁ) হইল।

'২৫২ বৈষ্ণবন কী বার্ত্তা' নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ দেখা যায়। রসখান প্রথমে এক বাণিয়ার পুত্রের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে তাহার উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত ভোজন করিতেন। একদিন কয়েক-জন বৈষ্ণবের মধ্যে কথা হইতে হইতে একজন বলিয়া উঠিল যে, ঐ বাণিয়ার ছেলের প্রতি রসখানের যেরূপ ভালবাসা, ভগবানের প্রতি কাহারও যদি ঐ রূপ হইত! কথাটি রসখানের কানে পৌঁছিল। তখন তিনি ভগবানের রূপ কেমন জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহাকে একজন শ্রীনাথজির চিত্র দেখাইল। সেই অবধি তিনি বণিক পুত্রের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনাথজির প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। রসখান অতঃপর বল্লভাচার্য স্বামীর পুত্র বিঠ্‌ঠলনাথের শরণাপন্ন হইলেন। এবং বিঠ্‌ঠল নাথজি তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া রসখানকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন, জাতি-ধর্মের বিচার করিলেন না।